উৎসর্গ

শ্রীমতী ভগবতী দেবী

কল্যানীয়াষু

সুরপতির মানুষ হয়ে ওঠার ইতিহাসটা সুস্পষ্ট নয়। বাগানে গজায় নানা ফুল, নানান্ চারা, তাদের যত্ন আছে তদ্বির আছে, কিন্তু এমন ফুলও রয়েছে যা বেড়ে ওঠে অলক্ষ্যে, তার দিকে কর্ত্তৃপক্ষের ভ্রূক্ষেপ নেই, নিজের প্রাণলীলায় নিজেকে সে বিকশিত করে। সুরপতির মানুষ হয়ে ওঠা ছিল পরিবারের অগোচরে। তার প্রতি লক্ষ্যও ছিল না, অনাদরও দেখা যায় নি। তার সম্পর্কে আশাও যেমন কেউ করে নি, তাকে নিয়ে হতাশ হবার কারণও তেমনি ঘটল না। সুরপতি এমনি করেই বড় হয়ে উঠল।

যেমন আর পাঁচ জন। ওপাড়া এপাড়া, এদেশ সেদেশ, যেমন জগতের অগণ্য পিতা-মাতার অসংখ্য সন্তান বেড়ে উঠেছে, সুরপতি তাদের একজন। তার শরীর, তার মন, তার ক্রমবিকাশ, এ নিয়ে পরিবারের কোন উদ্বেগ নেই। সে যা হয়ে উঠবে তা এ তল্লাটের সবাই জানে অর্থাৎ কিছুই সে হবে না। এমন কোনো ঘটনা, কোন দৈব, কোনো বিশেষ আন্দোলন তার প্রথম জীবনটায় ঘটল না, যাতে তার ব্যাক্তিত্বের ওপর ছাপ পড়ে, তার স্বাতন্ত্র্য প্রমানিত হয়। সে যদি সংসার থেকে স'রে যায় তবে গাছের একটি পাতাও নড়বে না, সকলের কাজ সমান ভাবেই চলবে, তাকে খুঁজে আনার দরকার হবে না, কারণ তার নিজস্ব

কোন পরিচয় নেই। তার থাকা আর না-থাকা একই কথা! এমন মানুষ আছে যারা কেবলমাত্র জীব, জীবন নয়, তাদের বাঁচা [illegible] অস্তিত্ব প্রকৃতির নিয়মেই তাদের ঘটে বিনাশ। সুরপতি পথের পাশের নামহারা মরশুমী ফুল, তার দিকে ফিরে তাকাবার দরকার নেই।

একদা এইটেই সুরপতির কাজে লাগল। পরিবারের যে বৈরাগ্য সময় সময় তার মনকে উৎপীড়িত করেছে সেটা হোলো তার পক্ষে আশীর্ব্বাদ। মায়া-মমতার সঙ্গে তার মনের ছোঁয়াচ নেই, সে দেখলে কেবল তার জীবনটাই নয়, সামনের পথটাও তার মুক্ত। কেউ তাকে টানেনি তাই তাকেও টানতে হয়নি কাউকে, তার হৃদয়কে নির্লিপ্ত রেখেছে সবাই নির্ম্মল আর নির্মোহ—এটা সৌভাগ্য। এমন ঘটে অনেকের জীবনে। বঞ্চনার দিকটা ভাঙে, ঐশ্বর্য্যের দিকে গড়ে ওঠে। যদিবা কিছু অভিমান ছিল সুরপতির জীবনে, যৌবনকালের নবজাগ্রত চেতনায় আপনাকে বিশ্লেষণ ক'রে সে দেখলে, তার ভিতরের নালিশটা ধুয়ে মুছে দেউল পরিচ্ছন্ন হয়ে গেছে। ভাগ্য-দেবতা তার সুপ্রসন্ন সন্দেহ নেই।

একান্নবর্ত্তী পরিবারে সুরপতি মানুষ। পরিবারের অবস্থাটা স্বচ্ছল। যেমন আর পাঁচটা ছেলেমেয়ে বসে রয়েছে—তাদের মধ্যে জীবন-সংগ্রামের বিশেষ কোন উদ্বেগ নেই, তাদের নিয়ে সমস্যাটাও জটিল নয়। মেয়েরা যথাসময়ে যাবে শ্বশুর বাড়ী, ছেলেরা যথাসময়ে স্ত্রী ঘরে আনবে। সম্পত্তির আয় থেকে চলবে। এইটেই তাদের আদর্শ, এইটেই লক্ষ্য। সুতরাং ভবিষ্যৎটা সবাই জানে।

জানেনা কেবল সুরপতি। জানতে গেলে তাকে অন্ধকারে হাতড়াতে হয়। একটা দুর্গম কল্পনাকে সে মনে মনে লালন করেছে, সেটা এই পরিবারের স্বভাবধর্ম্মবিরোধী। সুরপতির নবজাগ্রত চেতনাটা সুখকর নয়, তার জীবনটা তার কাছে ভয়। কেন ভয়, এর উত্তরটা শোনবার জন্য তার প্রশ্নের উত্তর কোথাও নেই।

সুরপতি তাঁকে ঠিকানা খুঁজে বা'র ক'রে দিলে। আঃ সে আজ স্বাধীন, সে মুক্তি পেয়েছে। পথের হাওয়ায় সে একবার নিশ্বাস নিলে। তাকে কাজ করতে হবে, মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে হবে। সূর্য্যকিরণকে আলিঙ্গন করতে তার ইচ্ছা হোলো।

এক সহপাঠীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা।—কি হে সুরপতি, কোথায় চলেছ?

আরে, অমিয় যে, ভালো ত? এই বেরিয়েছি একটু ঘুরতে। অনেককাল পরে দেখা! কোথায় আছো এখন?

অতীতকালের স্মৃতিকথা নিয়ে দুই বন্ধু মুখর হয়ে উঠল।

বয়সটা দুজনেরই ভালো নয়। অমিয় জিজ্ঞাসা করলে, তারপর, বিয়ে করছ কবে? চেষ্টা চল্‌ছে ত?

তা চলছে বৈ কি, হলেই হোলো। বিয়ে করাই ত সব চেয়ে সহজ।

অমিয় যাবার চেষ্টায় পা বাড়িয়ে বল্‌লে, বিপদে পড়েছি, ছোট ভাইয়ের অসুখ, মেসে রয়েছে, দেখবার কেউ নেই।

সুরপতি সাগ্রহে বললে, কি অসুখ?

টাই-ফয়েড শুন্‌ছি।

সুরপতি আর তার সঙ্গ ছাড়ল না, চল্‌তে লাগল পাশে পাশে। বলতে লাগল নানা সান্ত্বনার কথা পরম আত্মীয়ের মতো। এলো মেস পর্য্যন্ত এবং বন্ধুর সঙ্গে রোগীর ঘর অবধি গেল। রোগী বিছানায় স্তিমিত হয়ে রয়েছে।

অনেক রাতে জানা গেল, সুরপতি এখান থেকে নড়বে না, রোগীর পরিচর্য্যা নিয়ে থাকবে ব'সে। এটা বন্ধুত্বের আতিশয্য—অমিয় ভাবলে, বড় লোকের সখ। নৈলে কেন এতখানি ত্যাগ, এতটা আন্তরিকতা? বড়লোকদের খেয়াল ছাড়া কি?

আট দিন কাট্‌ল রোগীর সেবায়। তারপর রোগীকে সুস্থ দেখে বিনা নোটিশে একদিন সুরপতি মেস থেকে চ'লে গেল, আর তার থাকার কোনো দরকার নেই। পথের জীবনটা অভ্যস্থ নয়, নানা দিকে অভাব মূর্ত্তি ধ'রে

দাঁড়ায়। এদিকে মাঠ থেকে ঘাটে, এ-বাগান থেকে ও-বাগানে। কিন্তু এর মধ্যে বিশেষ একটা ভালো লাগা রয়েছে। প্রতি মুহূর্ত্তে বেঁচে থাকাটা প্রমানিত হয়। নিজের মনে তন্ন তন্ন ক'রে অনুসন্ধান ক'রে সুরপতি দেখলে বাড়ী ফিরে যাবার ইচ্ছা তার নেই, সেদিকের বন্ধন তার শেষ হয়েছে। আত্মীয়ের আকর্ষণের ভিতরে রয়েছে পাশবিক মোহ, একত্র থাকার জন্য মনের একটা যন্ত্রণাদায়ক বাঁধাবাঁধি। এটা ছিন্ন করতে তার বেদনা নেই। মায়া যেন প্রেতের মতো তার পিছু পিছু না লেগে থাকে। মানুষের সকল বন্ধন তার মনে।

কিছুকাল পরে একটা কাজ পাওয়া গেল। একটা বড় কারখানার কর্ম্মাধ্যক্ষের সহকারীর কাজ। এক বিন্দু জল থেকে হয় সমুদ্র, একটি বালুকণা থেকে হয় মহাদেশ। অনেক নিচু থেকে অনেক উঁচুতে মাথা তুলতে পারাটাই পুরুষত্ব। আদর্শটা তার সুস্পষ্ট, আদর্শচ্যুত থাকাটা পাশবিক অবস্থা। সুরপতি একান্ত মনে কাজে লেগে গেল।

কাজের সঙ্গে বাসস্থানের ব্যবস্থা পাকা হোলো। কুণ্ঠিত দুঃস্থ হয়ে থাকা প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রাটা গণতান্ত্রিক, সবাই সমপর্য্যায়ভুক্ত। বিশেষ রুচি আর বিশেষ ব্যক্তিত্বের আদর কম। আহারাদির ব্যবস্থাটা কেবল মাত্র প্রয়োজন সাপেক্ষ। কিন্তু তাতে সুরপতির অসুবিধা নেই। কর্ম্মকুশলতার জন্য কর্তৃপক্ষের স্নেহটা পাওয়া গেল অতি সহজে। সুরপতির দিন মন্দ কাটছে না।

এমন দিনে আবার হঠাৎ পথে দেখা হয়ে গেল হরিহরদাদার সঙ্গে। প্রথম সম্ভাষণেই বোঝা গেল সুরপতির গৃহত্যাগের সংবাদটা তিনি পেয়েছিলেন।

সস্নেহে কাঁধে হাত রেখে তিনি বললেন, বাড়ী থেকে চ'লে এলি কেন রে

সুরপতি বললে, ভাগ্যের কষ্টিপাথরে নিজেকে পরীক্ষা করতে হরিহর-দা। বাড়ীতে সুখ ছিল, স্বস্তি ছিল না।

কিন্তু নোঙর ছিঁড়লে নৌকার অবস্থাটা কি হয়?

দুঃখই আমি নিতে চাই।

কার জন্যে রে ?—হরিহর হাসলেন।

সুরপতি বললে, আদর্শ! রাজপুত্র ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়েছিলেন কেন হরিহর-দা ?

চাকরি নিলি কেন ? অর্থের কি অভাব ছিল ?

না। কাজের জন্যেই চাকরি, অর্থের জন্যে নয়! এবার আর আপনাকে ছাড়ব না, ঠিকানাটা দিন্। আপনি আছেন আমার জীবনে বড় উদাহরণ হয়ে।

পথের মাঝখানে নানা তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা চল্‌তে লাগ্‌ল। মানুষ বলে যাকে হরিহর কোনোদিন স্বীকার করেননি আজ সে একজন ব্যক্তি হয়ে উঠেছে! সুরপতি বল্‌লে, নিজের জন্যে কেবল বাঁচার অধিকার নেই মানুষের, পশু কেবল বাঁচে নিজের জন্যে। চেয়ে দেখ্‌তে হবে পৃথিবীর এক বিশাল জনতা আমার প্রাণধারণের দরজায় হাত পেতে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আমি মানুষ হয়ে না উঠ্‌লে অসীম দারিদ্র্য থেকে তাদের পরিত্রাণ নেই! আমি মাথা তুল্‌তে চাই হরিহর-দা।

হরিহর বলিলেন, বাড়ী ফিরবিনে ?

সুরপতি বল্‌লে, সে দুর্ভাগ্য যদি ঘটে তবে ভগবানের কাছে ক্ষমা চাইব।

বিয়ে ?

বিয়েটা স্বার্থের দাসত্ব।

হরিহর বলিলেন, কিন্তু পরের দাসত্ব ক'রে কি উন্নতি তোর হবে ? এটাত কেবল অন্ন সংগ্রাম।

সুরপতি হেসে বল্‌লে, আপনি পরীক্ষা করছেন জানি, তাই সামান্য বক্তব্যটা নিবেদন করব। অন্ন যদি আমার জোটে তার থেকে ভাগ দেবো অন্যকে। আশ্রয় যদি পাই নিরাশ্রয়কে আন্‌বো টেনে। পথ যদি খুঁজে পাই তবে পথ দেখাতে পারব অন্যকে। এর বেশি আর আজকে আপনাকে বল্‌ব না। ফুলের কুঁড়ি জানে না তার সম্পূর্ণ আত্ম-পরিচয়! এই ব'লে সে হেঁট হয়ে হরিহরের পায়ের ধুলো মাথায় নিলে।

কিন্তু ঘটনাটা গেল ঘুরে। একদিন কারখানার কর্ম্মব্যস্ত সময়টায় উল্কার মতো বড় কাকা এসে দেখা দিলেন! সুরপতির পরিচ্ছদটা ভালো ছিল না, পরণে কালিঝুলি মাখা এলোমেলো হাফপ্যাণ্ট, গায়ে গেঞ্জি। বড় কাকা স্তম্ভিত হ'য়ে হেসে বল্‌লেন, এ কি রে?

সুরপতি হেসে বল্‌লে, জীবন-সংগ্রাম কাকাবাবু।

যা, কাপড় ছেড়ে আয়।

ভ্রাতুস্পুত্র তাঁর হুকুম তামিল ক'রে কাছে এসে দাঁড়াল! কাকা বল্‌লেন, তুই যে বড় হয়েছিস এটা আমরা জান্‌তে পারিনি! নে চল্, সবাই কেঁদে কেটে খুন হচ্ছে। ব'লে তিনি কারখানার মালিককে ডেকে সুরপতির হয়ে কাজে জবাব দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

আপনি কি আমায় বাড়ী নিয়ে যাবেন? কি কর্‌ব গিয়ে?

ছেলের কথা শোনো। খাবি দাবি, বংশের নাম রাখ্‌বি, বিয়ে হবে, সংসার, ধর্ম্মকর্ম্ম···এই সব কর্‌বি!

যদি এ সব কিছুই না করি বড় কাকা?

তা'হলেও নালিশ নেই, আহার-নিদ্রা নিয়ে থেকো। তাই ব'লে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে না এলেও চল্‌বে।

পালিয়ে আমি আসিনি, চ'লে এসেছি কাকাবাবু।

কেন?

কিছু কাজ করতে চাই।

বাড়ীতে থেকে হয় না?

না। সুরপতি একটা কথা বল্‌তে গিয়ে থেমে গেল। সেটা এই যে, নিরাপদ আশ্রয় আর নিশ্চিন্ত অন্ন—এরা অনেক কাজেই ব[illegible] দেয়।

কাকা তার হাত ধ'রে নিয়ে চল্‌লেন। বাড়ীর দিকে চলেছে একথা সুরপতি জানে, বাড়ীতে না ফির্‌বার প্রতিজ্ঞাটাও তার স্পষ্ট মনে আছে। কাকা

বল্লেন, তা'হলে তুমি এখন কোথায় থাক্‌তে চাও? দাদা আর বৌদির পরে এমন অভিমান কর্‌বার কারণ ঘট্‌ল কবে বলো ত?

সুরপতি বল্‌লে, একটুও না কাকাবাবু। আমি চুরি ক'রে আসিনি, লুকিয়েও বেড়াব না। যা ছেড়ে এসেছি তা আর গিয়ে আঁকড়ে ধর্‌ব না। এটা আমার প্রতিজ্ঞা নয় কাকাবাবু, এটা বিচার।

কাকাবাবু সবিস্ময়ে হাস্‌লেন। এ তাঁদের বাড়ীর সেই সুরপতি যেন নয়। হঠাৎ সে যেন নূতন ক'রে জন্মগ্রহণ করেছে।

গাড়ী ক'রে দু'জনে বাড়ী এসে পৌছলেন। লোকে লোকারণ্য। হারাধনের পুনঃপ্রাপ্তি। পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের অশ্রুসিক্ত। ছেলেকে ফিরে পাওয়াটাই বড় কথা, শাসনের প্রয়োজন নেই। মা আঁচল দিয়ে মুখ মুছিয়ে ঘরে তুলে নিয়ে গেলেন। চাকরি আর সুরপতির করা হোলো না।

বাবা শুন্‌লেন সকল কথা। বল্‌লেন, তুমি বড় হয়েছ, তোমার কিছুতেই আর বাধা দিতে পার্‌ব না। এবার থেকে তুমি যা ভালো মনে ক'রো তাই কর্‌বে, কেবল নিরাপদে থাকবার চেষ্টা কর্‌লে আমরা খুসী হবো। তোমার কাছে কোনো কৈফিৎ আর আমরা চাইব না। বাড়ীতে তুমি থাক্‌তে চাওনা কেন? আচ্ছা থাক্, আজকে উত্তর না দিলেও চল্‌বে। ব'লে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

প্রতিজ্ঞাটা ভাঙল কিন্তু লক্ষ্যটা স্থির হোলো এই বিদ্রোহের ভিতর দিয়ে। ঘরটা তার পথের সঙ্গে মিলেছে। অবরোধের দেয়াল ভেঙে অন্ধকারে এসে পড়েছে বাইরের আলো, নিশ্বাস নেবার বাতাস যেখানে ছিল না, বনের হাওয়া ঢুকেছে সেখানে। বাড়ীতে সে এসে ঢুকল বটে কিন্তু পুরাতন জীবনে আর প্রবেশ করল না। যা কিছু সাধারণ তাদের পরে তার বিষদৃষ্টি মনের মধ্যে এই কথাটা পাক খেয়ে ঘুরছে, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

যুদ্ধে সে নেমেছিল কিন্তু ফিরিয়ে আন্‌লেন আত্মীয়রা। তার মনেও ত ছিল দুর্ব্বলতা, পিছুটানের মোহ। নিজেকে সুরপতি বিশ্লেষণ ক'রে দেখলে।

মনের অগোচর পাপ নেই। ভয় ছিল তার মনে। অন্দরমহলের দাক্ষিণ্যে সে লালিত, বহির্জগতের ঝঞ্ঝা ও দুর্য্যোগ সহ্য করার শক্তি সে সঞ্চয় করেনি। একটি মাত্র অনুরোধ তাকে আদর্শচ্যুত করে আন্‌ল। আপন সত্যের প্রতি সে বিশুদ্ধ নয়। সাধ আছে সাধ্য নেই। চরিত্রের দ্বন্দ্বটা লজ্জার কারণ।

এমন দিনে সূর্য্যগ্রহণ এলো। স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করা হচ্ছে সুরপতি তাদের দলে গিয়ে নাম লেখালে। নদীর ধারে তাকে দাঁড়িয়ে স্নানার্থীদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। কাজটা ভালই লাগল। কাজ একটি তার চাই।

যথাদিনে যথাস্থানে সে উপস্থিত। বিশাল জনতায় গঙ্গার ঘাটগুলি পরিপ্লাবিত। দলপতির হুকুমে ভিড়ের ভিতরে তাকে দাঁড়াতে হোলো। তার শারীরিক শক্তিটা পরিচয়-পত্রের কাজ দিলে! সকাল থেকে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত তার নিশ্বাস নেবার আর সময় রইল না।

ফিরবার মুখে অকস্মাৎ দেখা গেল, এক জায়গায় হরিহর দাদা কতকগুলি লোক নিয়ে দাঁড়িয়ে। লাপরাশ দেখে সুরপতি বুঝলে তাঁরাও স্বেচ্ছাসেবক, হরিহর দাদা তাঁদের নায়ক। সুরপতি সানন্দে এগিয়ে গেল সেদিকে।

আরে, তুই যে? ভলান্টিয়ার হয়েছিলি? হরিহর বল্‌লেন, এত রোদ্দুরে আর ফিরে যেতে হবে না, আমার ওখানে খাবি চল্।

তথাস্তু! সুরপতি তাঁর সঙ্গ নিলে। লোকজনেরা বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে সুরপতির দিকে একবার ঈর্ষান্বিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে চ'লে গেল। গ্রহণের যোগ তখন শেষ হয়ে গেছে।

পথে যেতে যেতে হরিহর বল্‌লেন, তোদের ওখানে গিয়েছিলুম। শুনলুম তুই আর বাধা নিষেধ কিছু মানবিনে। কি করবি বলত?

বলুন না আপনি?

বিলেত যাবি?

সুরপতি বল্‌লে, না।

কেন ?

আমার দেশেই অনেক কাজ আছে হরিহর-দা।

হরিহর বল্‌লেন, তা সত্যি বলেছিস। তবে আপাতত একটা কাজ করবি ? আমি বল্‌লে হয়ে যেতে পারে।

কি বলুন ?

দাসত্ব ঠিক নয়, তবে মাইনে নিয়ে কাজ। এক প্রকাণ্ড জমিদারের দুটি ছেলের গৃহশিক্ষকতা। পারবি ?

পারব।

না পারবার কারণ নেই, তুই গ্র্যাজুয়েট। কাল আমার কাছে খবর এসেছে, তাহলে কথা দেবো ত ?

হ্যাঁ দিন্।

বাসা তাঁর কাছাকাছি। কথায় কথায় দুজনে এসে পৌঁছল। পাড়াটা অনেকটা হরিজনপল্লীর মতো। নিকটে কাছাকাছি কোথাও আভিজাত্যের চিহ্ন নেই! ভাঙা বাড়ী, নোনাধরা দেওয়াল, প্রাচীন প্রাচীরে অশ্বত্থের চারা, দরজার দু'দিকে বহুদিনের পরিত্যক্ত জঞ্জাল। বড় রাস্তা থেকে কিছু দূরে গলির ভিতরে, তাই জনসমাগম কম! দুই চারিটা পাখার কিচিমিচিতে রৌদ্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন আরো যেন নিস্তব্ধ মনে হোলো। হরিহর বললেন, ভেতরে আয়।

ভিতরে গিয়ে সুরপতি দাঁড়াল। এত বড় বাড়ীতে কোথাও কেউ নেই। কালো কালো সুড়ুঙ্গের মতো ঘরগুলি অনির্দ্দিষ্ট কালের অব্যবহৃত। ভাঙা দালান, ফাটলধরা ছাদ, উইধরা জানালা ও দরজা, কোনো কোনো ঘরের চৌকাঠ পর্য্যন্ত শেওলা উঠেছে। দিনের বেলাতেও পোকা-মাকড়ের অবারিত আনাগোনা। হরিহর সেইদিকে তাকিয়ে বললেন, বাড়ীখানা প'ড়ে রয়েছে, এবারের কালবৈশাখীতে আর হয়ত টেঁকবে না। কেই বা দেখে কেই বা তদ্বির করে। আমি ত ভবঘুরে।

সুরপতি বললে, আপনি কেন সংসার করলেন না হরিহর-দা ?

তার মানে বিয়ে ? রামো ! ওকাজ কখনো করতে আছে রে ?

আপনার কি ভালো লাগে না ?

না, সহ্য করতে পারিনে। ওসব সুখী লোকের জন্য ; বিয়ের জন্যে তারা জন্মায়, সন্তান রেখে তারা মরে। আর তা ছাড়া স্ত্রীলোকের বোঝা, বড় ভারি। পুরুষের জীবনে তাদের স্থানও কম, দামও অল্প। নে চান ক'রে, কুয়োর জলটা খুব ঠাণ্ডা। খেয়ে দেয়ে বাড়ী যাবি ত ?

তাই ত যাবার কথা।

তাই যা, কাজটা তোর হয়েই যাবে। দিন তিনেক বাদে সেখানে যাস্, আমি ইতিমধ্যে ব'লে রাখব। টাকা চল্লিশেক মাইনে দেবে, আমার মনে হয়। কিন্তু বাড়ীটা যে তোকে ছাড়তে হবে সুরপতি ? ছাত্র দুটি-কে নিয়ে সর্ব্বক্ষণ থাকতে হবে, এই কড়ারে চাকরি পারবি ত ?

পারব, আপনি ব'লে দেবেন।

বাড়ীর মায়া মমতা ?

ও আমার নেই।

হরিহর হাসলেন। বললেন, মায়া মমতা নেই একি কখনও হতে পারে রে ? মায়া মমতা থেকেই ত জন্ম আমাদের। তোকে আনলে কে সং-সারে ? পালাবি কোথায় এদের ছেড়ে, সবদিক থেকেই যে টানছে। তোর কাজের মূলেও ত এই। নিজের জন্যে ত সামান্য, পরের জন্যেই যে সব। যাক সে কথা, চান্ ক'রে নে ভাই। দাঁড়া কাপড় এনে দিই।

সুরপতি স্নান ক'রে উঠল।

হরিহর বললেন, অনেক অসুবিধে হবে কিছু মনে করিসনে। আমার যা কিছু সব দেশ বিদেশে ছড়িয়ে আছে। পরিব্রাজকের জীবন, ছন্দ এলো না জীবনে। উপকরণ সব রয়েছে, নৈবেদ্য সাজানো হ'ল না।

কেন এমন হোলো আপনার ?

হবার কথা নয়, তবু হোলো সুরপতি। কৈফিয়ৎ কিছু নেই ভাগ্যের চক্রান্ত। এক একজনের এমনই হয়। আয় খেয়ে আসি।

এদিকে ওদিকে কেউ কোথাও নেই। দুটি প্রাণীর গলার আওয়াজে মাঝে মাঝে এই বিশাল রহস্যপুরীর ভিতরে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। গোটা দুই ঘর পার হয়ে তারা এলো আর একটা অন্দর মহলে। চারিদিকে জঙ্গল, ভিতরে কোথাও জন্তু জানোয়ার সাপ-ব্যাঙ লুকিয়ে থাকা বিচিত্র নয়। দিনের বেলাতেও কোথায় যেন ঝিঁঝিঁ ডাকছে। কোথাও ঝুলছে চামচিকে, কোথাও মাকড়সার জাল, দালানের কড়িকাঠের কাছে বোল্‌তার চাক, তার পাশ দিয়ে দেওয়াল বিদীর্ণ ক'রে অশ্বত্থ গাছের শিকড় দরজা পর্য্যন্ত নেমে এসেছে। যেন সন্যাসীর জটা। দুজনের পায়ের শব্দ পেয়ে একটা কালো বিড়াল পাশ দিয়ে চলে গেল।

আপনি এখানে থাকেন হরিহর-দা?

চোখে মুখে সুরপতির অদম্য কৌতুহল দেখে হরিহর আবার হাসলেন বললেন, থাকিনে। মাঝে মাঝে এসে বাসা বাঁধি। স্থায়ী ত নয়, যে দিন খুসি চ'লে যাই। এইযে, এই ঘরে আয়।

এ বাড়ীতে এক ঘণ্টাও যে বাস করা যায় না এই কথাটা প্রকাশ করবার আগেই যে-দৃশ্য সুরপতির চোখে পড়ল তা'তে সে একেবারে স্তম্ভিত। মেঝের উপর অতি পরিচ্ছন্নভাবে অপ্রত্যাশিত আহারের আয়োজন। এমন বিভিন্ন প্রকারের আহার্য্য কেবল গৃহস্ত ঘরের সুনিয়ন্ত্রিত রন্ধনশালাতেই সম্ভব। সুরপতি কাঠ হয়ে দাঁড়াল। এ যেন যাদুবিদ্যা ইন্দ্রজাল। তার আর ভাববার কিছু নেই। ভাববেই বা কি? সে শিশু, অনভিজ্ঞ, অর্ব্বাচীন। পৃথিবীর সব কিছু তার কাছে বিচিত্র, বিস্ময়। তাকে এখন শিখতে হবে, জানতে হবে অনেক। আপন শক্তির সম্বন্ধে তার ছিল একটা অভিমান, অহঙ্কার সেটা তার ভাঙল। তার চেয়ে নগণ্য আর কেউ নেই, তুচ্ছ সে, অকিঞ্চন

সে। পরের কাজে সে বাঁচবে, কিন্তু তার আগে নিজেকে মানুষ করা দরকার।

আহারাদি শেষ ক'রে উঠে হরিহর বললেন, চল্ তোকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি। এসে কাজে বসব।

কিছু দরকার নেই হরিহর-দা, আপনি একটু বিশ্রাম করুন। আমি এখন বাড়ী যাব না। ক্যাম্পে গিয়ে আমাকে হাজরে দিতে হবে।

হরিহর বললেন, আমার এসব দেখে তুই যেন অবাক হয়ে গেলি মনে হচ্ছে?

সুরপতি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কেবল বললে, আবার আমি আপনার কাছে আসব। আমার কাজের জন্য ব'লে দেবেন ত? আমি একটু স্বার্থপর হব হরিহর-দা।

হরিহর হেসে বললেন তা'হলে ত ভালই হয়। আচ্ছা সেখানে এখনই একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি। না গেলেও চলে, চিঠিতেই কাজ হবে। দিন ~~দুই~~ বাদে সেখানে যাস।

সুরপতি তাঁকে প্রণাম ক'রে উঠে চ'লে যাবার আগে তিনি বললেন, সবাই যে পথ দিয়ে হাঁটে সে-পথে যারা চলে না তাদের কি হয় জানিস সুরপতি? তারা যায় বিপদ থেকে বিপদে, কাঁটা থেকে কাঁটায়। তাদের ছন্দ ভাঙে, কলজে ফাটে, নোঙড় ছেঁড়ে, জীবন বানচাল হয়—তাদের আর কিছু থাকে না। দুর্গমকে উত্তীর্ণ হবার কাজ বিধাতা সবাইকে দেন না।

সুরপতি আর একবার দাঁড়াল।

হরিহর বললেন, ফিরে যা ভাই শৃঙ্খলার জীবনে, আসিস্‌নে এদিকে। অনেক যাবে পাবিনে কিছু, বুকের রক্ত চোখের জল হয়ে নামবে! যন্ত্রণায় শীর্ণ হয়ে যাবি।

ধীরে ধীরে সুরপতি বাইরে বেরিয়ে এলো। মনে হতে লাগল, এক গর্জ্জমান তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্র তাকে পার হতে হবে। চোখে মুখে তার অসহায়তা,—

কোন্ কর্ণধার তাকে পার ক'রে দেবে ? কি করবে নিজেকে নিয়ে ? যাবে কোন্ দিকে ?

দরজা থেকে নেমে দেখ্‌ল পথ নির্জ্জন ; রৌদ্রময়। বেদনায় আর অতৃপ্তিতে তার চোখ যেন ভ'রে এসেছে। পা বাড়িয়ে এলোমেলো হাঁটতেই হঠাৎ পাশ থেকে মৃদুকণ্ঠের আওয়াজ এলো,—শুনুন ?

ফিরে দেখ্‌ল, জানলার ধারে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে ব্যাকুল হয়ে তাকে ডাক্‌ছে সুরপতি সচেতন হ'য়ে বল্‌লে, আমাকে ডাকছেন ?

হ্যাঁ, একবারটি শুনুন ?

এগিয়ে গেল সুরপতি। দেখলে পাতালবাসিনী রাজকন্যা। পরণে শতচ্ছিন্ন একখানা নীলাম্বরী, তা'তে লজ্জা ঢাকেনা, গায়ে জামা নেই। মাথায় চুলের রাশ শরীরের খানিকটা আবরু বাঁচিয়েছে। করুণ শান্ত মুখশ্রী একখানা হাত খালি, আর একহাতে একগাছা কাঁচের চুড়ি। মেয়েটি উদ্বিগ্ন ও ভীতকণ্ঠে বল্‌লে, আমাকে বিপদে ফেলেছেন উনি, আপনিও বিপদে পড়বেন,—আর আস্‌বেন না ওঁর কাছে। বুঝলেন, খুব সাবধান।

বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখ সুরপতির। এমন রূপ আর কখনো তার চোখে পড়েনি। স্বপ্নও নয়, মায়াও নয়,—যেন শাপভ্রষ্টা দেবকন্যা। সুরপতি আত্ম-সম্বরণ ক'রে বললে, হরিহর-দার কথা বল্‌ছেন ?

হ্যাঁ। মেয়েটি পুনরায় ভয়ার্ত্ত চোখে চেয়ে বল্‌লে, মানুষকে বিপদে ফেলাই ওঁর কাজ। আপনি কিছু জানেন না তাই সাবধান করছি। যান, আর দাঁড়াবেন না।

মুহূর্ত্তমাত্র, তারপরেই জানলাটা নিঃশব্দে দ্রুত বন্ধ হয়ে গেল।

দুই

কিছুকাল কাট্‌ল। সুরপতির মা গেলেন মারা। একান্নবর্ত্তী পরিবারের চাকায় অন্যান্য ভাইবোনেরা পাক খেয়ে খেয়ে মানুষ হতে লাগল। পিতা কিছু উদাসীন প্রকৃতির, অর্থাৎ এক হাতে ধর্ম্ম কর্ম্ম ও অন্য হাতে বিষয় সম্পত্তির তদারক—এই নিয়ে তিনি সংসারের একান্তে স'রে রইলেন।

সুরপতির মনে একটি মুক্তির স্বাদ আছে। সহসা তাকে মাতৃবৎসল পুত্র বলা কঠিন, তাকে চেনা যায় না। পিতৃপরিচয় দিয়ে সে যে কোনো সমাজে গিয়ে দাঁড়াবে এমন আশা তার সম্বন্ধে করলে সে অত্যন্ত দুঃখিত হবে। তাই মায়ের মৃত্যুর পর সে মনে করলে, তার একটা কঠিন বাঁধন কাটা গেল। বাপের চেয়ে মায়ের আশ্রয়টা সন্তানের পক্ষে মোহময়। সেই মোহ থেকে সহজে উত্তীর্ণ হয়েছে মনে ক'রে সুরপতি নিজের কাছেও যেন খানিকটা সহজ হয়ে দাঁড়াতে পারল। এর পরে রইল পিতাপুত্রের যোগসূত্র। কিন্তু বত্রিশ নাড়ির সম্পর্কের চেয়ে রক্তের সম্পর্কটা দুর্ব্বল, সুতরাং পিতা যে জীবিত আছেন এ সম্বন্ধে সুরপতির বিশেষ কোনো উদ্বেগও নেই। সে স্বেচ্ছানির্ব্বাসন বরণ করলে।

খুড়িমা তাকে ডাকলেন, কিন্তু সে রাজি হোল না। তাঁরা ভাবলেন, মায়ের মৃত্যু আর বাপের বৈরাগ্য এর জন্য সুরপতি হোলো ঘরছাড়া। ভাইবোনেরা টানতে শেখেনি, তারা প্রত্যেকেই বিচ্ছিন্ন। সুতরাং কোনদিকে সুরপতির ভ্রূক্ষেপ করবার অবকাশ নেই। এমনি করেই সংসার ডিঙিয়ে সে একাকী জীবনের অবাধ পথে এসে দাঁড়াল। এবার একদিকে সে নিশ্চিন্ত!

গৃহশিক্ষকতাটা তার ধাতে নেই। এত বড় অহঙ্কার সে করবে না যে, সে কারো শিক্ষক হবে। হোক শিশু, শিশুকে শিক্ষা দেওয়া অতি কঠিন। কিন্তু

হরিহর দাদার সাহায্যটা তার কাজে লাগল। জমিদারের দুটো ছেলেকে পড়িয়ে হাতে তার কিছু অর্থ এলো। আহার এবং বাসস্থান জমিদার প্রাসাদের একান্তে।

মাঝখানে একটা ছোট্ট ঘটনা বল্‌ব। সে এই পরিবার সংক্রান্ত। একদা সন্ধ্যায় বালক দুটিকে নিয়ে সুরপতি পড়াশুনোয় ব্যস্ত, এমন সময় এসে ঢুকলেন চিত্রলেখা। বয়স আঠারোর বেশি নয়, কিন্তু দেখায় কুড়ি বাইশ। চিত্রলেখার সঙ্গে সুরপতির আলাপ হয়েছিল অল্পই। কিন্তু তাঁর অকারণ আনাগোনায় সুরপতি ক্ষুণ্ণ হোতো। সেদিন সন্ধ্যায় সে ফস্‌ ক'রে বল্‌লে, আপনি যদি গল্প করতে বসেন তবে এদের পড়া হবে না। এদের পড়ানোই আমার কাজ।

চিত্রলেখার অসম্মানিত মুখের দিকে সে চেয়ে দেখার দরকারও বোধ করলে না। ছাত্রদুটি স্তম্ভিত শঙ্কায় মাথা হেঁট ক'রে পড়তে লাগল।

সে আমি জানি।—ব'লে চিত্রলেখা গেলেন ঘর থেকে বেরিয়ে। সেই থেকে আঘাতে সমস্ত মনটা তাঁর জ্বালা করছে। এ ঘটননাটা ঘটেছিল মাস দুই আগে।

দুপুরের দিকে সুরপতির অবকাশ। এই সময় তার ভ্রমণ, তার কল্পনা, তার দিবাস্বপ্ন। নিজের পড়াশুনো তার রাত্রের দিকে। কোনো কোনোদিন তন্দ্রাও আসে চোখে।

সেদিন বাইরে থেকে দরজায় পড়ল ধাক্কা। সুরপতি এসে দরজা খুল্‌লে। খানিকটা চমক লাগল। একটি মেয়ে তাকে নমস্কার ক'রে দাঁড়াল। বল্‌লে, আমাকে চিন্‌তে পেরেছেন ত?

হ্যাঁ, পেরেছি। সেই হরিহর দাদার ওখানে—

আপনার কাছে এসেছি বিশেষ দরকারে। তাঁকে যখন আপনি দাদা বলেন তখন আমি একটু সহজ হয়ে কথা বল্‌তে পারি। ভেতরে কি আমাকে বস্‌তে দেবেন?

হ্যাঁ, আসুন!

চৌকিখানায় এসে বস্‌ল মেয়েটি, সুরপতি দাঁড়াল সম্মুখে! মেয়েটি বল্‌লে, তা হবে না, বস্‌তে হবে আপনাকে, বল্‌ব অনেক কথা! আপনি বোধ হয় অবাক্ হয়ে গেছেন আমি এসেছি দেখে?

সুরপতি একখানা চেয়ার টেনে বস্‌ল! বল্‌লে, কি কাজে এসেছেন বলুন?

বস্‌বার আগে সাহস পাওয়া চাই বল্‌তে পারি কিনা। হয়ত আপনি বিরক্ত হবেন! ঠিকানাটা পেয়েছিলুম তাঁর কাছে, পথে জিজ্ঞেস ক'রে আসতে হয়েছে। সেদিন আমিই ডেকে আপনার সঙ্গে কথা বলেছিলুম! দেখে মনে হয়েছিল আপনি ওঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করেন!

তা করি! উনি চিরদিন আমার কাছে বড়!

ভয় নেই আপনার, সেই শ্রদ্ধা আমি নষ্ট করতে আসিনি!—মেয়েটি অল্প হেসে গায়ের চাদরে মুখখানা মুছে ফেল্‌লে! রোদের তাতে সারা মুখখানায় রক্ত জমে উঠেছে!

আচ্ছা, উনি কে হন্ আপনার সুরপতিবাবু?

আত্মীয়তা কিছু নেই! সুরপতি বল্‌লে।

আত্মীয়তা আমারো কিছু নেই ওঁর সঙ্গে, যাক্ সে কথা! আমি এসেছিলুম, —আপনি কি ওঁর কোনো খোঁজ খবর রাখেন?

সুরপতি বল্‌লে, খোঁজ খবর রাখতে গেলেও পাওয়া যায় না! উনি বিচিত্র! কাজের মানুষ, কিন্তু স্বার্থলেশহীন!

কথায় বাধা ঘট্‌ল। মহিলা বল্‌লেন, এখন কোথায় আছেন বল্‌তে পারেন?

না! মাস দুই আগে একবার দেখেছিলুম! আমার চেয়ে আপনারই ত জানার কথা!

আমি জান্‌ব? হা ভগবান! জান্‌বই যদি তবে আস্‌ব কেন? এক বাড়ীতে থাকলেই কি মানুষের চরিত্র নখদর্পনে রাখা যায়? আপনি যা জানেন আমি তাও জানিনে সুরপতিবাবু! বিপদ আমার সেইখানে!

সুরপতি বল্‌লে, আত্মীয়তা আপনার সঙ্গে কিছু নেই এ কেমন কথা? আপনি কে তবে?

কেউ নয়। ছিলুম গণ্ডীর মধ্যে, মায়ামৃগর পিছু পিছু ছুটে এসেছি।—বল্‌তে বল্‌তে তার চোখে অশ্রু এলো।

এটা যেন মায়া। দুপুরের রোদ, নির্জ্জন ঘর, নিরবচ্ছিন্ন নিঃশব্দতা, সমস্তটা তালগোল পাকিয়ে তরুণ সুরপতিকে বিভ্রান্ত ক'রে তুল্‌লে। এমন হয় জীবনে। বিশেষ দিনের বিশেষ মুহূর্ত্তের অপ্রত্যাশিত ঘটনা সচরাচর জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখেনা। এর নাটকীয়তা নিজের কাছেও অবিশ্বাস্য। আগামী কাল এই ঘটনাটাই স্বপ্ন ব'লে মনে হবে। সুরপতি নির্ব্বাক হয়ে রইল।

মেয়েটি আবার কথা বল্‌লে, ওই পোড়া ভূতের বাড়ীতে কাটছে দিনের পর দিন। কেন—এর কৈফিয়ৎ আপনার দাদার কাছে নেই। কুড়ি দিন তিনি নিরুদ্দেশ। সেবার বল্‌লুম, চল্‌বে কেমন ক'রে? আমার একটা উপায় করুন?—তিনি হাস্‌তে হাস্‌তে ব'লে গেলেন, মায়ালতা, তুমি আমাকে চিন্‌তে পারোনি।

সুরপতি বল্‌লে, আমাকে বিপদে ফেল্‌তে পারেন একথা আপনি বলেছিলেন কেন?

মায়ালতা বল্‌লে, এই তাঁর কাজ। এই তাঁর খেলা। ছেলেমেয়েদের জীবনে বিশৃঙ্খলা এনে দিয়ে চ'লে যাওয়াতেই তাঁর আনন্দ। দায়ে ফেলেন, দায়িত্ব নেন্ না। আপনার কাছে আমি সাহায্যের জন্য এসেছি সুরপতিবাবু।

কি সাহায্য বলুন?

অচল অবস্থায় পড়েছি। ফিরেও যেতে পারব না, এগোবারও পথ নেই। আপাততঃ অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থাটা না হ'লে আর চল্‌ছে না।

সুরপতি স্তম্ভিত বিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে রইল। সেই জীর্ণ নীলাম্বরখানি পরণে, গায়ে বোধ করি ওখানা বিছানারই চাদর, শুষ্ক মুখ, অপরিচ্ছন্ন আকৃতি,—দারিদ্র্যটা যেন রূঢ় হয়ে চোখে বিঁধছে। বললে, চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি! কোনো চিন্তা নেই, আমি আপনার অন্নবস্ত্রের ভার নিলুম।

মায়ালতা হেসে বললে, এত বড় অহঙ্কার আপনাকে করতে দেবো না। সাহায্য চাইব, দয়া চাইব না। ফিরিয়ে দেবার দিন যখন আসবে, অসঙ্কোচে আপনি হাত পেতে পাওনা বুঝে নেবেন এই প্রতিশ্রুতি আমাকে দিতে হবে।

আচ্ছা দিলুম।

মায়ালতা উঠে দাঁড়াল। বললে, দিন্ টাকা।

কত ?

দশ টাকা দিন্।

বাক্স খুলে সুরপতি দশ টাকা মায়ালতার হাতে দিল। তারপর বললে, দাঁড়ান, আমি ব্রাহ্মণ, অমনি মুখে আপনাকে ফিরে যেতে দেবো না। কিছু জলযোগ ক'রে যেতে হবে।

বেশ, তাই সই। আনান্।

বাঁচার মতো ক'রে বাঁচতে চেয়েছিল সুরপতি। একটি অসাধারণ পরিতৃপ্তি নিয়ে সে ঘরে ফিরে এলো। সামান্য কাজ, একটি মেয়ের কিছু সুবিধা ক'রে দেওয়া মাত্র, কিন্তু এইটুকুর ভিতর পাওয়া গেল অখণ্ড আত্মপ্রসাদ, তার সঙ্গে কিছু কৃতজ্ঞতা জড়ানো। এমন ঘটনা ঘটেনি তার জীবনে: এমন মেয়ে সে দেখেনি, যে সংসারের ছন্দ ডিঙিয়ে আত্মস্বাতন্ত্র্যের জন্য ছুটে এসেছে। কিছুই সে দেখেনি, কিছুই জানেনি। প্রতিদিন তার নূতন জন্ম হচ্ছে, নূতন ক'রে দেখছে মানুষ, নূতন আলো এসে পড়ছে চোখে।

হরিহরদাদার সত্য চেহারাটা তার জানা ছিল না। এবার জানলে, শ্রদ্ধা বাড়ল। এই ত সকলের চেয়ে বড় কাজ—অভিজ্ঞতার দিকে ঠেলে দেওয়া, নিজের মূল্য সম্বন্ধে সচেতন করা, কঠিন পরীক্ষায় ফেলা। হরিহরের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার ভিতরে সুরপতি এই শিক্ষাই পেলে। মায়ালতার বিরুদ্ধ মত তার মনে প্রভাব বিস্তার করলো না।

দিন ফুরোলো, সন্ধ্যা হলো। ছাত্রদের ডাকতে পাঠাল কিন্তু ছাত্ররা এলো না। চাকর এসে খবর দিল, ভিতরে আপনাকে ওঁরা একবার ডাকছেন।

সুরপতি অন্দর মহলে গিয়ে দাঁড়াল। মা দূরে বসেছিলেন, সুরপতিকে দেখে আজ আর কথা বললেন না, কেবল মাথার ঘোমটা একটু টেনে দিলেন। মেজকর্ত্তা ব'সে ব'সে টানছিলেন গড়গড়ায় তামাক। নলটা নামিয়ে তিনি সুরপতির দিকে চেয়ে বললেন, দাঁড়িয়ে কেন, বসো বাবা।

অভ্যর্থনা হ'লেও হাওয়াটা অনুকূল মনে হোলো না। সুরপতি বললে, ছেলেরা পড়তে গেল না কেন?

চিত্রলেখা ফিস ফিস ক'রে মা'র কানে কি যেন বললে। সরকার মশাই আলোর কাছাকাছি ব'সে হিসাব দেখছিলেন, এবার মুখ তুলে বললেন, এঁরা বলছিলেন, এবার আপনার কাজে জবাব দেওয়াই ভালো।

কেন?—সুরপতি বিস্মিত হয়ে তাকালো।

বলুন না কর্ত্তাবাবু, বলতে ত আর কোনো অপরাধ নেই। আচ্ছা আমিই বলি। দেখুন, আপনার কাছে পড়লে ছেলেদের সৎশিক্ষা হবে না মাষ্টার মশাই।

সুরপতি বললে, কেমন ক'রে জানলেন?

জানতে পারা গেল বৈ কি। এই ধরুন, আজকের দুপুর বেলাকার কাণ্ডটা! চিত্রলেখা দেখতে পেয়েছিল তাই জানা গেল নৈলে দুপুর বেলা দরজা বন্ধ করে···এটা ত ভদ্রের মাষ্টার মশাই! মেয়েমানুষ নিয়ে বন্ধ ঘরের মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা···আপনিই বলুন না!

সুরপতি কম্পিত কণ্ঠে বললে, আমি ত কোনো অন্যায় করিনি!

সরকার মশাই উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন। সে-হাসিতে পাথরে চিড় খায়, বুকের রক্ত জ্বালা করে, বিশ্বাসের ভিত্তি ওঠে কেঁপে।

সুরপতি আপন চাঞ্চল্য সংযত ক'রে বললে, সেই ভালো। কাজে আমি জবাবই দিলুম।—ব'লে সকলের উদ্দেশে একটা নমস্কার জানিয়ে সে বেরিয়ে গেল।

বারমহলে এসে সুরপতি একবার দাঁড়াল। ঘরের মধ্যে তার নিজের সম্পত্তি বলতে কিছু নেই, কিছু আরামের উপকরণও ছিল—গ্রহণ করতেও যেমন দ্বিধা নেই, বর্জ্জন করতেও তেমনি বাধা নেই। ভিতরে ঢুকে টাকাকড়ি ও কাপড়চোপড় কিছু নিয়ে সে সেই সন্ধ্যায়ই বাড়ী ছেড়ে চ'লে গেল। সরকার মশাই পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। চিত্রলেখা উপরের জানলায় দাঁড়িয়ে তার পথের দিকে চেয়ে রইল।

ঘুরতে ঘুরতে রাত্রে সুরপতি বাড়ী এসে পৌছল, চেহারাটা যেন তার বদলে গেছে। শুষ্ক কঠিন মুখখানায় বেদনাবোধের লেশমাত্র নেই। এর নাম অভিজ্ঞতা। তার বাইশ বছরটা হঠাৎ যেন তিরিশ বছর বয়সে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু বাজতে লাগল মনে আজকের অকারণ অপমানটা। তার মুখে যেন কালি মাখিয়ে দাগ দেগে দিয়ে বললে, তোমার চরিত্র ভালো নয়। এ যেন একটা ষড়যন্ত্র। তার কাজ নেই, তার পথ নেই। নিজের ঘরে ব'সে সমস্ত রাত সে আকাশের তারার দিকে চেয়ে রইল। ঘরের আলো জ্বালা নেই। আশেপাশে কোথাও কারো চোখে মুখে স্নেহের ইঙ্গিত নেই। সুরপতি একটা এলোমেলো বিছানায় শুয়ে ভাবতে লাগল তার ভবিষ্যৎ জীবনের অস্পষ্ট চেহারাটা। লক্ষ্যটা তার এখনও ঠিক হয়নি, কেবল মাত্র ভাঙন ধরেছে, বিদ্রোহ জেগেছে। বোঝা গেল, মাথা তুলতে চাইলেই মাথা ওঠে না, বিরুদ্ধ অবস্থার ভিতর দিয়ে পথ কেটে যাওয়াটাই মানুষের এক মাত্র কাজ।

তরুণ মন, তবু আজকের ঘটনায় স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সুরপতি সতর্ক হয়ে গেল। প্রথম অপমানের মার খেলে সে স্ত্রীলোকের হাতে, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে তাহার চক্ষু যেন সজাগ থাকে। চিত্রলেখার মতো মেয়েকে সে যেন আগে থেকেই চিনে রাখতে পারে।

সকাল বেলা উঠে সে সোজা চ'লে এলো মায়ালতার ওখানে। পুরনো বাড়ীর দরজাটা খোলা থাকে অবারিত। কোনো মানুষ এ বাড়ীতে ঢুকতে

সাহস করে না, বিড়াল কুকুরও ঢোকে বিশেষ প্রয়োজনে। পায়ের শব্দ পেয়ে মায়ালতা ভিতর থেকে বললে ; আসুন, এই ঘরে।

সুরপতি একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললে, এই বাইরেই বসা যাক্ না।

মায়ালতা বললে, বসতে আপনাকে বলা হচ্ছে না, কাজের জন্য ডাকছি। আপনার যে বয়স তা'তে মেয়ে মানুষের হুকুম তামিল করতে ভালো লাগবে। আসুন।

সুরপতি হেসে বললে, সে ভালো লাগাটা কাল পর্য্যন্ত ছিল কিন্তু আজ আর নেই।

কেন? আমার জন্যে?

হ্যাঁ।

মায়ালতা বাইরে এসে দাঁড়াল। বললে, ভেঙে বলুন। হয়েছে কি?

চাকরিটা আমার গেছে।

কারণ?

কারণ ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে আপনার সঙ্গে আলাপ করেছি, কা সেটা চিত্রলেখার চোখে পড়েছে।

চিত্রলেখা কে?

জমীদারবাবুর আদরিণী কন্যা।

কত বড় মেয়ে?

আপনার চেয়ে কিছু ছোট হবেন।

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে মায়ালতা বললে, আলাপ ছিল আপনার সঙ্গে?

সুরপতি বললে, আলাপের চেষ্টা ছিল তার পক্ষ থেকে।

বুঝতে পেরেছি।—ব'লে মায়ালতা নিঃশব্দে নতশস্তকে দাঁড়াল। বেদনা তার মুখখানা বিবর্ণ হয়ে উঠল। না প্রকাশ করলে সহানুভূতি, : মুখে এলো সান্ত্বনা বাক্য। শুধু কেবল নিশ্বাস ফেলে বললে, এখন তে বাড়ীতেই আছেন ত?

আছি কিন্তু থাকব না। কাজের সন্ধানে ফিরছি। আপনাকে জানাতে এলুম যে, আপনি আর ওখানে যাবেন না। বরং আমিই আপনার এখানে—

বাইরে কড়ানাড়ার শব্দ হোলো। মায়ালতা গেল সেদিকে দ্রুতপদে। এমনো হ'তে পারে হরিহরদাদা এসেছেন। সুরপতি উৎকর্ণ হয়ে বসে রইল।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এলো মায়ালতা। সুরপতি বললে, কে?

একটি ভদ্রলোক।

আপনার আত্মীয় বুঝি?

না। এই কয়েকদিন হোলো আলাপ হয়েছে। খুব উৎসাহী আর মিশুকে। একটা কাজ আমাকে দেবার আগ্রহ করেছেন। অবশ্য এ পরোপকারের কি হেতু তা জানিনে।

সুরপতি তার মুখের দিকে চেয়ে বললে, হরিহরদার অনুমতি আছে ত?

দরকার নেই। নিজের উপায়টা আমার নিজেরই হাতে। হ্যাঁ, আপনাকে ব'লে রাখি, এখানে আর আমার দেখা পাবেন না। আমি আজই চ'লে যাবো।

কোথায়?

সুরেশবাবু যেখানে নিয়ে যাবেন।

সুরপতি হেসে বললে, এটা কিন্তু মেয়েমানুষের মতো কথা হোলো। এই ব'লে সে উঠে দাঁড়াল। তারপর পুনরায় বললে, যদিও অনধিকার তাহলেও বলতে আমার বাধছে না যে, উৎসাহটা ওঁর, কিন্তু আগ্রহটা আপনার।

মায়ালতা বললে, কী বলছেন আপনি?

কিছু না, আসি আজকের মতন। এই ব'লে সুরপতি পা বাড়াল। মায়ালতা চলল পিছনে পিছনে। দরজার কাছাকাছি এসে সুরপতি একবার মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল। বললে, হরিহরদাদার চরিত্র বোঝাতে

চেয়েছিলেন, কিন্তু তার আগে বুঝতে পারলুম আপনাকে। যাই হোক একা মানুষ একটু সাবধানে থাকবেন, এটা কল্‌কাতা শহর।

এমন সময় একটি ভদ্রলোক দালান দিয়ে ঘুরে কাছে এসে দাঁড়ালেন। কিছু তাঁর বয়স হয়েছে, ত্রিশের কম নয়। মায়ালতা বললে, ইনিই সুরেশবাবু, আপনাদের আলাপ করিয়ে দিই।

সুরেশবাবু সৌখীন মানুষ। হাতে চেরীকাঠের ছড়ি, সোনার বোতাম, পরনে পাঞ্জাবী গায়ে। নমস্কার বিনিময় ক'রে হেসে তিনি বললেন, খুসি হলুম। কোথায় যেন দেখেছি মনে হচ্ছে। পুলিশ কোর্টে ওকালতি করি দরকার হ'লে যাবেন আমার কাছে।

এঁকে কি মক্কেল ঠাওরালেন? মায়ালতা বললে।

মন্দ কি! শুনেছি অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, দু'চারটে মামলা কি আর ওঁর জীবনে ঘটবে না?

সুরপতি আপন উত্তেজনাকে সংযত করলে। হেসে বললে, এমন ত হতে পারে সে-মামলায় আপনি হবেন আসামী?

কি সুত্রে?

অনধিকার প্রবেশের দায়ে?

সুরেশবাবু হেসে বললেন, ওকালতিতে আমার পসার নেই বটে, কিন্তু মিথ্যা সাক্ষী আনতে পারব অগণ্য। নিশ্চিন্ত থাকুন সুরপতি বাবু, মামলায় আপনার হার হবে।

বেশ, যথাসময়ে পরীক্ষা দেওয়া যাবে।

মায়ালতা বললে, সুরেশবাবু নানা কাজের মানুষ, নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। আশা করছি, ওঁর হাত থেকে একটা ভালো কাজ পাবো।

সুরপতি বললে, য়্যাপ্রেন্টিস্ খাট্‌তে হবে না ত?

হলেও খুসি থাকব। ভবিষ্যতের আশা করব।

সুরেশবাবু বললেন, চোখা চোখা বাণ! সম্ভবতঃ আপনাদের মধ্যে আত্মীয়তা নেই, কেমন?

বিশেষ আত্মীয় আমার। আসুন সুরপতিবাবু, আপনার আবার বেলা হয়ে গেল।

দরজার বাইরে এসে মায়ালতা বললে, রাগ ক'রে ত গেলেন গরীবের ওপর। মুখ দেখে মনে হচ্ছে এর পর বিবাগী হবেন। কিন্তু দেনা রেখে মরণ হ'লে আমার মুখ পুড়বে না যে।

সুরপতি বললে, দশটাকার জন্যে এত চিন্তা! বেশ ত, সুরেশবাবুর হাত দিয়ে টাকাটা কোনো দাতব্য প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে দেবেন।

এও আপনার রাগের কথা, আমাকে বিদ্রূপ করার ইঙ্গিত। একটা কথা আপনাকে বলব, আমি আপনাকে বড় ক'রে দেখতে চাই, অকারণে নিজেকে খাটো করবেন না।

সুরপতি ফস ক'রে বললে, হরিহরদাদার সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক?

মায়ালতা তার সঙ্গে পথে নেমে এলো। পাশে পাশে চলতে লাগল। সুরেশবাবু অপেক্ষা করবেন তার জন্য অনির্দ্দিষ্টকাল, এ কথা সে জানে। সেদিকে তার উদ্বেগ নেই। হেসে বললে, মাথায় ঘোমটা দিয়ে যাচ্ছি কিছু মনে করবেন না।

ঘোমটা ত দেবারই কথা।

না! আমি এখনো কুমারী, মনে রাখবেন।

সুরপতি তার দিকে তাকাল। অস্ফুট বিস্ময়ে বললে, আপনি বিবাহিত নন?

বিন্দুমাত্র নয়। ভাবছেন নিশ্চয় হরিহর বাবুর স্ত্রী। তিনি কেউ নন্ আমার। বন্ধু নন্, আত্মীয় নন্, হিতৈষী—না, তাও নন্। তিনি দেখিয়ে এনেছেন, এসেছি তাঁর পিছু পিছু, কোনো লক্ষ্য ছিল না।

কেন এলেন?

সেটা শুনতে চাইবেন না। সেখানে আলোর চেয়ে ধোঁয়া বেশী।

আপনাদের বাড়ী কোথায় ?

দিনাজপুরে।

কে কে আছেন ?

সবাই। মা বাবা, ভাই বোন—

সুরপতি চলতে চলতে বললে, একটা কথা কিন্তু স্পষ্ট হোলো না। আমি সব জানতে চাই আপনার। আমার স্বার্থের চেয়ে কৌতূহল বেশি। যদি বলি সবই আমার দুর্বোধ্য লাগে, কিছু মনে করবেন না! আপনি কি হরিহরদাকে ভালোবেসেছিলেন ?

মায়ালতা হেসে বললে, মেয়েমানুষের মন নানা রঙের তুলিতে আঁকিবুঁকি আঁকা। পছন্দ করেছিলুম তাঁকে গুরুর আসন দিয়ে, পথ দেখাবেন তিনি। তাঁর পুরুষত্বের কাছে আমার আবেদন ছিল না। কুমারী মেয়ের চোখে আদর্শটাই বড় থাকে, আসক্তি থাকে অনেক দূরে।

আপনি বিয়ে করেননি কেন ?

আপনার প্রশ্নটা এই, আমি নরকে যাইনি কেন? সব কথা আপনি সস্তায় জানতে চান্, তা হবে না। আচ্ছা এবার আমি ফিরব। আবার অবশ্যই দেখা হবে আপনার সঙ্গে। আমি খবর দেবো।

মায়ালতা পিছন ফিরল। সুরপতি গেল এগিয়ে। কয়েক পা দূরে গিয়ে সে পিছন ফিরে তাকাল। দেখা গেল হাসিমুখে মায়ালতা তার দিকে চেয়ে রয়েছে। রৌদ্রের আলোর অল্প দূরের ব্যবধানে তার সুন্দর দেহখানির দিকে সুরপতি অনিমেষ দৃষ্টিতে একবার চেয়ে দেখলে। রূপের তৃষ্ণা নয়, সৌন্দর্য্যোপলব্ধি। এমন ক'রে স্ত্রীজাতির দিকে সে আর কোনোদিন চেয়ে দেখেনি।

ছেলেমানুষ আপনি।—ব'লে হেসে মায়ালতা মুখ ফিরিয়ে দ্রুতপদ চ'লে গেল।

তিন

নিজের পথটা মায়ালতা চিনতে পেরেছিল। পরিবারের শৃঙ্খলে যে-মেয়ে আবদ্ধ, তার স্বকীয়তা নেই, স্বাতন্ত্র্যটা সীমাবদ্ধ। যুদ্ধে যখন সে নামল, তখন সে একা। আপন কেন্দ্রে আপনাকে নিয়ে সে স্বাধীন, মুখচা... দুর্ব্বলতাকে পদে পদে জয় ক'রে চলতে হয়। এটা ভালো কি মন্দ, নিয়ে মায়ালতার উদ্বেগ নেই, কিন্তু এটা তার আদর্শ,—এই স্বভাব তাকে পথের ইঙ্গিত করে।

বাইরে তার একটা চাঞ্চল্য আছে, সেটা চিত্তগত নয়, শারীরিক। শরীরকে উত্তীর্ণ হয়ে মন, সেখানে তার চক্ষু সজাগ। তাকে বুঝতে পারাটা সহজ, কিন্তু বুঝিয়ে দেওয়াটা কঠিন। আধুনিক দেহের ভিতরে তার প্রাচীন মন, সে জানে সে বংশপরম্পরাগত নারী।

একদা বিধিবদ্ধ জীবনের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ জাগিয়ে তুলেছিল। সে বিদ্রোহ অন্যায়ের বিপক্ষে নয়, প্রচলিত প্রথাকে সে নষ্ট করতে চেয়েছে। বিবাহটা ভালো; কিন্তু বিবাহের শাসনের কাছে আত্মসমর্পণ করাটা সে গৌরব মনে করেনি। পুরুষকে সে পছন্দ করে; কিন্তু পুরুষ মাত্রই তার পছন্দ নয়। পুরুষ সম্বন্ধে নিজের আদর্শকে সে ক্ষুণ্ণ করবে না, সেটা হবে তার অপমৃত্যু। সেই পুরুষ দুর্লভ সাধনার বস্তু, যাকে সে আজো চোখে দেখে নি।

আজ রবিবার, নীচে স্কুলে মেয়েদের ভীড় নেই। উপরতলায় সকালের দিকে নিজের ঘরে মায়ালতা একটা সেলাই নিয়ে বসেছিল। এইমাত্র স্নান ক'রে উঠেছে, ভিজে চুলের রাশ পিঠের উপর ছড়ানো। একটা সস্তা দামের তেলের গন্ধ ঘরের হাওয়ায় মিশে রয়েছে কিন্তু চুলের গুণে সে-গন্ধটাকে মধুর

বল্‌ব। চোখে তার কোনো প্রতীক্ষা নেই, তাই পরিধানের বসন সম্বন্ধে সে সতর্ক ছিল না। কাছেই একখানা খোলা বই, মাঝে মাঝে বাতাসে পাতা ওল্‌টানোর শব্দ হচ্ছে। কাছেই কিছু ফলমূল আর একবাটি চা, চা-টা জুড়িয়ে গেছে।

গৃহস্থালীর বর্ণনাটা অবৈধ হবে না। পুরুষের সম্পর্ক না থাকলে মেয়েদের ঘরের জঞ্জাল জমে। কিন্তু এঘর তেমন নয়। এখানে শিক্ষয়িত্রী থাকেন তাঁর প্রবল শাসন আর শৃঙ্খলা নিয়ে। সামান্য গৃহসজ্জা, কিন্তু সেগুলি সুবিন্যস্ত। নিত্য প্রয়োজনের আস্‌বাব ছাড়া ঐশ্বর্য্যের আবাস কোথাও কিছু নেই। কেরোসিন কাটের বাক্সটার চেহারা ফিরিয়ে তাকে ঘরের মধ্যে একটি প্রধান স্থান দেওয়া হয়েছে।

বাইরে পদশব্দ হোলো। সেলাইটার দিকে মনঃসংযোগ ক'রে মায়ালতা বললে, ক্ষেমীর মা, খাবারের থালাটা নিয়ে যাও, কাল নিমন্ত্রণ খাওয়ার জের চলছে, ও আর আমি ছোঁব না।

কিন্তু মুখ তুলে চেয়ে দেখা গেল ক্ষেমীর মা নয়, মায়ালতা সচকিত সতর্কতায় সোজা হয়ে বসল। বললে, অমরেশবাবু, এমন সময় যে? আসুন—

আসন পেতে দেবার ঘটা তার নেই। সে ইতিমধ্যেই জানতে শিখেছে পুরুষ আসন চায় না, বসতে চায়। অমরেশ ভিতরে ঢুকে মেঝের উপরেই বসল। বললে সকাল্‌ বেলা কোনোদিন আসিনে তাই বুঝি চম্‌কে গেছেন?

মায়ালতা হেসে বললে, চমকে যাই অন্য কারণে, আপনার আসার জন্যে নয়। সুরেশবাবুর খবর কি?

তিনি বেরিয়েছেন দরিদ্র-বান্ধব-সমিতি চাঁদা আদায় করতে, যাবার পথে হয়ত আপনার এখানে হয়েই যেতে পারেন।

কোনো কাজ আছে কি?

না, এমনি। তিনি ত ছুটির দিন আপনার এখানেই অনেকটা সময় কাটান্‌।

মায়ালতা বললে, এটা রটনা, ঘটনা নয়। আপনি নিজে যতখানি সময় থাকেন তিনিও তার বেশী থাকেন না। দশ মিনিটকে দশ ঘণ্টা বলতে বুঝি আপনাদের ভালো লাগে ?

অমরেশের বয়স অল্প, মনস্তত্ত্বের গভীরতর পাঠ তার পড়া নেই। তাই কথাগুলোকে শাসন ব'লে সে মেনে নিলে। চুপ ক'রে রইল। মেয়েদের কটু কথা নতমস্তকে মেনে নিলে ভবিষ্যৎটা নাকি উজ্জ্বল। মায়ালতা বললে এতদিন আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছে, কিন্তু ব্যক্তিগত কথা জিজ্ঞাসা করা হয়নি। কে কে আছেন আপনার ?

আছেন সবাই, তাঁরা থাকেন দেশে। আমি এই বছর দুই হোলো কলকাতায় রয়েছি।

কলেজে পড়েন ?

পড়ি আর্ট স্কুলে। ওই যে কাল আপনাকে য়্যাল্‌বামটা দেখতে দিয়ে গেছি—ওর ছবিগুলো সব আমারই আঁকা। ওগুলো দেখেছেন ?

মায়লতা বললে, খুঁটিয়ে এখনো দেখিনি। আচ্ছা, আমাকে মডেল ক'রে আপনি ছবি আঁকতে পারেন ?

অমরেশ খুসি হয়ে হেসে বললে, আঁকতে চাই বলেই ত ঘুরে ঘুরে আসছি ! আপনাকে আঁকাই আমার একমাত্র সাধ।

বলতে বলতে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল ; তার চোখে মুখে প্রাণের উল্লাস, মদির মোহের আবেশ। তরুণ সুন্দর মুখ, সে-মুখে রূপ-পিপাসুর ব্যাকুলতা। বললে, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ; আমার ইচ্ছেটা এত সহজ আপনি ধরেছেন। আমার য়্যাল্‌বামটা একবার দেখুন, ফিগার আঁকতে ভালোবাসি কিন্তু ব্যাকগ্রাউণ্ডের দিকে আমার বেশি ঝোঁক। তুলি আন্‌লে এখনই আঁকতুম আপনাকে। সকালের আলো এসে পড়েছে ঘরে, আকাশে মেঘের আয়োজন, জান্‌লা দিয়ে দেখা যাচ্ছে দূরে বনান্তরেখা ··· বিশাল চালচিত্রের মতো আপনার এলোকরা চুল ··· আমি—আমি খুব ভালো ক'রে আপনাকে আঁকতে পারি মায়াদেবী—

মায়ালতা উঠে গিয়ে য়্যালবামটা নিয়ে এলো। একে একে অনেক গুলো ছবি উল্টে দেখে বললে, এর সবই ত মেয়ের ছবি, অন্য ছবি কি আঁকতে আপনার ভালো লাগে না?

অমরেশ বললে, যাদের খানিকটা চিনি খানিকটা বুঝি তাদের প্রকাশ করতে ভালো লাগে। তুলিটা হাতের, কিন্তু রংটা মনের। নানা রসে তারা আমার কল্পনাকে অনুপ্রাণিত করে। মেয়েদের রূপের মধ্যে রয়েছে প্রকৃতির সুদূর রহস্যময়তা।

ক্ষেমীর মা দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। বললে, উনুন ধ'রে গেছে দিদিমণি।

যাচ্ছি ক্ষেমীর মা, তুমি যাও। তারপর হেসে মায়ালতা বললে আপনি শুধু শিল্পী নন্ কবিও বটে। কিন্তু কবির সংখ্যা আমাদের দেশে অনেক এটা বোধ হয় মাটির গুণ।

অমরেশ হেসে বললে আমি কবিতাও লিখি।

লেখেন? তবে ত' সোনায় সোহাগা!

সলজ্জ হেসে অমরেশ বললে আপনার উপরে একটা কবিতা লিখেছি।

বেশ করেছেন। অন্যায় কিছু লেখেন নি ত? আমি বোধ হয় আপনার চেয়ে বয়সে বড়, এ কথাটা মনে রাখবেন।—মায়ালতা আবার য়্যালবামটা ওল্টাতে লাগল।

অমরেশ বলতে লাগল বয়সে বড় কিনা জানিনে, কিন্তু জ্ঞানে বড়, গরিমায় বড়। আপনাকে সকল রকমে বড় ক'রে দেখতে পার্‌লেই আমার মন খুসী হয়। আমার ধারণাই ছিল না এত সহজে আপনাকে দেখতে পাবো।

হেসে ভ্রূকুঞ্চন ক'রে মায়ালতা বল্‌লে, কি রকম?

অমরেশ বল্‌লে, খুব সত্যি কথা। অধঃপতিত জাত মেয়েদের স্বতন্ত্র ক'রে দেখতে শেখেনি, তাদের ব্যক্তিত্বটা হাসির কথা। এর মাঝখানে এলেন

আপনি। যেন প্রচলিত বিধিব্যবস্থার মূর্ত্তিমতী প্রতিবাদ। বিশ্বাস করতে বাধ্‌ল না, মেয়ে শুধু মেয়ে নয়, তারা মানুষ।

এ ধারণা আপনার কেন হোলো ?

কেন হোলো ? আপনার মতো আছে ক'জন ? ক'জন মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে নিজের পায়ে ? এই যে সব আত্মীয় বন্ধুকে ছেড়ে এসে নিজের শক্তি আর শিক্ষায় আপনি এত বড় কাজের ভার নিলেন এ কি কেবলমাত্র বিদ্রোহ ? এই যে পরের জন্ম বাঁচতে শেখা, এত বড় আদর্শ মেয়েদের সামনে তুলে ধরা এ কি সমাজপতির রক্তচক্ষুতে কেবলমাত্র স্বেচ্ছাচার ব'লে প্রমানিত হবে ?

মায়ালতা বললে, আপনি কবিতা লেখেন তাই আপনার কথার খানিকটা সত্য আর খানিকটা কল্পনা। আমার প্রকৃত চেহারাটা আপনার চোখে নেই, আমি যেমন হ'লে আপনার ভালে লাগে আমার সেই অবস্থাটা আপনি ভাবছেন। দেখুন অমরেশবাবু মেয়েদের বড় হবার চেয়ে চেষ্টা পুরুষের কাছে শেখা, এটা ভুলবেন না। আমার এই নতুন জীবনের পেছনে রয়েছে পুরুষের সাহায্য, তাদের উদারতা। পুরুষের মমতার আশ্রয়ে মেয়েরা বাঁচবে, এতে আমাদের লজ্জার কিছু নেই। আমরা বড় হ'তে চাইনে, সুখী হ'তে চাই। মানুষের সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াবার কথা পুরুষের, পুরুষের সেবা ক'রে তাকে মানুষ ক'রে তুল্‌ব এ কথা মেয়ের। যেখানেই এর বিকৃতি, সেখানে অস্বাভাবিক অবস্থা।

অমরেশ বল্‌লে, আপনি যে ভাবে জীবন আরম্ভ কর্‌লেন, এ কি তবে আপনার পছন্দ নয় ?

না। মায়ালতা বল্‌লে, এ কেবল নিজেকে খুঁজে বেড়ানো। অনেক কাজে লিপ্ত হয়েছি, কিন্তু মন-খুসী নয়। অর্থের প্রতি মেয়েমানুষের কিছু আসক্তি থাকতে পারে, কিন্তু উপার্জ্জন ক'রে ভরণপোষণ করা মেয়েদের দু' চোখের বিষ। এ তাদের অস্বাভাবিক আত্মদ্রোহিতা।

অমরেশ বল্‌লে, কিন্তু পুরুষেরা এই যে আপনাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে রেখেছে—ধরুন এই বাংলাদেশেই—

রাখেনি, এটা ভুল। চোখ চেয়ে দেখুন, বন্দী আমরা নয়, বন্দী তারা। আমরাই তাদের মাথা তুল্‌তে দিইনি, অশিক্ষা আর অস্বাস্থ্যের বোঝায় আমরাই তাদের নিয়ত অপমান ক'রে ডুবিয়ে রেখেছি দারিদ্র্যে। বেচারি বাংলাদেশের পুরুষ, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত মনুষ্যত্বের মহিমা থেকে তাদের বঞ্চিত ক'রে রাখাই আমাদের একমাত্র কাজ। অপমান আর দাসত্ব আর বন্ধ্যায় তাই ঘর ভ'রে গেল, আমরা দিলুম না তাদের মুক্তি!

তবে আপনাদের এই অধঃপতনের জন্য দায়ী কে?

দরজার পাশে ক্ষেমীর মাকে দেখে মায়ালতা উঠে দাঁড়াল। বল্‌লে, আমরাই, এ কথা ভুলবেন না। আমরা প্রাণহীন রক্ত মাংসের পিণ্ড, পথের বাধা। শৃঙ্খল আমাদের পায়ে নেই, আমরা নিজেরাই জানিনে চল্‌তে। আমি নিজে যে কাজ নিয়েছি, এ কাজ পুরুষের আমি জানি, তবু নির্ব্বিবাদে অপহরণ কর্‌ছি তাদের অন্ন। শিক্ষা-বিতরণের কাজ আমার নয়, পুরুষের। আমার স্থান সংসারে।

অমরেশ চমকে উঠে বল্‌লে, সংসারে? বল্‌ছেন কি?

ফিরে দাঁড়িয়ে মায়ালতা বল্‌লে, অত্যন্ত প্রাচীন মত কিন্তু অত্যন্ত আধুনিক, অমরেশবাবু। সংসারের ভালমন্দ, সুখ দুঃখ ছাড়া আর কিছু জান্‌তে আসা আমার পক্ষে অপমৃত্যু। নিজের অধিকারের বাইরে এসেছি, তাই চৌর্য্যবৃত্তি; পুরুষের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে চমক দিয়ে ভাগ্য ফেরাবার তাই এত হুড়োহুড়ি।

আপনি কি মেয়েদের স্বাতন্ত্র্য পছন্দ করেন না?

স্বাতন্ত্র্যটা-কোথায়? হাটের মাঝখানে? কত বড় বিপ্লব বাধ্‌ল ওদেশে বলুন ত এই স্বাতন্ত্র্যের জন্যে? ঘরের মধ্যে বাজার বস্‌ল, শ্রী গেল নষ্ট হয়ে। কেন গেল? পুরুষ পথে দাঁড়িয়েছিল বিরাট সভ্যতার তপস্যায়,

বিশ্বকর্ম্মার বরলাভ করলে, সুন্দর ক'রে সাজালে পৃথিবীকে, মেয়েরা অন্দর-মহল থেকে জুগিয়েছিল শক্তি, জাগিয়েছিল মানুষ্যত্বের গরিমা। কিন্তু চেয়ে দেখুন আজকের দিনে, সেই তপস্যার চারপাশে বাড়ল মেয়েমানুষের আনাগোনা; বললে, পুরুষের পাশে পাশে চলব। কিন্তু গায়ে পড়ার জাত, পাশে পাশে কি চলতে জানে? ফলে ভাঙল পুরুষের তপস্যা, দেহবাদের নীচের স্তরে পুরুষের হাত ধ'রে সে নামাল টেনে, হাটের কোলাহলের মাঝখানে চলল ভালবাসার ব্যবসা। সোনার সংসার আসক্তির আগুনে পুড়ে ছাই হোলো। অমরেশবাবু, এই কি আপনার নারীস্বাতন্ত্র্যের [illegible]া?
—মায়ালতা হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নীচে গাড়ী এসে দাঁড়াল, মোটরের হর্ণ বাজল। পরিচিত আওয়াজ, মায়ালতা একবার মাত্র জানলার দিকে তাকিয়ে আবার একখানা বইয়ের মধ্যে মনঃসংযোগ করলে। ভ্রূকুঞ্চনের একটা আভাস কপালে দেখা দিয়ে আবার মিলিয়ে গেল।

জুতোর শব্দটা সিঁড়ি দিয়ে উঠে সোজা তার ঘরের দিকে এলো, তারপরেই সুরেশবাবুর প্রবেশ। অভ্যর্থনার প্রয়োজন নেই, ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। রান্নাঘর থেকে শোবার ঘর—সর্ব্বত্র অবাধ গতি। স্কুল-কমিটীর সেক্রেটারী,—তাঁর শাসন ও নির্দ্দেশ সবাই মানে। মায়ালতা তাঁর নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

বাইরে মেঘ করেছে, বাতাস বন্ধ। চৌকির বিছানার একপাশে ব'সে তিনি রুমাল নেড়ে হাওয়া খাচ্ছিলেন, মায়ালতা উঠে এসে হাতপাখাটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিল। তারপর বললে, সরবৎ খাবেন?

সুরেশবাবু বললেন, এই অবেলায়? এ একেবারে নিতান্ত স্নেহহীন প্রস্তাব। খাবার কিছু রাখা হয় নি আমার জন্যে?

এক একজনের গলার আওয়াজ এমনিই, শোনামাত্র মন বিরূপ হয়ে ওঠে। মায়ালতা বললে, খাবার ত এসময়ে কিছু থাকে না, এখনো রান্না হয় নি।

রান্না হলেই বা আমার ডাক পড়ে কবে বলো! [illegible] বিধাতা যেন কোথায় আমাকে বঞ্চনা করেছেন। [illegible] সকলের ভাগ্যে ঘটে না।

মায়ালতা হেসে বল্লে, সোজা কথার মানুষ নন্ আপনি,—চা ক'রে দেবো, খাবেন?

কেবল চা, আর কিছু নেই?

আচ্ছা দেখি, দাঁড়ান্। ব'লে মায়ালতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মিনিট পনেরো পরে ফিরে এলো। হাতের থালায় কাটা আম আর সন্দেশ। মাটিতে নামিয়ে আসন পেতে দিল, তারপর জল আন্‌ল। সুরেশবাবু ততক্ষণ ব'সে য়্যাল্‌বামের পাতা ওল্‌টাচ্ছিলেন, এবার মুখ তুলে বল্‌লেন, এটা কি এখনো অমরেশ নিয়ে যায়নি? ছোক্‌রা বোধ হয় এই উপলক্ষ্য নিয়েই এখানে আসে, কেমন?

মায়ালতা বল্লে, তা ত জানিনে।

আমরা জান্‌তে পারি, আমরা চোখ বুজে থাকি নে।—ব'লে য়্যাল্‌বামটা বন্ধ ক'রে সুরেশবাবু সেটা পাশে সরিয়ে রাখলেন।

জলযোগে বসবার পর বোঝা গেল, আহারে রুচি তাঁর সামান্য, খাওয়াবার জন্য আকিঞ্চন এবং যত্নের দিকেই তাঁর আগ্রহটা ছিল বেশি—সামান্য ফল আর মিষ্টান্ন মুখে দিয়ে তিনি উঠে পড়লেন। রুমালে মুখ মুছে বল্‌লেন, ভালো কাজের দিকে অমরেশের মন নেই, বেকার বসে থাক্‌বে চুপচাপ। এই সব ছেলেরা সমাজের এক কড়া উপকারে আসে না। না জানে কাজ করতে, না জানে কোন প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুল্‌তে।

কণ্ঠ তাঁর যেমনি তিক্ত, তেমনি কর্কশ। মায়ালতা বল্লে, ছেলে-মানুষ, এখনো তেমন জ্ঞান হয় নি।

জ্ঞান হয়নি? ছেলেমানুষ? ওর আঁকা ছবি দেখেছ? ওর পদ্যের ভাষা দেখেছ? রবিঠাকুরকেও হার মানায়।

মায়ালতা চুপ ক'রে রইল। কিন্তু সুরেশবাবু থামলেন না। বললেন, মেয়েদের কাছে ব'সে আড্ডা দিতে অমরেশ ওস্তাদ! প্রশ্রয় পায় তাই এখানে আসে যখন তখন। ওর মনে থাকে না যে এটা মেয়ে-ইস্কুল। এই সব ছবির বই কি এখানে থাকা উচিত?

হেসে মায়ালতা বললে, ছবিতে কি দোষ হোলো?

ছবিতে যথেষ্ট দুর্নীতি, স্ত্রীলোকের নগ্ন চিত্র এঁকে রিরংসা জাগানো! একে তুমি ভালো বলো মায়ালতা,—আর্টের নামে প্রবৃত্তির স্বেচ্ছাচার!—বলতে বলতে পকেট থেকে তিনি কতকগুলি টাকা বা'র করে বিছানার উপর রাখলেন! টাকাটা মায়ালতার মাসিক প্রাপ্য!

মায়ালতা একটি কথাও বললে না, কিন্তু তার মুখে বিরক্তির রেখা দেখা গেল। এমন অপ্রিয় আলোচনা শোনার তার সময়ও নেই, দরকারও নেই। কিন্তু ফল ফলল অন্যরকম, সুরেশবাবু ধ'রে নিলেন এর মধ্যে আছে অন্য কথা। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সন্দেহ ও অবিশ্বাস তাঁর স্বভাবজ। নিজের দুর্ব্বল চেহারাটা তিনি জানেন; তাই যথাসম্ভব সেই দুর্ব্বলতাকে মধুর ক'রে তিনি বললেন, ও কি রোজ একবার ক'রে আসে?

ভদ্রকণ্ঠে মায়ালতা বললে, যদি আসেই ত ক্ষতি কি?

কথা শুনে সুরেশবাবু স্তম্ভিত হলেন। যথাসম্ভব আত্মসংযম ক'রে বললেন, ক্ষতি আছে বৈ কি, মনে রাখতে হবে ত যে এটা মেয়েদের—

সে দায়িত্বটা আমার, সুরেশবাবু।

সুরেশবাবুর গায়ে একটা জ্বালা ধ'রেছিল,—একা তোমার নয় মায়ালতা, দায়িত্ব আমারো কিছু আছে, আমি সেক্রেটারী।

মায়ালতা নত মস্তকে নীরবে রইল; কিন্তু একথা প্রকাশ করা গেল না, যিনি সেক্রেটারী তাঁর পক্ষেও কিছু সতর্ক থাকা দরকার! কিন্তু যেখানে অন্নের দাসত্ব, সেখানে অনেক সত্যই চাপতে হয়। এই ভদ্রলোকটির সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়ের স্মৃতিটা আজো মনে পড়ে, তা'তে কৌতুক ছিল, মাধুর্য্য ছিল। কিন্তু

দিনে দিনে এঁর হাস্য পরিহাস মিলিয়ে গেল, নিঃস্বার্থ চেহারাটা স্বার্থের কালিতে মলিন হোলো। সতর্ক ক'রে, আগলে রেখে তিনি যেন মায়ালতাকে বশীভূত রাখতে চান্। অর্থটা সুস্পষ্ট, মায়ালতা তাঁর সম্পত্তি। উপকার করেছেন অধীনতার শৃঙ্খলে বেঁধে রাখার জন্য। তাঁর শাসনকে স্বীকার ক'রে না নিলে আজকে আর উপায় নেই।

ক্ষেমীর মা দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। বললে, দিদিমণি, অমরেশবাবু ডাকছেন।

সুরেশবাবু সচকিত হয়ে মায়ালতার দিকে তাকালেন। বললেন, এমন সময় এলো যে? ওর কি আসার কথা ছিল?

মায়ালতা বললে, কই না। বোধ হয় হঠাৎ কোনো কাজ পড়েছে।

কাজ পড়লে আমারই কাছে ওর যাওয়া উচিত, এখানে আসে কেন? আচ্ছা ক্ষেমীর মা, তুমি ওকে বাইরে দাঁড়াতে বলো, আমি আসছি।—সুরেশবাবু দাসীকে নির্দ্দেশ দিলেন।

ক্ষেমীর মা চলে যাচ্ছিল, মায়ালতা দিল বাধা। বললে, আপনি আছেন, সুতরাং ওঁর আসায় আপত্তি নেই। ক্ষেমীর মা, তুমি ওঁকে এখানেই ডেকে দাও।

কণ্ঠের ভিতরে তার ইস্পাতের শাণিত কাঠিন্য ছিল, সুরেশবাবু নীরব হয়ে গেলেন। কিন্তু একেবারে নীরব হয়ে যাওয়া তাঁর প্রকৃতি নয়, বললেন, আমি যত দূরে যাবো, ওকেও কি তত দূরেই যেতে হ'বে, মায়ালতা?

ক্ষতি কি! ব'লে মায়ালতা দরজার পরদা তুলে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল।

এতটা কিন্তু ভাল নয়। ব'লে সুরেশবাবু যুদ্ধের জন্য সোজা হয়ে বসলেন।

মায়ালতা ভিতরে এলো। হেসে বললে, সুরেশবাবু, আমি চাকরী করতে এ বাড়ীতে ঢুকেছি, গৃহস্থালী করতে আসি নি। ঘরের বউ নয়, আমি মাষ্টারণী। এই যে অমরেশবাবু, আসুন—

অমরেশ ঘরে ঢুকতেই সুরেশবাবুর সঙ্গে মুখোমুখি। তিনি বললেন, কি হে বেড়াতে বেরিয়েছ নাকি?

অমরেশ সলজ্জ হেসে বললে, হ্যাঁ সুরেশদা, যাচ্ছিলুম এই রাস্তা দিয়ে—

এ রাস্তা দিয়ে তো অনেক সময়েই যাও। সকালের দিকে এসেছিলে নাকি এখানে ?

হ্যাঁ, এসেছিলুম।

বিকেলেও এলে, কেমন ? তা বেশ, উনি ধরো একলা থাকেন, তোমরা এলে তবু আলাপ আলোচনায় সময়টা কাটে।

মায়ালতা বললে, আপনার য়্যালবামটা খুঁটিয়ে দেখলুম। ছবি আমি বিশেষ বুঝিনে, তবু আপনার ছবিগুলো বেশ লাগল, অমরেশবাবু।

সুরেশবাবু বললেন, প্র্যাক্‌টিসটা রেখো, ভবিষ্যতে হাত তোমার বেশ পাকবে। ছবি দিয়ে তুমি ত কিছু রোজগার করতেও পারো হে, শুধু ব'সে না থেকে—

তাই করবো, ভাবছি।

তাই করো। শুধু ঘুরে বেড়ালে কিছু হয় না হে। মা বাপ চিরদিন থাকে না, নিজের পায়ে যদি এখন থেকেই না দাঁড়াও ··· ধরো এই যে গল্প-গুজবে সময়টা বাজে খরচ হয়, এ সময়ে তুমি কাজ করতে পারতে। আমি তোমার কল্যাণের জন্যই বলছি।

মায়ালতা হাসলে। হেসে বললে, আপনারও ত তাই সুরেশবাবু, যদি এতক্ষণ মক্কেলদের নথিপত্র ঘাঁটতেন, তা'হলে মামলা সাজাতে পারতেন ভালো।

সত্যি ত, নিশ্চয় পারতুম। কিন্তু নিজের কাজটাই ত বড় নয়, স্বার্থত্যাগ করতে হবে বৈ কি ! তোমার মাসিক টাকাটা দিতে এলুম—তা' ছাড়া আজ স্কুল-কমিটীর মিটিং হবে প্রেসিডেন্টের ওখানে।

কখন্ ?

এখনই, তোমারই জন্যে দেরী হচ্ছে, উঠলেই ত হয়। তোমাকে বোধ হয় কাপড় বদলাতে হবে। আচ্ছা, অমরেশ, বেশ, আবার দেখা হবে ··· ··· আমাদের আবার এক জায়গায় যেতে হবে কিনা, তুমি তা'হলে—

মায়ালতা য়্যালবামটা অমরেশের হাতে দিয়ে বললে, এটা নিয়ে যান্। সুরেশবাবু ত' বিশেষ সময় পান্ না, আপনার সুবিধে হলেই আসবেন কিন্তু। কই যে কবিতাটা আমার ওপর লিখেছেন, সেটা আনলেন না ত ?

সুরেশবাবু বললেন, কবিতা ? তোমার ওপর লিখেছে অমরেশ ? মানে ?

অমরেশ বললে, আমার সঙ্গেই আছে।

কই, বা'র করুন।—মায়ালতা হাত বাড়াল।

পকেট থেকে অমরেশ একখানা নীল কাগজ বার করলে; তাতে সোনালী কালিতে লেখা মায়ালতার প্রতি স্তুতি-বন্দনা। মায়ালতা বললে, রেখে দিলুম, রাতে শোবার সময়ে পড়ব। বাঃ কাগজের গন্ধটিও যে চমৎকার অমরেশবাবু।—এই ব'লে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো হেসে সুরেশবাবু বললেন, অমরেশ ?

অমরেশ তাঁর মুখের দিকে সলজ্জ হেসে তাকালো। তিনি বললেন, দেবীপূজা ভাল কিন্তু এটা কি ঠিক শোভন হোলো তোমার মনে হচ্ছে ?

অমরেশ চুপ ক'রে রইল। সুরেশবাবু বললেন, তোমাদের এই নির্ম্মল বন্ধুত্বটা বাইরের লোকে বুঝবে না, তারা কি বলবে জানো ? বলবে, এই স্কুলটায় একজন সুন্দরী শিক্ষয়িত্রী থাকেন, একজন বেকার যুবক আসে কবিতা লিখে নিয়ে, ছবির বই হাতে ক'রে—দুজনের মধ্যে খুব ভাব, শোবার ঘরে তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটায়, মাষ্টারণী থাকেন একলা।—আরো কি বলবে জানো ?

অমরেশ মুখ তুললে।

তারা আরো বলবে এতগুলো ছোট মেয়ের চরিত্র গঠন আর শিক্ষার ভার যাঁর ওপর সে আদর্শ নারীটি নিজের চরিত্র সম্বন্ধে ভ্রূক্ষেপ করেন না। তারা ভাববে, অবিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাটাই বুঝি আধুনিক শিক্ষা। এই সব ছবি আর ওই রকম কবিতা এঁর কাছে এনে দেওয়া কি ভালো ? তুমিই বলো ত, অমরেশ ? ধরো, আমি কার মুখে হাত চাপা দেবো !

অমরেশ বললে, অতটা আমি বুঝতে পারিনি সুরেশদা, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি তবে এখন উঠি।

তার পিঠে হতে চাপড়ে সুরেশবাবু বললেন, খুব যুক্তিসঙ্গত কথা নয় কি, তুমিই বলো না ভাই? এতে কার ক্ষতি হবে জানো? তোমার আমার নয়, ওঁরই। উনি অন্ন-সমস্যার জন্য পথে বেরিয়েছেন, সেই অন্ন যাবে মারা, পথের লোক অপমান ক'রে যাবে। আমাদের দেশে মেয়েদের দুরবস্থা কত, তা জানো ত

সত্যিই আমি অন্যায় করেছি। বলে অমরেশ উঠে বেরিয়ে চ'লে গেল। বিজয়-গর্ব্বে সুরেশবাবু হেসে চুপ করে রইলেন।

কিছুক্ষণ পরে মায়ালতা এসে বললে চলুন, আমার হয়েছে।

তার পরিচ্ছদে আড়ম্বর নেই, কিন্তু পরিচ্ছন্নতাটুকু দৃষ্টি এড়ায় না। সুরেশবাবু তার দিকে চাইলেন প্রশংসমান দৃষ্টিতে; হেসে বললেন বৃষ্টি এলো এদিকে তোমার প্রসাধনটা হয়ত ব্যর্থ যাবে।

প্রসাধন ত আমি করিনি।

করলে অন্যায় হতো না মানিয়ে যেতো। কিন্তু আমার নিজের কথা যদি জিজ্ঞাসা করো তা'হলে বলব এই আমার ভাল লাগে। কাপড়-চোপড় সহজ সরল হলেই লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে বেশী।

মায়ালতা বললে অমরেশ বাবু কি চ'লে গেলেন?

হ্যাঁ ছোকরাকে বুঝিয়ে দিলুম মিষ্টি কথায়। বললুম এসব ভালো না ভাই। আমাদের দেশে এক এক জাতের ছেলে আছে মায়া, মেয়েদের আঁচল ধরেই তারা জীবন কাটাতে ভালবাসে। মেয়েরা তাদের কৃপা করে কিন্তু সম্মান করে না—এ তারা বুঝতেই পারে না।

হ্যাঁ, বুঝতেই পারে না। ব'লে মায়ালতা হাসলে।

সুরেশবাবু একটু দ'মে গেলেন; সন্দিগ্ধ চক্ষে একবার তার দিকে তাকালেন কিন্তু কোনো মন্তব্য গায়ে মাখবার লোক তিনি নন্। কেবল এক সময়ে পা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চলো। বৃষ্টি এসে পড়ল দেখছি।

কমিটির মিটিং যখন শেষ হোলো রাত তখন সাড়ে আটটা বাজে। সবাই একে একে বিদায় নিলেন,—মায়ালতা এসে উঠল সুরেশবাবুর গাড়ীতে। সুরেশবাবু হেসে প্রস্তাব করলেন, মাঠের দিকে একটু ঘুরে গেলে দোষ কি? স্বাস্থ্যের পক্ষে—

মায়ালতা বললে একলা বেড়ানো কি ভাল হবে?

একলা? আমি ত' রয়েছি সঙ্গে।

আপনি রয়েছেন কিন্তু আমার সঙ্গে তো কেউ নেই। লোকের চক্ষে হয় ত' অশোভন হবে সুরেশবাবু।

সুরেশবাবু একটু আহত হয়ে বললেন লোকেরা মোটরের রাস্তায় ব'সে নেই, কেউ চেয়েও নেই। আচ্ছা তবে থাক্, চলো বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসি।

গাড়ী ছাড়ল। মায়ালতা বসে রইল এক পাশে। প্রয়োজন ছাড়া আর কিছু বলবার তার রুচিও নেই শক্তিও ছিল না। বিক্ষুব্ধ সুরেশবাবু নীরবে বসেছিলেন ওপাশে। এক সময়ে বললেন, তুমি বোধ হয় আমাকে বিশ্বাস করতে পার না মায়া। কেন বলো তো আমি কি করেছি?

কণ্ঠস্বরের মধ্যে কারুণ্য ছিল, প্রার্থনা ছিল। কবে আপনিটা তুমি হয়েছে, মায়ালতা হয়েছে মায়া—এ মায়ালতার বেশ মনে আছে। বয়সে অবশ্য বড় তবু অনুমতিটা নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সুরেশবাবুর সে ধৈর্য্য নেই। গায়ে-পড়া অন্তরঙ্গতায় তিনি সিদ্ধহস্ত।

মায়ালতা সহজে হেসে বললে, বিশ্বাস করলেই বা আপনার কি লাভ, না করলেই বা আপনার কি আসে যায়? তবে বিশ্বাস আপনাকে করি। আপনি শিক্ষিত ভদ্রলোক, অযাচিত উপকার করেছেন আমার, আমার সুখ দুঃখ হিতাহিতের প্রতি আপনার সহানুভূতি—আমি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ।

সুরেশবাবু বললেন, এসব আমি শোনবার জন্য ব্যগ্র নই মায়ালতা। একথা বলবার লোক আলাদা।

এ কথা আপনি শুনতে চান না?

না, একথা শোনবার জন্ম তোমার কিছু করি নি। উপকারের বদলে কৃতজ্ঞতা জানাবার মানুষ জগতে বহু আছে, তাদের কাছে যাব। আমি আশা করেছিলুম তুমি বলবে অন্য কথা, যা কেবল মাত্র তুমিই বলতে পার।—সুরেশ-বাবুর গলা কাঁপছিল, বলতে লাগলেন, আমার সমস্ত চেষ্টা আর পরিশ্রম দিয়ে তোমাকে বড় করে তুলতে চাই, সে কেবল আমার নিজের স্বার্থের জন্য।

গাড়ী চলছিল, মায়ালতা তাকালো তাঁর মুখের দিকে। সুরেশবাবু মুখ ফিরিয়ে নিলেন, মাথা হেঁট করলেন। মায়ালতা বললে, আপনার সকল কথার উত্তর দিতে পারিনে সুরেশবাবু, আমাকে ক্ষমা করবেন।

বেশ, একদিন উত্তর দেবে সেই অপেক্ষায় থাকব।

বাইরের দিকে একবার তাকিয়ে মায়ালতা বললে, গাড়ী কি বউবাজারের দিক দিয়ে যাবে ?

সুরেশবাবু সোজা হয়ে বসলেন ; গলা পরিষ্কার ক'রে বললেন, কেন দরকার আছে তোমার ? যেতে পারে বৈ কি।

হ্যাঁ, একটু দরকার আছে। ব'লে মায়ালতা তাঁকে একটা ঠিকানা ব'লে দিল। এমন একটি রাত্রে সময় নষ্ট করতে সুরেশবাবুর ইচ্ছা ছিল না, অনেক কথাই তাঁর বাকি রয়ে গেছে। কিন্তু বাধা দিতে সাহস তাঁর নেই, ক্ষতি হতে পারে। ড্রাইভারকে নির্দেশ দিয়েও তিনি একবার বললেন, আজকে না গেলেই চলে না ? কারো সঙ্গে দেখা করবে বুঝি ?

হ্যাঁ।

কে তিনি ?

পরিচিত লোক। আপনার কি খুব তাড়া আছে ? তা'হলে আমাকে ওখানে নামিয়ে দিয়ে যান্ দয়া ক'রে।

তাড়া কিছু মাত্র নেই, গাড়ীর মধ্যেই অপেক্ষা ক'রে থাকব, তুমি গিয়ে কাজ সেরে এসো। নামিয়ে দিয়ে গেলে ফিরে যেতে তোমার কষ্ট হবে, মায়ালতা।—সুরেশবাবু বললেন।

এত সৌজন্য যার, মন বিরূপ থাকে না তার উপর। নিজেকে মায়ালতা যেন অপরাধী মনে করলে, যেন সে নিয়ত এই লোকটির উপরে অবিচার ক'রে চলেছে। তার দয়া হোলো।

কিছুক্ষণ পরে বহুবাজারের একটা গলির ভিতরে এক জায়গায় গাড়ী এসে দাঁড়াল। বাড়ীর সুমুখের দিকটায় অন্ধকার, ভিতরে দূরে টিপটিপ ক'রে একটা আলো জ্বলছে। মায়ালতা সেদিকে তাকিয়ে গাড়ী থেকে নেমে বললে, হ্যাঁ, এই বাড়ী। আপনি তবে একটু অপেক্ষা করুন?

উত্তরের আগে সে ভিতরে গিয়ে ঢুকল। সুমুখে কল্‌তলা। জলকাদা চারিদিকে থই-থই করছে। পাশেই উপরে যাবার একটা সিঁড়ি। যেমন অপরিসর, তেমনি বায়ুলেশহীন। কেরোসিনের ডিবে জ্বলছে, কিন্তু তা'তে আলোর চেয়ে অন্ধকার বেশী। পাশ কাটিয়ে একটা ঘরের কাছে গিয়ে মৃদু হাতে কড়া নাড়ল। ঘরটা ভিতর থেকে বন্ধ!

দরজা খুলে গেল, সুরপতিই খুলেছিল দরজা। বিস্মিত হয়ে বললে, একি, এত রাতে? এই বৃষ্টি বাদল—

মায়ালতা ভিতরে ঢুকল, অভ্যর্থনার জন্য তার অপেক্ষা নেই। বললে, বৃষ্টি বাদল বলেই ত এলুম, মন খারাপ হয়েছিল মশাই।

একলা?

না, সঙ্গে মোটর আছে, মোটরের মালিক আছেন। হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলুম দু'জনে, পথে ভাবলুম পৈতেপোড়া বেহ্মচারিকে একবার দেখেই যাওয়া যাক্। এই যে, বই মুখে দিয়ে ব'সে থাকা হয়েছিল দেখছি, আহারাদির আয়োজন কই?

সুরপতি বললে, যাঁদের কাছে এখানে থাকি তাঁরা আজ গেছেন বিয়ের নেমন্তন্নে ··· আমারও আজ বিশেষ ক্ষিধে নেই।

এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে মায়ালতা বললে, মাগো, কী ময়লা বিছানা আপনার, ঘরের ছিরি ছাখো! কাপড় চোপড়গুলো ত ধোপার বাড়ী দিলেই হয়, কী নোংরা আপনি?

সুরপতি হাসল। বললে, এত আমার চোখে পড়ে না!

তা জানি, চোখে কিই বা পড়ে আপনার? ঘরে ত বৃষ্টির জল জ'মে রয়েছে দেখছি, বিছানার অবস্থা এই, রাত কাটাবেন কেমন ক'রে? বাড়ী ছেড়ে যাদের এই অবস্থা হয়, তাদের বাড়ী না ছাড়াই উচিত।

সুরপতি বললে, মেয়েমানুষ হ'লে সুবিধে হতো, মোটর পর্য্যন্ত চড়তে পেতুম!

ওরে বাপরে; মরতে মরতেও ছোবল মারা চাই। শুধু মেয়েমানুষ হলেই হয় না, বয়স হওয়া চাই অল্প, থাকা চাই রূপ। যাক্‌গে নোংরা কথা। বলি, আপনার কি কাণ্ড-কারখানা শুনি? সেদিন এক মিনিটের জন্যে রাস্তা থেকে কথা ক'য়ে এলেন তারপরেই নিরুদ্দেশ? আমার খবর না হয় নাই নিলেন, দয়ামায়া অপনার নেই জানি, কিন্তু নিজের খবরটা দিলে আমার ত দুশ্চিন্তা কমতো!

সুরপতি বললে, নানা কাজে ব্যস্ত থাকি···আর তা'ছাড়া আপনার একটা যা হোক সুবিধে ত হয়েই গেছে, সুরেশবাবু দেখা শোনা করেন—

এইটেই আপনার চোখে পড়ল। সুবিধে মানুষের যা হোক হয়েই যায়, ভগবানের রাজ্যে কেউ উপবাসী থাকে না। অন্নবস্ত্রের জোগাড় হয়েছে, আশ্রয় পেয়েছি, ঝি আছে, সুরেশবাবু আর অমরেশবাবুর অক্লান্ত তদারক, ইস্কুলে অখণ্ড প্রতিষ্ঠা, কথায় কথায় মোটর চড়া, যাচ্ছি মিটিংয়ে, আমার হুকুম তামিল করবার জন্যে লোকেরা শশব্যস্ত,—মেয়ের মধ্যে মেয়ে আমি, আমার আর ভাবনা কি।—ঝড়ের মতো মায়ালতা কথাগুলো বলে গেল।

সুরপতি বললে, তবে ত সুখেই আছেন!

সুখে আছি ব'লেই ত দেখতে এলুম আপনি কেমন আছেন! মন কেমন ক'রে উঠল, ভাবলুম আমার মতন সুখে পৃথিবীতে আর কেউ নেই।

হাসচেন, কেমন? হ্যাঁ, এটা আমার মনের বিলাস। এক একজন মানুষ এমন থাকে, নিজের সঙ্গে পরের তুলনা ক'রে বেড়ায়।

সুরপতি উঠে গিয়ে পিছন দিকের দরজাটা খুলে দিলে। দরজার সুমুখেই খানিকটা খোলা জায়গা। মায়ালতা উঠে গিয়ে সেখানে দাঁড়াল। দু'জনেই নীরব, এর পরে আর কোনো কথা নেই। কোনো কোনো অবস্থায় কথা না জোগালে অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে। সুরপতি আলোটা আর একটু উজ্জ্বল ক'রে দিয়ে বললে, আমিও মন্দ নেই।

মায়ালতা উত্তর দিলে না। বলতে ইচ্ছা হোলো, এর নাম মন্দ না থাকা? কিন্তু শুনবে যে, তার মুখে ক্লেশের চিহ্নও নেই। এই দুরবস্থা এবং দারিদ্র্য তাকে একটুও মলিন করে নি, নিরাশ করে নি। কোনো উদ্বেগ নেই, আপন ইচ্ছায় দুর্ভাগ্যকে বরণ করেছে, তার জন্য নেই অনুশোচনা; সেই দুর্ভাগ্যকে দুই হাতে ঠেলে যাওয়াটাই যেন এর তপস্যা। এখানে নিজের প্রতি কৃপা নেই, নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগ নেই। পুরুষের বড় হওয়ার চেষ্টার চেহারা বোধ হয় এই—এমনি বৈরাগ্য, এমনি কঠোর সংযম।

হঠাৎ মায়ালতা রুক্ষ কণ্ঠে বললে, এমন করে আপনি কতদিন থাকবেন?

সুরপতি বললে, থাকাই যাক্ না, কিছু কিছু কাজ নিয়ে ত আছি।

কাজ আপনার ছাই! বড়লোকের ছেলে ছিলেন, গরীবানা চালে থেকে সখ মেটাচ্ছেন। এ যেন আমেরিকার তরুণ সাহিত্যিকদের দারিদ্র্য-বিলাস! অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের জন্য তারা পথে গিয়ে ঘুমোয়, ভিক্ষে ক'রে খায়, জুয়া খেলে, নোংরা বস্তিতে গিয়ে আড্ডা জমায়, চুরি ক'রে জেলে যায়, হোটেলে গিয়ে বাসন ধোয়ার কাজ নেয়। কি জন্যে? না, ভালো গল্প আর ভালো কবিতা লিখতে হবে। দু' চোখের বিষ! মনের মধ্যে যাদের সৃষ্টি করার ঐশ্বর্য্য নেই, তারাই ছোটে পথে-বাটে। অভিজ্ঞতার ইতিহাস লিখতে ব'সে সংবাদের ফিরিস্তি আওড়ায়। ও-সব লোককে ভদ্রসমাজের ছাঁচে

উঠতে দিতে নেই। আপনি কি প্রৌঢ় বয়সে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক হবার চেষ্টা করছেন?

সুরপতি হেসে বললে, কই তেমন কল্পনা নেই ত?

তবে বাড়ী ফিরে যান্। আপনার পায়ে ধরি সুরপতিবাবু, আপনি আমাকে আর জ্বালাবেন না, বাড়ী যান্।

সুরপতি বিস্মিত হোলো তার কথায়। অত্যন্ত নিকটাত্মীয়ের মতো মায়ালতার কথার ভঙ্গী। অপ্রত্যাশিত শুধু নয়, অকল্পিত। মেয়েরা বোধ হয় এমন করেই কথা বলে। পুরুষকে প্রতিনিয়ত কাছে টেনে আনার চেষ্টাটাই যেন তাদের প্রকৃতি। বশীভূত করে মায়ামগ্ন মমতায়।

কল্‌তলার কাছে গলার আওয়াজ শোনা গেল। সুরপতি বললে, ঐ বোধ হয় সুরেশবাবু আপনাকে ডাকছেন, এবার আপনি যান্। রাত হ'ল, দশটা বেজে গেল।

মায়ালতা বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে আন্দাজে বললে—সুরেশবাবু নাকি?

ঈষৎ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সুরেশবাবু অন্ধকার থেকে বললেন, রাত অনেক হয়েছে, আর ত' অপেক্ষা করা চলে না।

আমার কিন্তু এখনো একটু দেরী হবে, সুরেশবাবু।

আরো দেরি?—ব'লে সুরেশবাবু এগিয়ে এলেন। এবং অনাহূত এসে ঘরের ভিতরে উঁকি মেরে বললেন, আরে, সুরপতি বাবুকে দেখছি যে! উনি থাকেন এখানে, কই একথা ত্ তখন বলো নি মায়ালতা?

মায়ালতা বললে, বলতে মনে ছিল না। ভুলেই গিয়েছিলুম যে আপনার সঙ্গে ওঁর পরিচয় আছে।

সুরেশবাবুর মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল। রাগে তাঁর মুখে আর কথা ফুট্‌ল না। সুরপতি এসে বললে, ভেতরে এসে বসুন সুরেশবাবু!

না ভাই, এত রাতে ব'সে আর গল্প চলবে না, আর একদিন আসব।—তারপর গলা নামিয়ে নিতান্ত অন্তরঙ্গতার ভঙ্গী ক'রে বললেন, তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে মায়া, এই দিকে এক বারটি আসবে ?

মায়ালতা তাঁর সঙ্গে এগিয়ে গেল। তিনি অন্ধকারে গলা নামিয়ে বললেন, এমন ঘরে বেশীক্ষণ থাকলে তোমার শরীর হয়ত খারাপ হবে, কাল থেকে আবার ইস্কুল! গাড়ী ছিল, সঙ্গে গেলেই ত হতো।

আমার এখনো কাজ শেষ হয়নি।

এখনো হয় নি ? তবে আর একটু কি দাঁড়াব ?

না। আপনি বরং চ'লে যান, সুরপতিবাবুই আমাকে পৌছে দেবেন।

তখন কিন্তু হেঁটে যেতে হবে।

মায়ালতা যথেষ্ট সংযত কণ্ঠে বললে, সারাদিন বসেই ছিলুম হেঁটে গেলে শরীর ভালই থাকবে।

অগত্যা সুরেশবাবুকে ফিরতে হোলো। তবু একবার ফিরে দাঁড়িয়ে শেষবার বললেন, এত রাতে কি সুরপতির ঘরে একলা ব'সে কথা বলা ভাল দেখাবে ?

না দেখালেও আমাকে থাকতে হবে। আচ্ছা, নমস্কার। বলে মায়ালতা নিজেই ফিরে এসে ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিলে। রাগে আর বিরক্তিতে তার চোখ দুটো জ্বালা করছিল।

দরজা বন্ধ করলেন কেন ?—সুরপতি বললে।

মৃদু-কঠিন কণ্ঠে মায়ালতা বললে, ওই লোকটার সন্দেহটাকে বাড়াবার জন্যে। বিরক্ত করেছে! প্রবৃত্তির তাড়নায় উনি পরোপকারী সেজে বেড়াচ্ছেন। সুরেশবাবুর একটা বিয়ে দিয়ে দিন্ ত আপনি, অনেক অসুখ সেরে যাবে।

ব্যাপার কি ?—সুরপতি হেসে বললে।

ব্যাপার গুরুতর। ছুটছেন পেছনে পেছনে, ভালবাসতে চান্! সেই যন্ত্রণায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হোলো।

সুরপতির জগৎটা আলাদা, তাকে আরো স্পষ্ট ক'রে না বোঝালে সে বুঝবে না। একদিন সে সুরেশবাবুকে নিয়ে মায়ালতার প্রতি বক্রোক্তি করেছিল, সেটা ব্যক্তিগত ঈর্ষা নয়—হরিহরদার সঙ্গে মায়ালতার এমনই গভীর সম্বন্ধ, যেখানে তৃতীয় ব্যক্তি সুরেশবাবুর প্রবেশটা নৈতিক চেতনায় বাধে। সে সতর্ক করেছিল, সন্দেহ করেনি। আজ সে-ভুল ভেঙেছে: হরিহরদা মায়ালতার জীবনে কোথাও নেই। নেই ব'লেই আজকে মায়ালতা ও সুরেশের বিরুদ্ধে তার নালিশ নেই। আপন রুচিতে মানুষ চল্‌বে, মনে সম্পূর্ণ স্বাধীন।

পিছন দিকের খোলা জায়গাটায় এসে দু'জনে দাঁড়াল। বৃষ্টির পরে এখন ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। আকাশে মেঘের আয়োজন প্রচুর, তবু কোথাও কোথাও দু' চারটে তারা জেগে রয়েছে।

বিদায় নেবার কোনোরূপ উদ্বেগ ও চাঞ্চল্য মায়ালতার চোখে মুখে নেই। সুরপতি তার দিকে একবার চেয়ে বললে, সুরেশবাবু আমার ওপর রাগ ক'রে গেলেন। কেমন?

মায়ালতা বললে, করুনগে, ওঁদের সবই আতিশয্য।

ওঁদের ওপর রাগ করা আপনার অন্যায়। যে-অবস্থায় আপনি ছিলেন দেখেছি, এখন কি তার থেকে ভাল নেই?

হ্যাঁ, অনেক ভাল। যা চেয়েছিলুম তা' পেয়েছি। এত সহজে এমন ভাগ্য ফিরবে, আশা করিনি। সন্দেহ নেই, এটা সুরেশবাবুর অনুগ্রহ।

তবে?

এখন দেখি শুধু অনুগ্রহ নয়, আরো কিছু। তাই নিজেকে সুখী বলতে বাধছে। মেয়েমানুষের পক্ষে এ যে কতখানি যন্ত্রণা, তা আপনাকে বোঝাতে পারব না। আমার রুচি আছে, ভাল লাগা মন্দ লাগা আছে। ভেবে পাই নে, এবার আমি কি করব।

অনেকক্ষণ সুরপতি নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। তার জীবনের সমস্যাটা

এর সঙ্গে মেলে না। সে নিজের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে কঠিন কল্পনা নিয়ে, সেখানে সে একা। আপন জীবনের দুঃখ এবং সুখকে অতিক্রম ক'রে সে বড় হবে, মানুষ হবে। নির্দ্দিষ্ট পথের সন্ধান তার নেই, অন্ধের মতো সে হাতড়ে চলেছে। একদিকে তার দারিদ্র্য, অন্যদিকে দুর্ভাগ্য। যে আত্মীয় পরিজনদের সে ত্যাগ করেছে, আজকে তারাও গেছে দূরে স'রে, তাদের খোঁজ খবর নেই।

মায়ালতা মুখ ফিরিয়ে বললে, চুপ করে আছেন যে?

সুরপতি বললে, আপনার কথাই ভাবছি।

আমার কথা? কি ভাগ্যি আমার! যে রকম বড় বড় কথা আপনি ভাবেন, আমার মতন সামান্য মানুষ কি আপনার মনে ঠাঁই পায়? কি ভাবছেন, শুনি?

বলবার আগেই আপনি এমন তিরস্কার করলেন যে, বলতে আর ভরসা হচ্ছে না।

তিরস্কার করব না কেন? সবাইকে ত্যাগ ক'রে যে নিজের পথের সন্ধানেই ব্যস্ত, আমরা তাকে বলি স্বার্থপর। অনেক সন্ন্যাসী ভগবানের বিভূতি লাভ করে এমন শুনতে পাই, সে সর্ব্বত্যাগীর সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কোনো আগ্রহ দেখা যায় না; কিন্তু ভালবাসি তাঁকে, যিনি লোক-সমাজের মধ্যে মানুষের কাজ ক'রে মানুষের দুঃখে সেবা ক'রে বড় হয়ে উঠেছেন। কি বলছেন, বলুন।

সুরপতি বললে, মনে হচ্ছে আপনি শেষ পর্য্যন্ত ওখানে টিঁকতে পারবেন না।

মায়ালতা বললে, কেন?

অসন্তোষ আপনার মনে। বারুদ জমেছে, একদিন আগুন লাগবে।

যদি টিঁকতে না পারি, তা'হলে আমার উপায়? আবার কোথায় যাবো?

সুরপতি বললে, আবার মনের মতন জায়গা খুঁজতে হবে।

মায়ালতা বললে, তা'হলে বলুন এমনি করেই বেড়াব? এর নামই

ত মরণ! যার স্থিতি নেই, যার আশা নেই। আপনি কি বলতে চান্, হাত পেতে বেড়াব দরজায় দরজায়? নিজের সম্ভ্রম কি বাঁচাতে পারব?

সে ভয় যদি থাকে, তবে বাড়ী ফিরে যান্। সুরপতি বললে।

ঢুকতে দেবে না তারা। পথ নষ্ট ক'রে দিয়েছেন আপনার আদর্শ গুরু হরিহরদাদা। দুর্নাম রটেছে, আশ্রয় মুছে গেছে।

কিন্তু হরিহরদা ত আপনাকে জোর ক'রে ধ'রে আনেন নি, আপনি এসেছেন নিজের ইচ্ছেয়, এসেছিলেন সুন্দর জীবনের পরিকল্পনা নিয়ে। অবশ্য হরিহরদার সাময়িক প্রভাব ছিল আপনার ওপর। আপনার সে পরিকল্পনা ভাঙল কেন?

ভাঙেনি, কিন্তু ম্লান হয়েছে। স্বীকার করলে আপনি হাসবেন।—মায়ালতা বললে, আপনি ভাববেন, মেয়েরা বুঝি এমনিই দুর্ব্বল আর সঙ্কীর্ণ মন। কিন্তু তবু বলব। আমি এখন দেখছি, স্বাধীন জীবিকা অর্জ্জন ক'রে ঐশ্বর্য্যশালী হওয়াটাই আমার একমাত্র কাম্য ছিল না। আরো যে কিছু চাইবার আছে, এই কথাটা আমাকে অস্থির ক'রে তুলেছে।—ব'লে সে মাথা হেঁট করলে।

নিশ্বাস ফেলে সুরপতি বললে, একবার চলুন, আপনাকে এগিয়ে দিইগে।

কই, কিছুই ত বললেন না?

বলতে কীই বা পারি? আসুন।—ব'লে সুরপতি ঘরের ভিতরে এলো।

দরজা বন্ধ ক'রে দু'জনে পথে এসে নামল। রাত অনেক হয়েছে, লোক-সমাগম কমে গেছে। বড় রাস্তা ধ'রে দু'জনে চলতে লাগল। কারো মুখে কথা নেই।

পথের দুধারে দোকান-পাট অনেক বন্ধ হয়ে গেছে। যেগুলি খোলা আছে, তারাও বন্ধ করবার উপক্রম করছিল। একটা দোকানের কাছে এসে দাঁড়িয়ে মায়ালতা বললে, আমি কিছু খাবার কিনব।

আপনারো কি রান্নাবান্না হয়নি?

হেসে মায়ালতা বললে, না।

এক ঠোঙা খাবার কিনে আঁচলের মধ্যে নিয়ে সে আবার সুরপতির পাশে পাশে চলতে লাগল। এখান থেকে তাদের স্কুল বেশী দূর নয়।

আপনি কি তবে এই ভাবেই থাকবেন?—মায়ালতা এক সময়ে বললে, আপনি কি করতে চান্ এ কথা আমার জানা দরকার।

সুরপতি তার দিকে তাকাল। মায়ালতা পুনরায় বললে, শরীর ক্ষয় ক'রে দিন-মজুরী করাটা আদর্শ জীবন নয়। কুলীরা যা' করে আমরাও তাই করতে পারি, এ কথায় অহঙ্কার থাকতে পারে, কিন্তু আদর্শ নেই। আমরা আরও বেশী কিছু পারি, এই ধারণাই থাকা উচিত।

সুরপতি বললে, আমার কথা আলাদা। এই জীবনকে বদলে দেব, এই কথাই ভাবছি। আদর্শ জীবনের কথা কে বল্ছে? আমি চাইছি এগিয়ে যেতে নতুন জীবনে। আমি চাইছি এটাকে বদ্লাতে, এর ছাঁচ উল্টে দিতে। অন্ধ হ'য়ে হাতড়াচ্ছি পথ পাব ব'লে—সেই পথ, যেখানে রয়েছে অসীম প্রাণময়তা; যে-জীবনে প্রাচুর্য্য আছে, স্বাস্থ্য আছে, শ্রী আছে! আদর্শ জীবন মানে নৈতিক জীবন নয়, আধ্যাত্মিক বুলি আওড়াবার পেশা নয়, সন্ন্যাসীর দল গ'ড়ে নির্বীর্য্য হবার প্রচেষ্টা নয়—আমি সেই অভিনব জীবনে উত্তীর্ণ হয়ে যেতে চাই, যেখানে পাব ভোগপ্রিয় বলবান্ বৈরাগীর দল, যেখানে শক্তি আর প্রতিভা সহজ সুন্দর রূপ পায়! থাক্ সে কথা। আসুন, তাড়াতাড়ি যাই।

মায়ালতার মুখে উত্তর নেই। তবু কিয়ৎক্ষণ পরে সে বললে, আমি কি করব?

সে জানেন আপনি। মেয়েদের আমি বুঝি নে।

বাকি পথ নীরবে শেষ হয়ে গেল। স্কুল-বাড়ীর দরজার কাছে কেউ নেই, উপরে শোবার ঘরে কেবল একটা আলো জ্বলছিল। দরজার উপরে উঠে মায়ালতা কড়া নাড়ল। ক্ষেমীর মা ভিতর থেকে গলার সাড়া দিয়ে বললে, যাই গো।

মায়ালতা বললে, দাঁড়ান্। এই ব'লে গলায় আঁচল দিয়ে হেঁট হয়ে অন্ধকারে সুরপতির পায়ের ধূলো তুলে নিলে।

এ কি করছেন ?

আমি আর আপনাকে গাল্ দেবো না। এই নিন্, এই আপনার দক্ষিণা।

সুরপতি ইতস্ততঃ করতেই খাবারের ঠোঙাটা জোর ক'রে মায়ালতা তার হাতে গুঁজে দিয়ে বললে, আপত্তি শুন্‌ব না, আপনার জন্যেই কিনে এনেছি। মাথার দিব্যি রইল, খাবেন কিন্তু, লক্ষ্মীটি। যান্ চ'লে, ক্ষেমীর মা যেন দেখতে না পায়।

সুরপতি নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে ধীরে ধীরে চল্‌তে লাগল।

চার

ক্ষেমীর মা ঘরে ঢুকে বললে, দিদিমণি, বড়বাবু এসেছেন।

মায়ালতা বললে, বড়বাবু কে?

অবাক কল্লে! আমাদের সুরেশবাবু গো—

দাসীর মুখের বক্রভঙ্গীটা মায়ালতার ভালো লাগল না, রুচিকে আঘাত করল। ক্ষেমীর মা'র কণ্ঠস্বরের ভিতরে কোথায় যেন একটা সুদূর প্রত্যাশা লুকিয়ে রয়েছে, সেটা ভাবতে গেলে খোঁচা দেয়, উৎপীড়ন করে। চোখ দুটো তার জ্বালা ক'রে উঠল। বললে, ক্ষেমীর মা, আমার কাছে সুরেশবাবুকে বড়বাবু ব'লে সম্মান দেখাবার কারণ? বড়বাবু তিনি কবে হলেন? এর মানে আমাকে বুঝিয়ে দাও।

অপ্রতিভ হয়ে ক্ষেমীর মা ক্ষমাপ্রার্থনাসূচক কণ্ঠে বললে, এমনিই বলছিলুম দিদিমণি।

না, এমনিও তুমি কোনোদিন ব'লো না। এ ভাবে আমাকে খুসি করা কঠিন ক্ষেমীর মা।

কিয়ৎক্ষণ ক্ষেমীর মা দাঁড়িয়ে রইল নির্বোধের মতো। তারপর বললে, ওঁকে কি এখানেই ডাকব?

মায়ালতা বললে, না, এটা অন্দরমহল। এক আধদিন বিশেষ দরকারে ভেতরে আসা চলে, সব সময় আসাটা আমার পছন্দ নয়। বলতে বলতেই মুখ ফিরিয়ে দেখা গেল সুরেশবাবু নিতান্ত অন্তরঙ্গের মতো শয়নকক্ষে প্রবেশ করছেন। ক্ষেমীর মা দুজনের দিকে একবার তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে পাশ কাটিয়ে চ'লে গেল।

মুহূর্ত্তের জন্ম মায়ালতা একবার দাঁড়াল। হৃদয়বৃত্তির সংস্পর্শ বিন্দুমাত্রও যেখানে নেই, মেয়েদের পক্ষে সেখানে দ্রুত বিচার করতে বাধে না।

সেখানে বিলম্বটা দুর্নীতি, বিবেচনাটা দুর্ব্বলতা। দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে সে বললে, আপনি নীচে আপিস ঘরে আসুন সুরেশবাবু, সেখানেই কথা বল্‌ব।

চৌকির বিছানায় হেলান দিয়ে সুরেশবাবু ব'সে পড়েছিলেন। আদালতের ফেরৎ তিনি এখনো বাড়ী ফেরেন নি। পরণে কালো গাউন্‌, পায়ে মোজা জুতো। চেহারায় সারাদিনের ক্লান্তির চিহ্ন কিছু ছিল। বললেন, এখানে বলতেই বা ক্ষতি কি?

ক্ষতি নয়, অসুবিধা। আসুন, নীচে যাই।—ব'লে মায়ালতা নিজেই অগ্রসর হোলো। অর্থাৎ, বিবেচনা করবার সময় আজকে আর সে দেবে না।

কিন্তু সুরেশবাবুর মন আজ ভালো ছিল না। বড় একটা মামলায় পরাজয় ঘটেছে, তার জ্বালাটা এখনো রি রি করছে। তবু তাঁকে উঠতেই হোলো,—মায়ালতার মেজাজ তিনি জানেন। দিন আষ্টেক আগেও এই সেদিন এই সম্পর্কে একটা তীব্র বাদানুবাদ হয়ে গেছে। তথাপি সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মনের জ্বালাটা তাঁর বেরিয়েই পড়্‌ল। বললেন, ওপরের ঘরে কথাটা বললে মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যেতো না।

হ'তো কিনা এ নিয়ে কথা কাটাকাটি নিষ্ফল, অরুচিকর। ঘরে ঢুকে বসবার আগেই মায়ালতা বললে, আপনি জানেন, কেন আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলুম?

ডেকে পাঠাতে হবে কেন, আমি ত প্রায় রোজই আসি। কথাটা কি, শুনি?

আপনি কি শোনেন নি

কই, না?

মায়ালতার বাঁ হাতে একখানা চিঠি ছিল, সেখানা সে দ্রুত সুরেশের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, পড়ুন এখানা, প্রেসিডেণ্ট্‌ আমাকে লিখেছেন।

সুরেশবাবু চিঠিখানা মনোযোগ দিয়ে পড়লেন। পড়া শেষ হ'লে মায়ালতা বললে, এবারের পরীক্ষায় রেজাল্ট্‌ ভালো হয়নি, সে দোষ

আমার নয়, মেয়েদের। আমার কর্ত্তব্যের সীমা আমি জানি, আমাকে অবহিত হতে অনুরোধ করা অনধিকার। হঠাৎ প্রেসিডেণ্টের পক্ষে এচিঠি লেখা একটু অস্বাভাবিক ঠেকছে। তিনি থাকেন দূরে, আপনি এখানে আসেন নিয়মিত, খোঁজ খবর আপনিই রাখেন। কর্ত্তব্যে আমি অবহেলা করি কিনা সেটা তাঁর চেয়ে আপনিই ভালো জানেন। এখন বলুন, এ চিঠির রহস্য।

সুরেশবাবু বললেন, রহস্য ? কই, আমি ত এর কিছু জানিনে।

মায়ালতা বললে, আমার গতিবিধি এবং ভিজিটারদের সম্বন্ধে আমাকে পরোক্ষভাবে এ চিঠিতে সতর্ক করা হয়েছে।

ওঃ, এইটেই আসল কথা ! সেটা কি তাঁর করবার অধিকার নেই মায়ালতা ?

মায়ালতা তাকালো তাঁর মুখের দিকে। সুরেশবাবু পুনরায় বললেন, ধরো, এই স্কুলের শিক্ষয়িত্রীদের জীবনে যদি নীতি আর শৃঙ্খলার অভাব ঘটে—

তার মানে ভেঙে বলুন। আপনার গলার আওয়াজ শুনলে মনে হয় আপনি এ চিঠির ইতিহাসটা জানেন।—হঠাৎ মায়ালতা হেসে আবার চুপ ক'রে গেল।

সুরেশবাবু অপ্রতিভ হয়ে বললেন, ভেঙে বলবার আমার কিছু নেই, বলতে পারেন প্রেসিডেণ্ট্। তিনি হয় ত খোঁজ খবর রাখেন, তাই লিখেছেন।

আপনি ত সেক্রেটারী, আপনি রাখেন না খোঁজ-খবর ?

আমার অফিস-সংক্রান্ত কাজ নিয়ে থাকার কথা।

মায়ালতা কিয়ৎক্ষণ নীরবে রইলো। তার পর বললে, দেখুন, ভয় আমি করিনে। অনেক বিপদ আর দুর্ভাগ্যের ভেতর দিয়ে একা মেয়েমানুষ এসেছি, ভয় আমি করিনে কিছুকেই। যেটুকু লেখাপড়া আর কাজকর্ম্ম জানি, সেটুকু ভাঙিয়ে পেটের অন্ন আমার জুটেই যাবে। আপনাদের এই স্কুলে ভালোই ছিলুম সন্দেহ নেই, কিন্তু ছাড়তে গেলেও দুঃখ আমার হবে না।

সুরেশবাবু কিছুক্ষণ নীরবে রইলেন। তারপর বললেন, তোমাকে জবাব

দেবার ইঙ্গিত এ-চিঠিতে নেই, তিনি একটু সতর্ক ক'রে দিয়েছেন মাত্র। ভদ্রভাষায় এটুকু লেখা কি নিতান্তই অসঙ্গত, মায়ালতা ?

মায়ালতা বললে, ভদ্রভাষায়, কিন্তু ভাষাটা দুরন্ত নয়। এর মধ্যে আদেশ আছে, অনুরোধ নেই। আমি এখানে মাষ্টারী করতে এসেছি; কিন্তু আমার ওপর মাষ্টারী আমি সইব না, সুরেশবাবু। আমার গণ্ডীর মধ্যে আপনাদের প্রবেশ নিষেধ।

আমারো ?—সুরেশবাবু কাষ্ঠহাসি হাসলেন।

প্রয়োজন হ'লে আপনারো বৈ কি।

চিঠিখানা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে সুরেশবাবু বললেন, এ মন্দ নয়। নিরপরাধ আমি বেচারা ধমক খেলাম। এর নাম ভাগ্যের বিদ্রূপ! সেক্রেটারির কাজ আর করা পোষালো না দেখছি, এবার আমি এ-স্কুলের কেরাণীগিরি করব; আমাকে মানাবেও ভালো—এই ব'লে তিনি মুখ তুলে তাকালেন। দেখা গেল মায়ালতার মুখের চেহারা কিছু নরম হয়ে এসেছে।

মায়ালতা বললে, এ কাজ ছেড়ে দেওয়াই বোধ হয় আমার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত, সুরেশবাবু।

তাই বটে। পাঁচজনে এমন উত্যক্ত করলে মানুষ টেঁকে কি ক'রে? বলব গিয়ে আমি প্রেসিডেন্টকে ; ভয় কি, আমি এর বিহিত ক'রে দেবো, মায়া!

মায়ালতা হেসে বললে, আপনি চুপ ক'রে থাকলেই আমার উপকার হবে, কিন্তু বিহিত করতে গেলেই ব্যাপারটা হয়ে উঠবে আরও জটিল।

সুরেশবাবু বললেন, তার অর্থ? আমার ওপর তুমি নির্ভর করতে পারো না ?

কেমন ক'রে পারব বলুন। আপনি এখানকার সেক্রেটারী, আপনাকে ডিঙিয়ে যদি প্রেসিডেন্ট মশাই ঘাস খেতে আসেন, তবে বুঝতে হবে, আপনার পদ-মর্য্যাদা তিনি রাখেন না। আপনার মান রইলো কোথায় ?— ব'লে মায়ালতা একচোট আবার হেসে নিলে।

সুরেশবাবু যেন হঠাৎ অত্যন্ত খাটো হ'য়ে গেলেন। সম্ভ্রম বাঁচাবার জন্য নিজের মুখের চেহারা আর দেখানো গেল না।

মায়ালতা বললে, আগামী মাস থেকে আপনারা অন্য লোকের জন্য চেষ্টা করবেন। কল্‌কাতায় এমন অনেক অনাথা মেয়ে পাওয়া যায়, যারা পেটের দায়ে আপনাদের নির্দ্দেশকে হাকিমের কড়া হুকুম ব'লে মান্‌বে, আমার চেয়েও যারা চরিত্রবতী, আপনাদের মন রাখার জন্য যারা অনেক দূরে পর্য্যন্ত এগিয়ে যেতে পারবে।

এ সব কী কথা, মায়া?

এই কথাই বল্‌ব, আপনাদের আসল চেহারাটা আমি জান্‌তে পেরেছি! —মায়ালতার কণ্ঠে দম্ভও যেমন, ব্যক্তিত্বও ততখানি।

সুরেশবাবু বললেন, মেয়েরা কিন্তু এমন ক'রে কথা বলে না, স্পষ্ট হ'তে তারা বাধা পায়। তুমি দেখছি মেয়ের মধ্যে মেয়ে। যাক্ সে কথা। আপাতত এই সিদ্ধান্তটা তুমি কি বদ্‌লাতে পারো না? ধরো যদি প্রেসিডেণ্টের ভুল একটা হয়েই থাকে।

ভুলটা মারাত্মক, আমার ব্যক্তিগত জীবনের ওপর হস্তক্ষেপ করা। এর পর থাকতে ভালো লাগবে কেন? আপনারা নিজেদের সম্মান খোয়ালেন আমার কাছে।

অন্যায় করেছেন তিনি। সত্যিই ত, এ সব ভারী অন্যায়। আমি তাঁকে দিয়ে উইথ্‌ড্র করাবো। এমন অবস্থায় আমিও কাজ ছাড়তুম।—সুরেশবাবু কথাবার্ত্তায় আপোষ-নিষ্পত্তিটাই প্রধান ছিল।

মায়ালতা উঠে দাঁড়ালো। বললে, ধমকে আমার চরিত্রকে বদলানো যাবে না, এই কথাটা বলতে আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলুম—

সুরেশবাবুও উঠছিলেন, কিন্তু তখনই এক ডাকপিয়ন উঠে এলো দরজায়, অপরাহ্ণের ডাক এসেছে। মায়ালতা এগিয়ে এসে তার নিজের নামে চিঠি হাত পেতে নিলে। ডাকপিয়ন নিয়মিত বক্‌শিস পায়, সুতরাং নমস্কার জানিয়ে চ'লে গেল।

চিঠি খুলে মায়ালতা পড়া আরম্ভ করলে, এমন সময় ক্ষেমীর মা আন্‌লে এক বাটি চা। সুরেশবাবু তাকে অভ্যর্থনা ক'রে বললেন, আঃ বাঁচালে ক্ষেমীর মা, পূর্ব্বজন্মে হয়ত তুমি আমার মা ছিলে। তোমার কর্ত্রীর তিরস্কারের চোটে গলার মধ্যে আমার চাতক পাখী ডাকছিল। পরের কাজে অনেক বিড়ম্বনা, অনেক লাঞ্ছনা—এর চেয়ে অখ্যাত অজ্ঞাত ঘরের কোণে স্ত্রীপুত্র-সহযোগে মৃত্যু-সাধনা করাই ছিল বাঞ্ছনীয়।—এই ব'লে তিনি চায়ের বাটিতে চুমুক দিলেন।

চিঠিখানা পড়া শেষ ক'রে মায়ালতা সেইখানেই নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সুরেশবাবু তার ভাবগতিক দেখে বললেন, কোনো দুঃসংবাদ নয় ত ?

হ্যাঁ, দুঃসংবাদ। আপনি শুন্‌তে চান্ ?

সুরেশবাবু থতিয়ে গেলেন। বললেন, তোমার দুঃসংবাদটা আমার পক্ষে সুখকর নয়, মায়া। বলতে যদি না চাও, পীড়ন করব না। কিন্তু খামখানার চেহারাটা সৌখীন, অমন খামের মধ্যে দুঃসংবাদ আসবে, ভাবতে পারিনে।

চিঠিখানা অমরেশের। মায়ালতা বললে।

ভালো আছে ত সে ?

ভালো থাকবে না কেন ? অমন সুস্থ বলিষ্ঠ ছেলে !

আর কিছু জিজ্ঞাসা করার সাহস সুরেশবাবু ছিল না, কিন্তু কৌতুহল ছিল। কেবল বললেন, এখান থেকে এইটুকু, চিঠির বদলে সে ত' এলেই পারত ?

মায়ালতা বললে, আসতে নিষেধ করেছি।

সুরেশবাবুর মুখখানা মুহূর্ত্তে দীপ্ত হয়ে উঠ্‌ল। বললেন, বারণ করেছ আসতে, অথচ সে-অপমান গায়ে না মেখে আবার চিঠি চালাচালি করতে গেল ? এদের নামই তরুণ, দৈন্যই এদের আসল চেহারা, কাঙালপনাই এদের পেশা। কি লিখেছে, শুনি ?

শুন্‌তে ভালো লাগবে' ?

ভালো লাগবে ! বলো কি মায়া ? আমি কেবল জান্‌তে চাই এদের

চরিত্রকে নিখুঁৎ ক'রে। এরা মেয়েলীভাবাপন্ন শ্রেণীর লোক। মেয়েদের কাছে এদের পরিচয় চাপা থাকে না। স্ত্রীলোকের হৃদয় জয় করতে গেলে বীর্য্যবান্ হওয়া চাই; ত্যাগ, সংযম, উদারতা, শুচিতাবোধ—এ-সবের নিতান্ত দরকার। এরা কি জানো? এরা আসে নোংরা গলির পথ ধ'রে ছিঁচ্‌কে চুরি করতে। বলবানের সম্ভোগ নয়, দুর্ব্বল কাপুরুষের দেহ-লালসা। দস্যুতা এরা জানে না, জানে অতর্কিতে হাতসাফাই করতে। এদের হৃদয় কোনোদিন বড় প্রেমের আধার নয়, এদের মনে শাড়ীর আঁচলের হাওয়া লেগে কেবল তাড়ির রসের বুড়বুড়ি কাটে। কই, পড়ো শুনি।—আপন বক্তৃতার পরিশ্রমে সুরেশ বাবু হাঁপাচ্ছিলেন।

মুখ টিপে হেসে মায়ালতা বললে, এ চিঠিতে যদি এমন কিছু কথা থাকে যা আপনার ভালো লাগবে না, তবে?

তা'হলেই কি দুঃখিত হবো? মোটে না। হাসবো শুধু। শোনাবার মতো কথা কি এরা বলে? মনের দারিদ্র্য এরা চাপা দেয় সস্তা ভাবালুতায়।

মায়ালতা বললে, আপনি নিশ্চয় এদের দলে নয়, সুরেশবাবু?

সুরেশবাবু হঠাৎ সজাগ হয়ে গেলেন। বললেন, কি মনে হয়?

মনের কথা বলতে নেই—ব'লে মায়ালতা হাসতে লাগল।

একটা বিশ্রী অস্বস্তিতে সুরেশবাবু চঞ্চল হয়ে উঠলেন। চায়ের পেয়ালা কোনোরকমে শেষ ক'রে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, চিঠিখানা তুমি পড়তে চাওনা বোঝা গেল, আমাকে আগে বললেই পারতে। অনেকগুলো কথা ব'লে ফেললুম, কাজের ক্ষতি হোলো ব'সে ব'সে। যাই হোক—ব'লে তিনি দু' পা অগ্রসর হলেন। হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে পুনরায় বললেন, আমাকে কি তুমি অমরেশের স্তরে ফেল্‌তে চাও, মায়া?

মায়ালতা বললে, রাগ করছেন কেন? এ চিঠি শুনে আপনার কিছু লাভ নেই, তাই পড়লুম না। আপনি কোন্ স্তরের মানুষ সে আপনার বিধাতা জানেন, তাই ব'লে অমরেশের স্তরে আপনাকে ফেল্‌ব না। যাক্,

অনেক বাজে কথা ফেনিয়ে ফেনিয়ে বলা গেল। আচ্ছা, নমস্কার। ব'লে মায়ালতা পিছন ফিরে সোজা ভিতরে চ'লে গেল। মুখের হাসি তার তখনো থামেনি। ওদিকে ক্ষেমীর মা রান্নার আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত ছিল, একবার মুখ তুলে' তাকালো। হাসি দেখে ভাবলে, দিদিমণির মতো খামখেয়ালী সংসারে আর দু'টি নেই।

এলোচুল ফিরিয়ে বাঁধলো মায়ালতা। আয়নায় মুখ দেখার অভ্যাস তার নেই। কপালের টুক্‌রো চুলগুলি মাথায় উপর দিকে সরিয়ে দিলে। জামাটা আগেই গায়ে দিয়েছিল, এবার তার বোতামগুলি একটি একটি ক'রে বেঁধে নিলে। এই তার সজ্জা; যত্ন আছে, বিলাস নেই। ছুটির দিনে দুপুরবেলা একটু আগে সে ঘুমিয়ে উঠেছে, দিবানিদ্রার অনিয়মে চোখ দুটো টস্ টস্ করছে।

তার মা আছেন। আছেন অন্যান্য আত্মীয়পরিজন। প্রিয় ছিল সে সকলের, আজকে চাকাটা গেছে ঘুরে। গৃহত্যাগিনীর পদবীটা তার আঁচলের সঙ্গে বাঁধা। দেশে আর তার যাবার উপায় নেই। মায়ের কাছে প্রায়ই সে কুশল-সংবাদ পাঠায়, কিন্তু ঠিকানা দেয় না, এবং বর্ত্তমান জীবনযাত্রার সম্বন্ধে নীরব থাকে। পিত্রালয়ের পথ তার বন্ধ। আজ কাঁচা ঘুম থেকে উঠে মায়ের কথা মনে প'ড়ে তার ভিতরের গোপন শিশুমন কেঁদে উঠ্‌ল। গভীর নিশ্বাস পড়ল।

ডাক্‌ল, ক্ষেমীর মা?

ক্ষেমীর মা সাড়া দিয়ে এসে দাঁড়াল। মায়ালতা বললে, আমার যে কাপড় নেই, একথা আগে বলোনি কেন?

ক্ষেমীর মা বললে, একটি একটি ক'রে তুমি সব কাপড় খরচ ক'রে

ফেলেছ, একথা আমিও জানিনি। ধোবার বাড়ীতে আর ত কাপড় তোমার নেই, দিদিমণি?

এখন উপায় কি বলো? সেমিজ প'রে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। আমাকে যে এখনি বেরুতে হবে।

ছুটির দিন অপরাহ্নে সাধারণত দিদিমণি ঘরেই থাকে, সুরেশবাবু আসেন। ক্ষেমীর মা হকচকিয়ে গিয়ে এদিক্ ওদিক্ তাকাতে লাগল। একটি বেলা এঘরের পরিচর্য্যা না করলে চারিদিক ওলট পালট হয়ে থাকে। সমস্ত ঘরটায় সকাল থেকে যেন ঝড় বয়ে গেছে। এ-ঘরের পরিচ্ছন্নতার প্রশংসা সুরেশবাবু প্রায়ই ক'রে যান্, কিন্তু সে প্রশংসা প্রাপ্য ক্ষেমীর মা'র।

ঘরের ভিতরে ঢুকে ক্ষেমীর মা এদিক্-ওদিক্ খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। শেষকালে কতকগুলি খবরের কাগজ চাপা খানদুই ধোবদস্ত শাড়ী বেরিয়ে পড়ল। নিজের জিনিষপত্র সম্বন্ধে তার হুঁস থাকে না। ক্ষেমীর মা রাগ ক'রে বললে, ধন্যি মেয়ে তুমি দিদিমণি, পেছনে একজন লোক না থাকলে দেখছি তোমার দিন চলা ভার। কিছুতে যদি তোমার খেয়াল থাকে। বক্‌শিস দিয়ো আমাকে।

মায়ালতা হেসে বললে, একখানা শাড়ী তুমি নিয়ো।

সে ত তুমি দেবেই। কিন্তু ব'লে রাখছি, এবার পূজোর সময় আমার ক্ষেমীর কানে ঝুমকো দিয়ো। না নিয়ে ছাড়ব না।—এই ব'লে ক্ষেমীর মা বেরিয়ে গেল।

কাপড় প'রে মায়ালতা প্রস্তুত হোলো। ছাতাটা সঙ্গে নেওয়াই ভালো, বৃষ্টি আসতে পারে। হাল-আমলের বর্ম্মী চটিজোড়া দিলে পায়ে; বেগুনি মখমলের ফিতেটা পায়ের রংয়ের সঙ্গে বেশ মানায় ক্ষেমীর মা বলে। রূপ তার কম নয়, সে নিজেও জানে। শরীরটাকে ঢেকে পথে চল্‌তে তাকে বিশেষ বেগ পেতে হয়। বাস্তবিক, ভগবান তাকে রূপ আর দেহ দিয়ে জব্দ করেছেন, নৈলে সে সহজ হয়ে পথে চলতে পারত।

ছাতাটা নিয়ে মায়ালতা বেরুলো মন্থরপদে। লক্ষ্য যদি বা থাকে, উদ্বেগ নেই। পথের দ্রষ্টব্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ ছিল না, হেঁটে যাওয়াটাই তার কাজ। চোখ দুটো তার আপন মনের দিকে। সেখানে সে তপস্বিনী।

এই ধরণের জীবন-নির্ব্বাহের কারণ ও কৈফিয়ৎ তার কাছে সুস্পষ্ট নয়—এই কথাই তার বার বার মনে আসে। সাধ ছিল তার অনেক, ভালো ক'রে বাঁচার সাধ। কিন্তু এই বা মন্দ কি! স্বাধীন, স্বপ্রতিষ্ঠ, স্বস্তিপূর্ণ। এই যে সে পথে বেরিয়ে এলো, তার জন্য কেউ ভাববে না, তারো দুর্ভাবনা নেই কারো জন্য। প্রতিদিনই তার সুখে থাকার কথা, প্রতি মুহূর্ত্তে। সুখেই সে আছে।

মেয়েরা গৌরবের অধিকারিণী হয় বিবাহিত জীবনে। শ্রী, নীতি, শৃঙ্খলা। সাজানো ঘর, পাতা উনুন। প্রেমিক রূপবান্ স্বামী, নিশ্চিন্ত স্বচ্ছল সংসার, পাঁচজনের ক্ষুধার্ত্ত মুখে অন্ন জোগানো, পুত্রকন্যা পালন করা। গৃহিনী, সচিব, সখী। সিন্দুকে টাকা, সর্ব্বাঙ্গভরা গহনা, আদরের বউ, পাল-পার্ব্বণ, তীর্থ-ধর্ম্ম—চিত্রটা ভাবতেও বেশ লাগে। কিন্তু তারপর কি? সিঁথীর সিঁন্দুর কপালে নিয়েই একদিন পুত্র-পৌত্রের কাঁধে চ'ড়ে চ'লে যাওয়া? যাওয়াটা ভালো, তবু যে কিছু বাকি রয়ে গেল। পথের দিকে মায়ালতা তাকালো। তাকালো আকাশের দিকে। দেখলে, তার সেই পরলোকগত আত্মার চেহারাটা। আরো কিছু বাকী ছিল পাবার। সমস্ত পেয়েও তার অতৃপ্তি।

বিবাহিত জীবনের মনোহর চিত্রটা লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। হাসি এল তার মুখে। আবার সে চল্‌তে লাগল।

বর্ষাকাল, তবু দেখা গেল আকাশ পরিচ্ছন্ন, সূর্য্যদেব যথারীতি পশ্চিমের দিকে নেমেছেন, গাছের ডগায় রোদ উঠেছে। ছাতাটা সঙ্গে না আনলেই চল্‌ত।

একটা ঠিকানা ধ'রে সে এক জায়গায় এসে থাম্‌ল। অনেকদিন অনেক দিকে ঘোরাঘুরি ক'রে পথঘাট তার খুব চেনা হয়ে গেছে। একটা

বাড়ীর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে কড়া নাড়ল। একটু পরেই ভিতরে থেকে সাড়া পাওয়া গেল।

চাকর দরজা খুললে। সম্মুখে স্ত্রীলোক দেখে সে থতমত খাবার আগেই মায়ালতা জিজ্ঞাসা করলে, এখানে অমরেশবাবু থাকেন?

হ্যাঁ, কাল থেকে তাঁর জ্বর।

দেখা হ'তে পারে তাঁর সঙ্গে?

তিনি এই বাইরের ঘরেই থাকেন, আমি খবর দিই। এই ব'লে চাকরটা চলে গেল।

এক মিনিট মাত্র, তারপরই দ্রুতপদক্ষেপে অমরেশ এসে হাজির। রুদ্ধশ্বাস আনন্দে বললে, অবিশ্বাস্য! এ স্বপ্ন, না মায়া?

মায়ালতা হেসে বললে, মায়া এবং মতিভ্রম! কিন্তু জ্বর হোলো কেন?

শরীরম্ ব্যাধিমন্দিরম্! আসুন, আসুন, আমার সৌভাগ্যের তুলনা নেই। এই ব'লে অমরেশ হাত জোড় ক'রে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল।

বাইরে পাশাপাশি দুটো ঘর। সম্মুখে খুব বড় একটা উঠোন, ও-দিকে অন্দর-মহল। এদিকের সঙ্গে ও-দিকের বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই। একটা ঘরে গিয়ে মায়ালতা ঢুকল।

ঘর বটে! বাজারের কী না এখানে পাওয়া যায়? বিশৃঙ্খলা মায়ালতা অনেক দেখেছে, কিন্তু তার চেহারা যে এমন ভয়ামক হতে পারে, তা আগে জানা ছিল না। কোথাও পা বাড়াবার উপায় নেই। জামা কাপড়গুলো মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছে, সেগুলির উপর দিয়ে কতদিন ধ'রে কত লোক যে যাতায়াত করছে, তার ইয়ত্তা নেই। ছবিগুলো ছড়ানো, কয়েকটা কাঠের ষ্ট্যাণ্ড্ বেয়াড়া অবস্থায় দাঁড় করানো, ভাঙা কাঁচের গেলাস, অসংখ্য বিক্ষিপ মাসিকপত্র, রঙের বাক্স, দেশালাইয়ের কাঠি,

নোংরা বিছানা, কালিঝুলি মাখা চায়ের কেৎলি, ছবির ফ্রেম, সমস্ত তাল-গোল পাকিয়ে সারা ঘরখানাকে অনধিগম্য ক'রে তুলেছে। মায়ালতার দম আটকে এলো। এরা বোধ হয় সবাই এমনি অমানুষ, অকর্ম্মণ্য!

হঠাৎ পথভুলে যে দরিদ্রের কুটীরে এলেন?

অমন চিঠি পেলে আসতে হয় বৈ কি। যেতে মানা করেছি, তাব'লে দেখা হতে ত বাধা নেই! ভাবলুম, কবির শ্রীনিকেতন একবার দেখেই আসা যাক্। ওরে বাপ্‌রে, এই কি তার শ্রী? এবার একটা বিয়ে করুন অমরেশবাবু, ঘরও গুছিয়ে দেবে, কবিতাও নকল ক'রে দেবে।

অমরেশ বললে, দেশে তেমন ভাগ্যবতী মেয়ে এখনো বোধ হয় জন্মায় নি।

ছু'জনেই হাসতে লাগল।

মায়ালতা বললে, এখানে এসেছি, অসুবিধে হচ্ছে না ত? ভেতরে কে আছেন?

অসুবিধে আপনি এসেছেন ব'লে? মোটে না। এ জায়গাটা অদ্ভুত! একদিকে এটা আমার সম্পর্কে মামার বাড়ী,—মামা থাকেন ঘর-জামাই হয়ে। মামী এবং তাঁর মা বাপ কেউ বেঁচে নেই, সুতরাং মামার বাড়ীই বলা যাক্। অন্য দিকে আবার দাদার শ্বশুর বাড়ী। শ্বশুর হচ্ছেন স্বয়ং মাতুল।

কি রকম হোঁলো?

অমন হয়, এ এক জটিল আত্মীয়তা, বুঝতে সময় লাগে। আমি থাকি এই ঘরটায়, মাসে মাসে খরচ দিই। আমার এই স্বাধীন রাজ্যে এসেছেন আপনি, অতএব মা ভৈঃ। আমাকে মনে ক'রে এসেছেন, এ যে আমার পক্ষে কত বড় আনন্দ সে কেবল আমিই জানি।

মায়ালতা বললে, আপনার চিঠি পেলুম কাল। অমন সুন্দর চিঠি আপনার, এত ভালো লাগল। যেতে মানা করেছি, তবু কোথাও আপনার

মনোক্ষোভ নেই, অভিমান নেই,—চিঠিতে আপনার হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া গেল।

অমরেশ সলজ্জ কণ্ঠে বললে, আপনি এলেন, জ্বর আমার সেরে গেছে। ওদিকে ছুদিন চন্দননগরের গঙ্গায় গিয়ে মাতামাতি ক'রে এসেছি, তাই একটু গা গরম হয়েছিল। অসুখ আমার বিশেষ হয় না। কবে যে আমি ডাক্তারী ওষুধ খেয়েছি, তা আমার মনেই পড়ে না।

গঙ্গায় মানুষ মাতামাতি করতে যায় এই বর্ষায় ?

মানুষ যায় না, কিন্তু আমি যাই। সময় ত কাটাতে হবে! পাড়াগেঁয়ে ছেলে, জল দেখলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। অনেক চেষ্টায় শহরের সমাজে ভদ্র সেজে থাকি, কিন্তু পা একটু পিছলে বাইরে গেলেই জাতীয় চেহারাটা প্রকাশ হয়ে পড়ে। নিজেকে আর ধ'রে রাখতে পারিনে।—এই ব'লে অমরেশ হাসতে লাগল।

আপনার ছবি আঁকা কেমন চলছে ?

ভালো কথা। বল্‌ব মনে ক'রে রেখেছি। সুরেশবাবুর উপদেশ কাজে লাগল। একখানা মাসিকপত্রে ছবি দিয়েছি। ছাপা হ'লে টাকা পাবো। তারা আরো চেয়েছে। এ আমার পক্ষে কম লাভ নয়।

তাহ'লে সুরেশবাবুর কাছে আপনি কৃতজ্ঞ বলুন ?

বিশেষ কৃতজ্ঞ। যদিও তিনি আমার উপর খুশী নন্‌ মনে হয়, তবুও তাঁকে আমি সম্মান ক'রে চল্‌ব।

মায়ালতা বললে, খুশী নন্‌ কেন জেনেছেন ?

অমরেশ মাথা হেঁট ক'রে নিঃশব্দে হাসলে। কিয়ৎক্ষণ পরে মাথা তুলে বললে, সবাই একরকম মানুষ হয় না, মায়াদেবী।

মায়ালতাও সুরেশবাবুর প্রসঙ্গ চাপা দিলে। অন্য কথা পেড়ে বললে, আপনার বাড়ী থেকে আপনার ওপর কোনো দাবী দাওয়া আসে না? আপনি খোঁজ খবর দেন্‌ না বুঝি ?

অমরেশ বললে, চিঠিপত্র আনাগোনা করে। দাবী দাওয়া আসে বৈ কি। উপার্জ্জন করতে হবে, বিয়ে হওয়া দরকার, সংসার—পাঁচজনের প্রতি কর্ত্তব্য। মায়ের হুকুমের আর শেষ নেই।

আপনি উত্তরে কি লেখেন ?

লিখি, উপার্জ্জন না করলেও একটা মানুষ উপবাসী যাবে না ; পৃথিবীর সকলেই বিয়ে করছে, আমার না করলেও চলবে ; সংসার করতে গেলে সঙ্কীর্ণতা এসে পড়বে—

আর কি লেখেন ?

আরো লিখি ; পাঁচজনের প্রতি-কর্ত্তব্য করবারই চেষ্টায় আছি ; ছবি এঁকে সবাইকে আনন্দ দেবো, সেটা কম কর্ত্তব্য নয়।

মায়ালতা হেসে উঠ্‌ল। অমরেশ পুনরায় বললে, সত্যি, এই জীবনযাপনই আমার খুব ভালো লাগে, মায়াদেবী। বাইরের ঘরে ব'সে ওই পথের দিকে চেয়ে দিন কাটাতে পারলে আমি আর কিছু চাইনে। যা চাইবো, সবই ত মিথ্যে! টাকা ফুরিয়ে যায়, যশ আসে একঘেয়ে হয়ে, মানুষ যায় ম'রে—। সংসারের খেলাঘর বাদ দিয়ে নিজেদের দিকে যখন চেয়ে দেখি, কী দেখতে পাই ? নিরুপায় আমরা। যত উপকরণ, যত আয়োজন, সমস্তই অলীক। মৃত্যুর দিকে কেবলই ছুটে চলা। সেদিন গেল বাল্যকাল, এখন যৌবন, তারপর আসবে জরা—তারপর পাকা ফল একদিন শুকনো বোঁটা থেকে খ'সে পড়বে।

মায়ালতা তার দিকে তাকালো।

অমরেশ বললে, তাই ভেবেছি টানাটানি কাড়াকাড়ি আর দরকার নেই। কিছু চাইব না। যা সহজে আসে, যা যায় সহজে। আপনি যদি আমার দেশে কখনো যান্, দেখাবো আমাদের গ্রামের পথ। চেয়ে ব'সে থাকি আমি সেই পথের দিকে। বেশ লাগে। লোকযাত্রা চলেছে দূর জনপদে, ক্ষেতে জন্ম নিল ধনলক্ষ্মী, ফুট্‌ল ফুল, নাম্‌ল সন্ধ্যা আকাশ রাঙিয়ে। ছোট হয়ে

জেগে থাকা, কেবল চোখ ভ'রে সব দেখে যাওয়া! গ্রামের ছেলে-মেয়ে, নদীর ঝরঝরানি, সকালের আলো, টুক্‌রো মেঘের গতি,—সব মধুর, সব সুন্দর!

মায়ালতা খুশী হয়ে বললে, কবিত্বময়।

হ্যাঁ, এই জীবন। চাইনে বড় কথা, বড় সাধনা, চাইনে জীবন-মরণ ভাসানো প্রেম। কেবল অলক্ষ্যে, অজ্ঞাতে রূপের পিপাসা মিটিয়ে যাবো। বাঁচবো কেউ জানবে না, মরবো কেউ শুন্‌বে না। মনে মনে শুধু এদের ভালোবেসে যাবো, মনে মনে যাবো প্রণাম রেখে দিয়ে। মায়াদেবী, একথা আমার মা বাবাকে বোঝাতে পারিনে কেন বলুন ত?

বোঝাতে গেলে তাঁরা বুঝতে পারবেন যে, আপনার ওই উর্ব্বর মস্তিষ্কে চন্দ্রদেবতা আবির্ভূত হয়েছেন। একটি নোলক-পরা' চেলী-মোড়া, সিঁদুরমাখানো মেয়ে আপনার ঘাড়ে না চাপালে চন্দ্ররোগ সারবে না। মা বাপের জ্বালা ত জানেন না অমরেশবাবু, তাঁরা চান্ সন্তানের মধ্যে যা চিরকালের পুরনো তারই অনুকরণ। সংসারেই অন্ধ হয়ে আসে মা-বাপ—একথা মনে রাখবেন।

দু'জনেই নীরবে রইল। একটা উগ্র আনন্দ অমরেশের মনে ফেনিয়ে উঠ্‌ছে। বাকি দিনটা তার আজ ভালই কাট্‌বে। এই মেয়েটির চারিদিকে একটি জ্যোতির্ম্ময় আভা সে অনুভব করে। এর কাছে থাকতে পাওয়া, এর কথা শোনা, এর মুখের হাসি, এর হাতের ভঙ্গী—রঙে রঙে অমরেশের মনে ছেয়ে আসে। এ যেন একটি প্রদীপ, এর কাছে ব'সে অমরেশ প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। এমন মেয়েকে অকর্ষণ করা যায় না, এমন মেয়েকে জানানো যায় না ভালোবাসা, এমন কথা আবেগের সঙ্গে বলা চলে না যে তোমার অভাব আমার সমস্ত জীবনকে ব্যর্থ ক'রে দেবে। এর চোখে আছে শাসন, হাতে আছে স্নেহ, এর কণ্ঠে অপূর্ব্ব সংযম, সর্ব্বাঙ্গে কঠিন সতর্কতা।

হঠাৎ অমরেশ বললে, আমার এখানে আসতে আপনার বাধলো না?

মায়ালতা কৌতুক ক'রে বললে, কথা বলবার আগেই আপনার মুখচোখ রাঙা হয়ে উঠছে। এখানে আসতে বাধবে কেন? দেখতে এলুম আপনাকে অসুখ করেছে আপনার—এর মধ্যে বাধা কি?

সহজ কণ্ঠের সহজ সুর। এর পরে আর কথা নেই। সমাজ, বিধি-নিষেধ, নীতি, হিতাহিত, লোকের নিন্দাপ্রশংসা—একসঙ্গে অমরেশের মনে ভিড় ক'রে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু সবাই যেন এই মায়াবিনীর পোষমানা জন্তু, আক্রমণ করে না, বশ্যতায় পায়ের কাছে লুটোয়।

অমরেশ বললে, এতটা পথ এলেন তাই বলছি।

মায়ালতা হাসলে। বললে, কথা ঘোরালেন, কেমন? ও-সব কিন্তু বুঝতে পারি, সাবধান। আপনার মতো কবিতা লিখতে পারিনে বটে, কিন্তু পথ বেশী হাঁটতে পারি আপনার চেয়ে।

অমরেশ বললে, আপনার বয়স কত?

যতই হোক, আপনার চেয়ে অন্তত দু'বছরের বড় আমি নিশ্চয়ই।

এ আপনার একগুঁয়েমি, মেয়েরাই কেবল এমন কথা বলতে পা[illegible] আমার কত জানেন? তেইশ।

তেইশ? মোটে? শুনলে হাসি পায়! আপনি সত্যিই ছেলেমানুষ দেখা গেল। মাত্র তেইশ? আমার সামনে যেন কোনোদিন সিগারেট খাবেন না, আমি আপনার চেয়ে তিন বছরের বড়।

দু'জনে হাসতে লাগল।

অমরেশ বললে, ধমকে মিথ্যা কথা আপনি বলতে পারেন জানি, কিন্তু আপনি যে বড় তার প্রমান?

মায়ালতা বললে, প্রমান আমার চেহারা।

চোখ পাকিয়ে অমরেশ বললে, এবার কিন্তু আপনাকে লজ্জা দেবো! ছাব্বিশ দূরের কথা, তেইশও নয় আপনার।

রাগ ক'রে মায়ালতা বললে, আমি আপনার চেয়ে বড়, একথা আপনি মানবেন কিনা শুনতে চাই।

হাত যোড় ক'রে অমরেশ বললে, মান্‌ব, শপথ ক'রে রাখলুম।

আমার চেয়ে ছোট, এমনি ব্যবহার করবেন?

করব।

আমার হুকুম পালন করবেন?

যথা আজ্ঞা।

আমার হাতে নিজেকে সঁপে দেবেন?

অবনতমস্তকে অমরেশ বললে, তথাস্তু দেবী।

মনে থাকবে ত?—ব'লে মায়ালতা অমরেশের দিকে তার সুন্দর হাতখানা বাড়িয়ে ধরলে।

দু'হাতে সেই হাতখানি চেপে ধ'রে অমরেশ কম্পিত কণ্ঠে বললে, প্রতিজ্ঞা করলুম।

মায়ালতা উঠে দাঁড়ালো। বললে, আজ চললুম।

অমরেশ ব্যস্ত হয়ে বললে, আমিও যাব সঙ্গে।

সে কি, এই জ্বর—কষ্ট হবে যে!

এর পরেও কষ্ট, এর পরেও জ্বর? তা হবে না, অন্তত কিছুদূর যাবো, কাছে কাছে থাক্‌ব।

হেসে মায়ালতা বললে, এসো, তোমার সঙ্গে যেতে আর বাধা নেই।

ক্ষণেকের জন্য অমরেশ তার মুখের দিকে তাকালো। তারপর বললে, আমি যেন তোমার কাজে লাগতে পারি। চলো। তুমি আমার পরম আত্মীয়!

স্নেহসিক্ত চক্ষে মায়ালতা তার দিকে তাকালো। তারপর দু'জনে নেমে এলো পথে।

বউবাজারের বাড়ীর দরজায় যখন দু'জনে এসে দাঁড়ালো তখন চারিদিকে আলো জ্ব'লে উঠেছে। অমরেশ এতক্ষণ পরে বললে, এখানে কা'র কাছে এলে মায়াদি?

দেখাবো তোমাকে, খুশী হবে তুমি। আমার সমস্ত প্রাণ এই দরজায় হানা দিয়ে থাকে অমরেশ।—ব'লে মায়ালতা কড়া নাড়্‌ল।

কে ইনি?

উত্তর দিতে গিয়ে হৃদয়বেগে মায়ালতা কণ্ঠ অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে ভ'রে গেল! বললে, আমার সকলের বড় আত্মীয়, এঁর জন্যেই আমার যা কিছু।

কই এতদিন ত বলোনি? আমি এতদিন আলাপ করতুম।

বেশ ত, আজ করবে। মানুষের মধ্যে মানুষ, দয়াহীন স্নেহহীন বৈরাগী। নাম সুরপতি। তোমার চেয়ে বেশি বড় নন্।

অমরেশ অবাক হয়ে গেল। মায়ালতা আব্যার দরজায় ঘা দিলে

দরজা খুলে গেল। বাড়ীর ঝি বললে, কে গা, কা'কে চাই?

আমরা ভেতরে যাবো। এসো অমরেশ।—ব'লে মায়ালতা ভিতরে ঢুকে কলতলা পার হয়ে দালানের উপর উঠে একখানা বিশেষ ঘরের দিকে অগ্রসর হোলো।

বাড়ীর দু'একজন স্ত্রীপুরুষ উপরের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। মেয়েটি বললে, কা'কে চাই?

ঘরের ভিতরে একবার তাকিয়ে ফিরে এসে মায়ালতা বললে, এই ঘরে যিনি থাকেন, সুরপতিবাবু—তিনি কোথায়?

তিনি ত নেই?

নেই?

না, এ বাড়ী ছেড়ে দিয়ে গেছেন, আজ চারদিন হোলো।

মায়ালতা অমরেশর দিকে তাকিয়ে একবার স্থির হয়ে দাঁড়ালো। তারপর উপরের দিকে চেয়ে কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, কোন্ ঠিকানায় গেছেন বল্‌তে পারেন?

মেয়েটি বললে, তিনি ত ঠিকানা রেখে যান্ নি।

কোথায় গেছেন কিছুই জানা নেই আপনাদের ?

লোকটি এবার কথা বললে,—একবার বলেছিলেন যে তিনি বিদেশে যেতে চান্। আর কিছু বলেন নি।

মায়ালতার কান্না পাচ্ছিল। দ্রুতপদে সেই ঘরখানার ভিতরে গিয়ে একবার পায়চারি ক'রে এলো। নীচের অন্ধকার অলিগলির দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে একবার পর্য্যবেক্ষণ করলে। মনে হোলো, সে যেন আর সুস্থ নেই। মাথার মণি তার হারিয়েছে, তাকে সামলানো কঠিন।

অমরেশ গিয়ে তার হাত ধরল। বললে, এখানে আর দাঁড়ানো চলে না মায়াদি। এসো বাইরে যাই।

মায়ালতা বেরিয়ে এলো তার সঙ্গে। পথে নেমে রক্তহীন অচেতন মুখে বললে, কোথায় যাবো ?

যাবে তোমার বাসায়! তাই বলে মন খারাপ করলে চল্‌বে কেন মায়াদি ? গেছেন কোথাও ; বেশ ত, আবার ফিরবেন' আবার দেখা হবে।

চল্‌তে চল্‌তে মায়ালতা বললে, ঠিকানাটাও—

ঠিকানা পাওয়া যাবে বৈ কি। আমি তোমার কাজে লাগব একথা ভুলে গেলে কেন ? আমাকে কি তুমি বিশ্বাস করতে পারো না ?

পারি।

তবে চলো আজকের মতন। যারা প্রিয়, যারা আপন তারাই যায় দূরে, তারাই দেয় দুঃখ। ব্যথায় রঙীন যে ভালোবাসা, সেই দুর্লভের কিছু মূল্য তুমি দেবে না মায়াদি ? এমনিই পাবে তাঁকে ? সোজা হয়ে চলো, শক্তি ফিরিয়ে আনো।

টস্ টস্ ক'রে মায়ালতার চোখের জল গড়িয়ে এলো। পথের মাঝখানে সঙ্গিনীর চোখের জল—অমরেশ একটু বিপন্ন বোধ করলে। সান্ত্বনার ভাষা নেই, তাছাড়া এ মেয়ের কাছে সে সমস্তই মিথ্যে। শিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত

মেয়ে যে হৃদয়াবেগে পথের মাঝখানেও অশ্রু ত্যাগ করে এ তার জানা ছিল না। মাধুর্য্যে ভ'রে গেল তার মন, একটি বেদনাময় আনন্দ সে আপ্লুত হোলো। এমন অশ্রু দেখবার সৌভাগ্য অনেকের জীবনেই ঘটে না।

উৎসাহহীন পদক্ষেপ, দ্রুততা নেই। মায়ালতার অবসন্ন পা দু'খানার ক্লান্ত গতির দিকে অমরেশ ফিরে ফিরে লক্ষ্য করছিল। সেই পা কেবলমাত্র রূপসুন্দর নয়, সে-পায়ের যেন ভাষা আছে। তারই কাছে-কাছে নিজের পা ফেলতে অমরেশের আজ বড় ভাল লাগছে। এমন নিবিড় ক'রে আর কখনো সে সৌন্দর্য্যোপলব্ধি করে নি। এ যেন তার জীবনের সর্ব্বোত্তম মধুর মুহূর্ত্ত। তবু নিজের চিত্তের ভিতরে সে একবার পর্য্যবেক্ষণ ক'রে দেখলে, তার এই স্নেহাসক্তির চেহারাটা ঠিক কেমন! সে কবি, সে ভাবপ্রবণ, তবু আত্মবিচারে সে অপটু নয়। এই মেয়েটিকে ভগ্নী ব'লে মনে করতে বাধে, প্রেয়সী ভাবা অত্যন্ত কষ্টকর, গুরুস্থানীয়া মনে করতে প্রবল সঙ্কোচ—অথচ সমস্ত জড়ানো একটা কিছু। মন বলছে, তুমি অতি প্রিয়, তুমি আত্মীয়। তোমার কাজে নিজের জীবনকে ঢেলে দিতে পারি, তোমারই জ্যোতির্ম্ময় পরিমণ্ডলের মধ্যে আমি আমার নীড় বেঁধে থাকতে চাই। তুমি আমার স্বপ্নকন্যা। তুমি কবিতা!

কেমন সে মানুষটি, যার প্রতি এই নারীর এমন গভীর অনুরাগ? কেমন সে, যে পেলো এত শ্রদ্ধা, এত পূজা! সুরপতিকে সে দেখেনি, কেবল মাত্র শুনেছে নাম। তবু সে কল্পনা করলে, সেই যুবকের গগনস্পর্শী উদারতা, অপরিমেয় মহত্ত্ব। অমরেশ মনে মনে প্রণাম জানালে সেই দীপ্তশ্রী দেবতার উদ্দেশে, যারা পায়ের তলায় উজাড় ক'রে দিয়েছে এই নারী আপন বক্ষের অফুরন্ত সুধার ভাণ্ডার।

মায়াদি?

আঁচল দিয়ে চোখ মুছে মায়ালতা মুখ তুললে। ম্লান হেসে বললে, *ভারি ছেলেমানুষী হয়ে গেল, নয়? আজ সকাল থেকেই মনটা ভালো*

ছিল না। তাঁর এমনি চলে যাওয়াটা ভারী বিচিত্র। আর ত কিছু নয়, তাঁর কুশল সংবাদটা যতদিন না পাই, ততদিন উদ্বিগ্ন থাকতে হবে। আশ্চর্য্য মানুষ!

অমরেশ বল্‌লে, আমাকে কি করতে হবে বল্‌লে না ত?

হাল্‌কা হেসে মায়ালতা বললে, তোমাকে চিরদিন আমার হুকুম তামিল করতে হবে। যদি অবাধ্য হও তবে আদালতে নালিশ করব।

পথ ফুরিয়ে এসেছিল। অমরেশ বল্‌লে, তিনি কখনই চুপ ক'রে থাকবেন না মায়াদি, আমি ব'লে রাখলুম। ঠিক খবর আসবে। আবার দেখা পাই যেন, আমি এখন যাই এখান থেকে, কেমন?

এসো। ব'লে মায়ালতা একবার তার হাতটা ধ'রে নেড়ে দিল। বললে, এতটা পথ হাঁটিয়ে অনেক কষ্টই দিলুম। কালকেই যেন আবার দেখা হয় তোমার সঙ্গে।

আচ্ছা। ব'লে অমরেশ চ'লে গেল।

বাসায় পৌঁছতে রাত সাড়ে আটটা বাজলো। চিন্তার বোঝা নিয়ে এলো সঙ্গে, মনটা থম থম করেছে। বাইরে ও ভিতরে দু' তিনটে আলো জলছে। ক্ষেমীর মা রান্না শেষ ক'রে খাবার ঢাকা দিচ্ছিল। মায়ালতার মনে হোলো, আজ সে বড় একা। আশেপাশে তার কিছু নেই; পৃথিবী নেই, সূর্য্য নেই, মানুষ নেই। পথটা তার অন্ধকার,— তাকে দুর্গমের দিকে যেতে হবে অথচ অভয়বাণী উচ্চারণ করার কেউ নেই। সে পুরুষ নয়, মেয়ে। অবলম্বনকে আশ্রয় করার প্রয়োজন আছে তার। তার সমস্ত কাজের পিছনে তার মূল প্রেরণা ছিল কোথায়, এখন সে চেয়ে দেখলো। ভয়ানক বিস্ময়ে দেখা গেল, সুরপতিই ছিল তার জীবন-নির্ব্বাহের কেন্দ্রশক্তি। তাকে নিয়ে বাঁচা, তাকে নিয়ে এই অধ্যাপনা, তাকে নিয়ে জীবনের এই উন্নতির আয়োজন।

বারান্দার ধারে মায়ালতা এসে দাঁড়াল। ভিতরটা যেন তার যন্ত্রণায় জলছে, সে কোন্‌দিকে যাবে! মনে হোলো অপমান ক'রে গেল তাকে।

তার সমস্ত মমতা আর আসক্তিকে অসীম তাচ্ছিল্যে দূরে ঠেলে দিয়ে গেল সুরপতি। স্ত্রীলোকের প্রয়োজন তার জীবনে নেই, কারণ সে আদর্শ পুরুষ, নিষ্ঠুর বৈরাগী। তাকে বেঁধে রাখা যায় না, ভোলানো যায় না, নারীর দেহ আর মনের লাবণ্য দিয়ে তাকে আকর্ষণ ক'রে আনা অসম্ভব, —মরুভূমির নিষ্ঠুর নির্ম্মলতা নিয়ে আপনার মধ্যে আপনি সে আত্মস্থ। মায়ালতার চোখ দুটো জ্বালা ক'রে এলো। মনে ভাবলে, তার সমস্ত মিথ্যা। তার রূপ, তার গুণ, তার এই যৌবন, তার শিক্ষা-সংস্কৃতি— এদের কোনো মূল্য নেই। তার রূপের খ্যাতি মিথ্যা, তার গুণের খ্যাতি কেবলমাত্র তোষামোদের নামান্তর। সুরেশবাবু ত দূরের কথা, অমরেশের প্রতিও তার মন বিরূপ হয়ে উঠ্‌ল। এরা তাকে কেবলমাত্র চাটুবাক্য শুনিয়েই এসেছে, তার যোগ্য মূল্য কেউ নির্দ্ধারণ করে নি। এমন ঐশ্বর্য্য তার কিছুই সংগ্রহ করা নেই, যার জন্য সে সুরপতির মতো মানুষের যোগ্য হয়ে উঠতে পারে। নিজের শোচনীয় পরাজয়টিকে অনুভব ক'রে অন্ধকারে তার চোখ দুটো সজল হয়ে উঠ্‌ল।

ক্ষেমীর মা এসে বললে, খেতে দেবো, দিদিমণি?

না, ক্ষেমীর মা। তুমি সেরে নাও, আজ শরীর ভালো নেই। —এই ব'লে মায়ালতা নিজের ঘরে এসে ঢুক্‌ল। আলো জ্বালার উৎসাহ নেই, অন্ধকারে বিছানার উপর সে গা এলিয়ে শুয়ে পড়ল। সে বড় ক্লান্ত। কুশল সংবাদ না এলে তার ক্লান্তি আর যাবে না। চোখ বুজে নিজের ভিতরটা সে দেখতে লাগল। ঝঞ্ঝাতাড়িত পাখীর মতো তার প্রাণ যেন পরমাত্মীয়ের আশ্রয়টি খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে! সে বড় অসহায়।

ক্ষেমীর মা ঘরে ঢুক্‌ল। আলোটা জেলে টেব্‌লের উপর রাখলে। বললে, আজ তোমার ঘর বেশ ক'রে গুছিয়ে দিলুম দিদিমণি, যে নোংরা হয়েছিল! ওই যা, ভুলেই যাচ্ছি, এই একখানা চিঠি তোমার নামে,— সুরেশবাবু এসেছিলেন—

ধড়মড় ক'রে মায়ালতা উঠে' বসল। বললে, কই চিঠি ক্ষেমীর মা? —তার নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে এলো।

এই যে এই চিঠি, খামে মোড়া,—সুরেশবাবু ব'সে ব'সে চ'লে গেলেন। কাল আবার আসবেন দিদিমণি।

তাড়াতাড়ি চিঠি খুলে মায়ালতা পড়তে লাগল,—

'সুচরিতাসু,

অপরাহ্নে এসে বসেছিলুম তোমার তপস্যায়। সত্যযুগে একাগ্রতার পুরস্কার মিল্‌ত, কলিযুগে দেবীপ্রসাদ পাওয়া কঠিন। সুরপতিবাবুর ভাগ্য ভাল। যাই হোক একটা সুখবর দিই। স্কুলকর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্ধারণ অনুযায়ী আগামী মাস থেকে তোমার মাসিক পারিশ্রমিকের উপরন্তু দশ টাকা বাড়ানো হয়েছে। তাঁরাও জানেন, তোমার যোগ্যতার মূল্য এর চেয়েও অনেক বেশী। বলা বাহুল্য, এই অযোগ্য আর অধনই প্রস্তাবটা উত্থাপন করেছিল।

অপরাহ্ন থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে রাত। অতএব আজকে আর অপেক্ষা করা গেল না। কাল আসব।

সুরেশচন্দ্র'

চিঠিখানা কুচি কুচি ক'রে ছিঁড়ে মায়ালতা ফেলে দিল। এর অর্থ তার কাছে সুস্পষ্ট। একটা বাজপাখী ঘুরছে তার মাথার উপরে, সুযোগের অন্বেষণ করছে। মায়ালতার বুকের ভিতর কাঁপতে লাগল। যার জন্য ছিল তার তেজস্বিতা, সে নেই। এবার সে দুর্ব্বল, আশ্রয়চ্যুতা, সর্ব্বশরীরের ভিতরে সে আর কোথাও শক্তি খুঁজে পাচ্ছে না, তার সম্মান আর ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করার মানুষ পৃথিবীতে আর নেই। অভিশাপ দিলে সে সুরপতিকে মনে মনে।

দিদিমণি, তোমার কি জ্বর হয়েছে?

মায়ালতা চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—কিছু হয়নি, যাও তুমি ক্ষেমীর মা। শুয়ে পড়গে যাও।

কেন শরীর খারাপ হোলো, না জেনে—

আঃ, তুমি যাও বল্‌ছি, ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। যাও।

ক্ষেমীর মা দ্রুতপদে চ'লে গেল।

নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে ওঠার এই যে উদ্যম, এ কা'র জন্য? সে যে সুরেশের সাহায্য নিলে, অমরেশের সঙ্গে পাতালো বন্ধুত্ব, চাক্‌রী নিলে স্কুলে, আত্মীয় পরিজন সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে রইল,—এ কা'র জন্য? কলিকাতা শহরের জন-জটলার ভিতরে এই যে তার একাগ্র মন নিয়ে দিনের পর দিন কাটানো, সংসার-রচনার কল্পনাকে নির্ম্মূল ক'রে মন থেকে তাড়ানো, তার নারী জন্ম, তার ভালোমন্দ, ইহকাল পরকাল—এর মূল্য কি সেই চরিত্রবান্ যুবকটির কাছে কিছুই নয়? ত্যাগের আদর্শটাই বড়? মমতা ও দাক্ষিণ্যের বুকের উপর দিয়ে বৈরাগ্যের রথ চালিয়ে যাওয়াটাই হবে পুরুষকার?

মায়ালতার চোখ দুটো আপমান-বেদানায় দপ্ দপ ক'রে অন্ধকারে জ্বল্‌তে লাগল।

কতক্ষণ কাট্‌ল, কে জানে। প্রহরের পর প্রহর নিঃশব্দে অতিবাহিত হতে লাগল। নিদ্রা? না, নিদ্রা আর আসবে না জীবনে। ভয়ানক প্রশ্ন উঠে দাঁড়াল সমগ্র ভবিষ্যৎকে পরিব্যাপ্ত ক'রে। পিপাসার্ত্ত আত্মা লোক থেকে লোকান্তরে উত্তরের সন্ধান ক'রে চলেছে। ভালবাসা কি ভাবোচ্ছ্বাস? স্নেহ কি বন্ধন? দাক্ষিণ্য কি দুর্ব্বলতা? একান্ত ক'রে প্রিয়জনকে চাওয়া কি কেবল আসক্তি আর চিত্তচাঞ্চল্য? তবে কি এই কথাই বুঝতে হবে, পুরুষের অনন্ত সৃজনানন্দের কাছে নারী কেবলমাত্র বাধা? এই বিচ্ছেদ কি এই কথাই কেবল জানিয়ে গেলে, তার মতো অগণ্য নারী প্রতি মুহূর্ত্তে ধাবিত হচ্ছে পুরুষের পিছনে পিছনে? নারীই ধাবমানা পলায়মান পুরুষের পশ্চাতে?

কিন্তু এও মিথ্যে! কখন্ যে মায়ালতার উত্তেজনার তীব্রতা কোমল

হয়ে এসেছে, সে বুঝতে পারে নি। নিদ্রাহীন দুটি চোখ দিয়ে নেমে এসেছে নিবিড় স্নেহের রসধারা। হৃদয় ভ'রে উপ্‌ছে উঠেছে সেই পলাতকের প্রতি কল্যাণ-কামনার মাধুর্য্য। দূরে গেছে সে চ'লে, কিন্তু সে নিরাপদে থাকুক, কুশাঙ্কুর তার পায়ে না ফোটে, দুর্য্যোগের রাত্রে সে যেন নিরুদ্বেগ আশ্রয় পায়, ক্ষুধায় যেন অন্ন জোটে, মলিন হয় না যেন তার কাঞ্চনাভ দেহ। মায়ালতার ব্যাকুল বক্ষ ভিতরে ভিতরে মথিত হতে লাগল। তার মাথার আলুলায়িত চুলের সঙ্গে বিছানার চাদর আর বালিশ ভিজলো অশ্রুতে। সম্মুখে রাত্রি-শেষের অন্ধকার সাঁ-সাঁ করছে! উঠে সে বস্‌ল জান্‌লা খু'লে দিয়ে। বুকের উপরে তার স্নিগ্ধ বাতাস মধুর সান্ত্বনা ছোঁয়াতে লাগল। অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষে সে জান্‌লার বাইরে চেয়ে ব'সে রইল। যুগে-যুগে যে বাৎসল্যের ক্ষীরধারায় পুরুষ সঞ্জীবিত হয়ে এসেছে, সে-অমৃত উৎস যেন অকস্মাৎ এই অন্ধকার রাত্রে মায়ালতার মাতৃহৃদয়কে অতিপ্লাবিত ক'রে ছুট্‌ল প্রিয়মানুষের দুর্গম পথের দিকে। হে তারকাময়ী নিশীথিনি, তুমি জানো সে কোথায়, কত দূরে, কিন্তু তোমার ওই জ্যোতির্ম্ময় সহস্র চক্ষু যেন বিশ্বের গোপন মাতৃহৃদয়ের পরম আশীর্ব্বাদের মতো সেই অকরুণের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিতে নিরন্তর চেয়ে থাকে।

ভোরের আভাস দেখতে দেখতে পূর্ব্ব দিগন্তে জেগে উঠ্‌ল।

পাঁচ

প্রভাতের স্নিগ্ধ হাওয়ায় ঘুম এসেছিল চোখে, এক সময়ে সেই তন্দ্রা আচম্‌কা ভাঙ্‌ল। মায়ালতা জেগে উঠে গায়ের উপর আঁচল টেনে দিলে।

স্বপ্নটা কী দেখলে ঠিক মনে আসছে না, কেবল কতকগুলি ছায়ামূর্ত্তি যেন মিলিয়ে গেল। ভীতি-সঞ্চার হয়েছে মনে। খোলা জান্‌লার বাইরে তন্দ্রাজড়ানো চোখে চেয়ে মায়ালতা ব'সে রইল। ঘরের ভিতরে এসে পড়েছে উজ্জ্বল রৌদ্র। আকাশে ঋতু-পরিবর্ত্তনের আভাস দেখা দিয়েছে। কখন্ বর্ষাকাল আপন জলধারার ভাণ্ডার নিয়ে দিগন্তের পারে চ'লে গেল, তার পথের আর চিহ্ন নেই। এখন শরতের প্রসন্ন দৃষ্টি, আকাশের নির্ম্মল উদার নীলিমায় সোনার মত রৌদ্রকিরণ দূরদূরান্ততে বিকীর্ণ হচ্ছে। এমন প্রভাতকে অভিনন্দন জানাবার আয়োজন তার নেই। সে নিঃস্ব হয়ে পথের ধূলায় মিলিয়ে গেছে। পরিশ্রান্ত অলস চক্ষে সে চেয়ে রইল।

এর পরে তার জীবনের চেহারাটা কেমন দাঁড়ালো? একটা ভারবাহী অবসন্ন জানোয়ার, যার বর্ত্তমান নেই। নিজেকে মান্‌তে হবে সান্ত্বনা, নিজের প্রতি উচ্চারণ করতে হবে অভয়বাণী। কিন্তু এই নিয়ে জীবনের বোঝা ব'য়ে বেড়ানোই কি হবে তার শেষ লক্ষ্য? বঞ্চিত হ'য়ে বাঁচাই কি তার পরম পরিণাম? গত রাত্রে যে-প্রার্থনা সে জানিয়েছিল সর্ব্বনিয়ন্তার উদ্দেশে, দিনের আলোয় মনে হলো সেটা একান্ত মিথ্যা। কল্যাণকামনা করেছে সে তার প্রিয়জনের, কিন্তু নিজে সে পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াবে কি নিয়ে? কী তার রইল সম্বল?

এই ভয়ানক ক্ষুধাটা তার চাপা ছিল। নিজের রূপটাকে সে জান্‌ত, নিজের উদ্দাত যৌবনকে সে রক্তের মধ্যে অনুভব করত। কিন্তু জান্‌ত না একজনকে ঘিরে এরা সার্থক হয়ে ওঠে। পুরুষকে চিন্‌তো, চিন্‌তো

না ভালোবাসাকে। আজ আবিষ্কার করলে, বেদনার আর এক নাম প্রেম। প্রেমের সঙ্গে বেদনার সম্পর্কটা অন্তরঙ্গ অভিন্নহৃদয় বন্ধুর মতো। গলার ভিতর দিয়ে মায়ালতার কান্না ঠেলে উঠে এলো। এমন শরৎকালের সুন্দর সকালটির কোনো স্বাদ নেই, এই সূর্য্যকরোজ্জ্বল পৃথিবীতে কোথাও নেই আশার বাণী,—একজনের অভাবে এরা যেন চারিদিক থেকে ঘিরে তার গলা টিপে মারছে।

স্ত্রীলোকের সমস্ত জীবন আশা ও প্রতীক্ষার ইতিহাস; কিন্তু যে-মায়ামৃগ ফিরে আসার পথের চিহ্ন না রেখে চ'লে যাওয়ার পথটাই দেখিয়ে যায়, তাকে কেমন ক'রে খুঁজে আনা যাবে? কী দিয়ে আনবে খুঁজে? ধিক্কার দিলে মায়ালতা মনে মনে। অকিঞ্চিৎকর তার ভালোবাসা, তুচ্ছ রূপ, তুচ্ছ তার দেহ। পুরুষের মতো পুরুষ যে, সে তার গোপন আত্মাভিমানকে দিয়ে গেল ভেঙে ধূলিসাৎ ক'রে। আয়োজন তার ছিল কোথায়? দেহের প্রাচুর্য্যের বিনিময়ে পেতে চেয়েছিল দেহাতীতকে? যৌবনের মূল্যে প্রেম? কাঁচের বদলে হীরে?

এমন সময় ঘরে ঢুকল ক্ষেমীর মা। গত রাত্রির কথাটা তার মনে ছিল, তবু সে ভয়ে ভয়ে বললে, চায়ের জল দেবো দিদিমণি?

চোখে জলের ধারা শুকিয়ে ছিল, আঁচল দিয়ে চোখ মুছে মুখ ফিরিয়ে মায়ালতা বললে, বেলা কত ক্ষেমীর মা?

তা' ন'টা হোলো বৈ কি দিদিমণি। কাল কিছু খাওনি রাত্তিরে, আজ একটু সকাল সকাল···রান্না আমার হয়ে এলো।

রান্না হয়ে এলো? কী রাঁধলে? তুমি তো আশ্চর্য্য কাজ করতে পারো? ক্লান্তি আসে না? জল তুললে, রাঁধলে···আচ্ছা পূজোর আর কত দেরি আছে জানো ক্ষেমীর মা?

ক্ষেমীর মা বললে, ওমা, এই ত আর আট দিন আছে মহালয়ার, তারপরেই বোধনের বাদ্যি! সকালবেলা কি সুন্দোর আগমনী গেয়ে গেল, শুনেছো দিদিমণি?

না শুনিনি, ঘুমিয়েছিলুম···না জেগেই ছিলুম বোধ হয়, মনে নেই। কি গান শুন্‌লে?

সেই যে সেই গানটা—'যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী—'কি চমৎকার গান, কেঁদে বাঁচি নে। আর দিদিমণি, পূজো এলো, আবার চলেও যাবে একদিন!

মায়ালতা একাগ্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর মৃদুকণ্ঠে বললে, এলো, আবার চলেও যাবে, নয়! ভালো কথা, তোমার ক্ষেমীকে কি যেন একটা দেবো বলেছিলুম, এই নাও ক্ষেমীর মা।—ব'লে বাঁ হাতের একগাছা সোনার চুড়ি খুলে ক্ষেমীর মার দিকে সে এগিয়ে দিলে।

সকাল বেলায় অপ্রত্যাশিত পুরস্কার পেয়ে ক্ষেমীর মা স্তম্ভিত,—ক্ষণকালের জন্য তার আর বাক্‌শক্তি রইল না। কিন্তু সে ক্ষণকাল মাত্র, তারপরেই গলায় আঁচল দিয়ে দূর থেকে মেঝের উপর ঢিপ ক'রে এক প্রণাম ফেলে সে চ'লে গেল।

এর বেশী চাইল না ক্ষেমীর মা, চাইলে মায়ালতা দিয়ে দিতে পারত। দেবার জন্য সে উৎসুক। অর্থ, অলঙ্কার, ঐশ্বর্য্য, এদের প্রয়োজন এক সময় ফুরিয়ে যায়, এরা যায় এক সময়ে মিথ্যে হয়ে। উপকরণ-বাহুল্যটা জীবিত থাকার জন্য, জীবনের জন্য নয়। আজ তার যা' কিছু বিসর্জ্জন দিতে মন চাইছে। যা' কিছু তার ভালো, যা' কিছু তার প্রিয়। চুলের রাশি আজ থেকে সে আর বাঁধবে না, সাদা থান ছাড়া আর পরবে না, সে সৌখিন শাড়ী, নরম বিছানায় নিদ্রা করবে পরিত্যাগ, আপন দেহকে অসহনীয় কৃচ্ছ্র-সাধনে করবে সে মলিন,—এবং সে চাকরী ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে যেদিকে যায় দু'চোখ। নদীতে নদীতে আছে জল, বনে বনে আছে ফল। এই রইল প্রতিজ্ঞা।

মায়ালতা উঠে একখানা কাপড় আর একটা জামা হাতে নিয়ে বাইরে চলে গেলে।

স্কুল বসলো বেলা তখন সাড়ে দশটা বেজে গেছে। শূন্য গৃহ কোলাহলে মুখর হয়ে উঠ্‌লো। সাদাসিধে একখানা কাপড় প'রে মায়ালতা চটিজুতোটা পায়ে দিয়ে নীচে নেমে এলো। রাশভারি মানুষ, সুতরাং বয়স অল্প হলেও অন্যান্য লেডি-টিচাররা তাকে সমীহ করেন। তাঁরা অনেকেই বয়োজ্যেষ্ঠা। বড় বড় মেয়েরা একে একে তাকে নমস্কার জানিয়ে চলে গেল। রাণীর মতো তার সম্ভ্রম!

মেয়ে-মহলে মেয়েমানুষের কৃতিত্ব অনেকটা দেহগত! তার পরে তার শিক্ষা, তারপরে বুদ্ধিমত্তা। মেয়েদের খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠা হওয়ার পক্ষে কাজ করে রূপ এবং যৌবনের প্রাচুর্য্য। মায়ালতা দল-ছাড়া নয়। তার মাথার এলোচুল থেকে চূর্ণ গুচ্ছ কপালের নীচে নেমে এসেছে, সুন্দর দু'খানি হাত ছড়ানো টেবিলের কাগজপত্রের মধ্যে, সংযমের লাবণ্য সর্ব্বাঙ্গে, —এজন্য প্রধান শিক্ষয়িত্রী হিসেবে তাকে মানায়। তার চেয়ে সুন্দরী কর্ত্তৃপক্ষের সন্ধানে আপাতত আর নেই, যদি কোনোদিন পাওয়া যায় তবে হয়ত এক দিন মায়ালতার চাক্‌রী যাবে। অর্থাৎ পৃথিবীটা পুরুষের, তাদের খেয়াল-খুশী আর রুচির উপর নির্ভর ক'রে রয়েছে স্ত্রীলোকের ভালো আর মন্দ। কিন্তু এজন্য মায়ালতার চিত্তগ্লানি নেই। পুরুষের পৃথিবীকেই সে পছন্দ করে। তারা স্রষ্টা।

একজন টিচার এসে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানালেন। মায়ালতা মুখ তুলে বললে, আজ আপনার এত দেরি কেন?

তিনি তাড়াতাড়ি খাতা সই করতে করতে বললেন, ছোট মেয়েটার অসুখ, তাই একবার ডাক্তারবাবুর ওখানে···বোধ হয় মিনিট পাঁচেক—

পাঁচ মিনিটই বা দেরি হবে কেন বলুন সরোজিনীদি',—স্কুলের ত' একটা নিয়ম-নীতি আছে। মেয়ের অসুখ, তা' ছুটি নিলেই ত' পারেন।

সরোজিনীদি তার মুখের দিকে তাকিয়ে একটা ঢোক গিলে বললেন, পরশু ছুটি চেয়েছিলুম, কিন্তু আপনি গ্রাণ্ট্‌ করেন নি।

মায়ালতা একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। বললে, ও তা' হবে, মনে ছিল না। দরখাস্তটা কোথায় ?

আপনার ওই ড্রয়ারে।

ড্রয়ারটা নাড়াচাড়া ক'রে মায়ালতা একখানা কাগজ বা'র করলে। তারপর বললে, এত সংসারি মানুষ হ'লে কাজ করা চলে না। আজ মেয়ের অসুখ, কাল স্বামীর মাথা ধরা পরশু দিন রাঁধতে গিয়ে গেল হাত পুড়ে, তারপর কবে করুণাদি'র মতন বলবেন, ছেলে হওয়ার জন্যে তিন মাস ছুটি চাই,—এইজন্যেই মেয়েদের স্বাধীন জীবিকা স্থায়ী হয় না। যান্, সাত দিনের ছুটি আপনার রইলো।

সকৃতজ্ঞ হেসে সরোজিনীদি' উঠে যাচ্ছিলেন। মায়ালতা ডেকে বললে, মাসের ত শেষ, নিশ্চয়ই হাতে কিছু নেই। বাড়ীতে অসুখ, চলবে কেমন ক'রে ?

সরোজিনী বললেন, ডাক্তারবাবুর ওখান থেকে ধারে ওষুধ পাবো।

ওষুধ হোলো, কিন্তু পথ্য ? চুপ ক'রে রইলেন কেন,—বুঝতে পেরেছি। —ব'লে মায়ালতা মনিব্যাগ খুলে পাঁচটি টাকা বা'র ক'রে তার দিকে এগিয়ে দিলে। পুনরায় বললে, খুকীর জন্যে ফলপাকড় আনিয়ে দেবেন। তুলে নিন্!

বড় উপকার করলেন। এই ব'লে টাকা পাঁচটি নিয়ে সরোজিনীদি' খুসি হয়ে চ'লে গেলেন।

তারপরে আর একটি মেয়ে ঘরে ঢুক্‌লো। তাকে দেখেই মায়ালতা বললে, তোমার আবার কি হোলো সুচরিতা ? সুতিকা নাকি ?

শ্যামবর্ণা মেয়েটি হঠাৎ হেসে উঠলো। বললে, বিয়ের আগে ও-রোগ হয় না মায়াদি।

ঠোঁট দুটি কুঞ্চিত করে' মায়ালতা বললে, দিনকাল খারাপ, কার বিয়ে যে হয়েছে আর হয়নি বোঝা কঠিন। কি চাই বলো।

সুচরিতা বললে, থ' পড়া ইস্কুল আপনার, ক্লাসে গিয়ে দেখি, দোয়াতে কালি নেই।

মায়ালতা বললে, কালি কি হবে, কপালে মাখবে ?

এদিক ওদিক তাকিয়ে সুচরিতা চুপি-চুপি হেসে বললে, মনের মানুষ থাকলে মাখতুম বৈ কি !

তুমি বড়ো ফাজিল হয়ে যাচ্ছ, সুচরিতা !

সুচরিতা ভয় পাবার মেয়ে নয়। করুণকণ্ঠে বললে, কি করব বলুন মায়াদি। মেয়ে হয়ে জন্মালে জানতুম বিয়ে হয়, কিন্তু বৈদ্যের ঘরে জন্মালে যে মেয়েকে রোজকার করতে হয়, এ জানতুম না।

মায়ালতা হেসে বললে, আমি কি বৈদ্য ?

আপনারটা বিলাস আমারটা সংগ্রাম। সুরেশবাবু বলেন, আমার এই সংগ্রাম একদিন আমাকে নাকি মহীয়সী ক'রে তুলবে। সুরেশবাবুর বুলিগুলো বেশ ভালো।

তাই নাকি ? সুরেশবাবুর সঙ্গে তোমার দেখা হয় ?

হয় বৈ কি, প্রায়ই যান আমাদের বাসায়। ভদ্রলোক কেবল উপদেশ দেন না, বেশ গল্প বলতেও পারেন।

তাই নাকি ? বেশ। তোমার সঙ্গে কদ্দিন ভাব হোলো ?

সে এক ভারী মজার কাণ্ড।—সুচরিতা বললে, আমাদের পাশের বাড়ীর মেয়ে-মহলে খুব নাম তাঁর। সেই বাড়ীতেই একদিন আলাপ তাঁর সঙ্গে। এ চাকরী ত তিনিই ক'রে দিলেন মায়াদি ! আমার প্রতি সুরেশবাবুর যথেষ্টই অনুগ্রহ বলতে হবে।

মায়ালতা অন্যমনস্ক হয়ে বললে, হ্যাঁ, বিশেষ। তুমি বেড়াতে যাও না তাঁর সঙ্গে, সুচরিতা ? মানে, তিনি তোমাকে নিয়ে যান্ না ?

ওরে বাবা—সুচরিতা বললে, আপনি পেটের কথা বা'র ক'রে নিতে চান্ কেমন মায়াদি ? যাই বৈ কি এক আধ দিন—ভদ্রলোকের আচার

ব্যবহার মন্দ নয়। খুব সরস আলাপের চেষ্টা। কিন্তু একটু যেন কেমন মেয়েঘ্যাঁষা, এই জন্যে মাঝে মাঝে খারাপ লাগে।

কি রকম ?—মায়ালতা বললে।

এমনি দেখি লোকটি কর্কশ, উকীল হিসেবে কিছু দুর্নামও আছে, কিন্তু মেয়েমানুষের কাছে এলেই তাঁর মুখ মিষ্টি হয়ে ওঠে। কী বিনয়ী আর ভদ্র! মেয়েদের উপকার করবার জন্য কী আকুল আগ্রহ! আদালতের সময়টুকু ছাড়া সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত মেয়েদের ভাবনা নিয়েই তাঁর কাটে। নিত্য নতুন আঁচলের হাওয়া না খেলে তাঁর শরীর ভালো থাকে না।

মায়ালতা বললে, তা'হলে এটা তার স্বভাব বলো সুচরিতা ?

না, মায়াদি, এটা ওঁর একটা রোগ।

দু'জনেই হাসতে লাগল। মায়ালতা এক সময় বললে, বেশ ত, বিয়ে ক'রে তুমি সুরেশবাবুর এ-রোগটা ছাড়িয়ে দাও না ?

ওরে বাবা, বিয়ে করবেন তিনি ? তা'হলেই হয়েছে! ওদিকে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ভারি হিসেবী! ধরি মাছ না ছুঁই পানি!—বলতে বলতে হেসে সুচরিতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মায়ালতা ডাকলো মোক্ষদা ?—একটা বেল্ বাজালো।

মোক্ষদা নামক একটি প্রৌঢ় স্ত্রীলোক এসে দাঁড়ালো।

মায়ালতা তীব্রকণ্ঠে বললে, কেমন কাজের মানুষ গো তুমি ?

কেন বড় মা ?

কালি-কলম গোছানো থাকে না, কাজ করো কি আমার মাথা-মুণ্ডু! যাও সুচরিতাদির ক্লাসে কালী দিয়ে এসো। এবার তোমার মাইনে কাটা যাবে।

এতবার তার মাইনে কাটা হয়েছে যে, হিসাব করলে মোক্ষদার কাছেই কিছু পাওনা হয়। অথচ চাকরীও যায় না, মাইনেও পায় সে নিয়মিত। মোক্ষদা অলক্ষে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হেসে বেরিয়ে গেল।

বেলা বারোটা বাজলো। এইবার মায়ালতাকে ক্লাস নিতে হবে।

ছুটির পরে মায়ালতা আবার একা। দুশ্চিন্তা আবার তাকে ধরবে ঘিরে। এই দুশ্চিন্তার বোঝা ক-দিনই বা সে বইতে পারবে? তাকে চ'লে যেতে হবে। যাবেই বা কোথায়? সমস্যাটা তার থাকবেই। সঙ্গে যাবে জীবন-সংগ্রাম, সঙ্গে যাবে এই ভয়ানক দুঃখদায়ক প্রতীক্ষা। প্রতীক্ষা সে করবে সুরপতির জন্য, আজীবন আমরণ। বাস্তবিক, তার জীবনধারা অদ্ভুত; এমন একটা অর্থহীন ইতিহাস কোথাও পাওয়া যায় না। অবস্থাপন্ন ঘরের আদরিণী মেয়ে সে, যত্নে লালিত, ঐশ্বর্য্যে প্রতিপালিত। শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ পেয়েছিল সে অবারিত, সংরক্ষণশীল পরিবার হলেও বাধা কোথাও ঘটে নি। আত্মীয় পরিজনের প্রত্যাশা ছিল উজ্জ্বল, কারণ তার মতো সুশিক্ষিতা আর রূপবতী মেয়ে নাকি দুর্লভ। তারপর সে পালিয়ে গেল হরিহরদাদার সঙ্গে। সেও এক অদ্ভুত সংসর্গ। দীর্ঘকাল ঘুরে বেড়াতে লাগল দেশদেশান্তরে। হরিহরদাদাকে ভালো সে বাসেনি, কিন্তু তাঁকে ভাল লেগেছিল। মনে হোতো এ লোকটা সব পারে। সৃষ্টি দিতে পারে রসাতলে, গড়তে পারে নূতন পৃথিবী আর অভিনব সমাজ। তাঁর আদর্শের মধ্যে বিপ্লবের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। কিন্তু দেখা গেল, লোকটি অসাধারণ দায়িত্ব-জ্ঞানশূন্য মমত্বলেশহীন,—বিবেচনা, স্নেহ, দাক্ষিণ্য বিন্দুমাত্রও নেই, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত আর উদাসীন। তাই তিনি যেদিন ছাড়লেন মায়ালতাকে, মায়ালতা সেদিন বিপন্ন হোলো বটে, কিন্তু ব্যথা পেলে না। হৃদয়ের সুর বিন্দুমাত্রও ছিল না। জাত গেল, সম্ভ্রম গেল, চরিত্রের সুনাম গেল সংরক্ষণশীল পরিবারের আশ্রয় গেল চিরদিনের জন্য মুছে—অথচ কিছুই যাবার কারণ ঘটে নি, যেমন সে ছিল তেমনিই আছে।

এমন সময় সুরপতি। পাওয়া গেল বুঝি দেবতাকে। বড় জীবনের টানে মায়ালতা এসেছিল ঘর ছেড়ে, অস্পষ্ট ছিল তার স্বপ্ন,—কিন্তু স্ত্রীলোক সে, এ কথা ভুলতে পারলে না, যেদিন সে প্রথম দেখল সুরপতিকে

কি ভালই লাগল! মনে করেছিল নিজেকে প্রসারিত ক'রে দেবে সংসারময় আপন নারী-শক্তিতে, বিকীর্ণ করবে অজস্র কিরণধারা, নারীর তপস্যা নিয়ে আন্দোলন জাগিয়ে তুলবে দেশে দেশে; দাসত্ব শৃঙ্খলকে ছিন্নভিন্ন ক'রে দেবে চারিদিকে—কিন্তু কি হোলো? দেখা গেল তার চেয়ে অনেক বড় অনেক গভীর কামনা সুরপতির চোখে, বীরের তপস্যা তার, সন্ন্যাসীর বৈরাগ্য তার। তাকায় না ফিরে, চ'লে যায় আকাশের দিকে চোখ রেখে, তার বিরাট স্বপ্ন, বিপুল আশা—তাকে ধরা যায় না, বাঁধা যায় না, টানা যায় না। এমন চরিত্র শঙ্কাজনক। অথচ কী ভালোই লাগল! আধার পেলে নারী আত্মদান করলে নিঃশব্দে। দেবতার হাসিমুখ দেখলে, প্রসন্ন দৃষ্টির নীচে করলে মাথা নত, মনে হোলো জীবন যৌবন তার ধন্য হয়ে গেল। একটি যুবক—যার কর্ম্মধারার সঙ্গে তার কোনো পরিচয় নেই, যার কাছে পেলে না সে প্রেমের প্রতিদান যে তাকে কোনো দুর্দ্দিনেই আশ্রয় দেয়নি—কেন তার প্রতি মায়ালতার এত অসক্তি? এমন নির্বোধ অনেক আছে সংসারে আদর্শ খাড়া করে পূজা দিতে না পারলে তাদের আর স্বস্তি নেই; নির্বোধের আদর্শপূজা, অজ্ঞের অকারণ শ্রদ্ধা।

কিন্তু ভালো লাগা আর ভালোবাসার পথটা বিচিত্র। এখানে ন্যায়শাস্ত্র আর বুদ্ধির বিচারটাই বড় নয়, হৃদয়ের অন্তর্দৃষ্টিটাই এখানে মুখ্য। মনে বললে, এর জন্য সব ত্যাগ করতে পারি, এর জন্য দিতে পারি ধর্ম্ম, একে নিবেদন করতে পারি এই দেহ, এই রূপ। সেই এক পরম মুহূর্ত্ত। কিন্তু সেও একদিককার কথা। পুরুষের দিক থেকে পাওয়া গেল না আকর্ষণ। স্নেহের স্পর্শ পাবার জন্য আপন ঔৎসুক্য নিয়ে গেল সুরপতির কাছাকাছি কিন্তু মিথ্যে হোলো তার এই আকুলতা। আয়োজন ব্যর্থ হোলো, জীবন-বৈরাগী ফিরে গেল আত্মবিস্মৃত হয়ে।

পায়ের শব্দে উৎকর্ণ হয়ে মায়ালতা তাকালো। গলায় গানের একটা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে সুরেশবাবু নীচের আপিস-ঘরে ঢুকলেন, কিন্তু নানা কাগজ

পত্রের জটলার মধ্যে মায়ালতাকে দেখেই তাঁর সুর শুকিয়ে গেল। তিনি হেসে বললেন, গুড বয়! —আজকে কাজের চাপ ছিল বুঝি খুব?

মায়ালতা বললে, না, এমনি বসেছিলুম।

সুরেশবাবু হেসে বললেন, পুরুষের মন কি আশাবাদী! ভাবছিলুম তুমি বুঝি বসেছিলে আমারই অপেক্ষায়। হাঃ হাঃ হাঃ।

বিরক্তি ফুটে উঠলো মায়ালতার কপালের রেখায়। কিন্তু সে ঈষৎ হেসে চুপ ক'রে গেল। সুচরিতার শেষ কথাগুলো মনে পড়ে' তার ভিতরে একটা গভীর ঘৃণা পাক খেয়ে বেড়াতে লাগল।

ধীরে সুস্থে ব'সে সুরেশবাবু কথা আরম্ভ করলেন। আদালতে আজ কাজ ছিল না, সমস্ত দিনটা ব'সে বসেই কাটল, একটা মক্কেল নেই। দু'চারটে মামলা, সব পূজোর পর তারিখ ফেলা! একটা মেয়ে-চুরির কেস হাতে এসেছিল, কিন্তু দেখা গেল, মিটমাট ক'রে নিলে। চুলোয় যাক্‌গে, চলে এলুম আজ বেলা তিনটের সময়ে—ব'লে তিনি একবারটি থামলেন।

মায়ালতা একটা কাগজে কি যেন লিখছিল। সুরেশচন্দ্র পুনরায় বললেন, আজ তোমার চেহারাটা ভালো নেই, মায়া।

মুখ তুলে মায়ালতা বললে, তাই মনে হচ্ছে আপনার?

অধিকার দিলে না কথা বলবার, তা হ'লে করা যেতো বাসি ফুলের বর্ণনা। কাল রাত্রে ঘুমোওনি, চোখের কোলে ক্লান্তির কালো ছায়া; দুর্ভাবনায় মুখ মলিন, কপালে পড়েছে দাগ; উপবাস ক'রে আছ, তাই হাসিতে প্রাণ নেই! মনের মধ্যে চাপা অতৃপ্তি, তাই শোবার ঘর ভাল লাগে নি, ব'সে আছ বাইরের ঘরে।

মায়ালতা বললে, উপন্যাস লেখায় হাত পাকালে আপনার খ্যাতি হোতো, সুরেশবাবু। নারী-চরিত্রে আপনার দখল আছে।

মিথ্যাস্তুতিকে সুরেশবাবু সত্য ব'লে মেনে নিলেন। বললেন, তা' আছে, তোমাদের রক্তের সঙ্গে আমার পরিচয়। স্ত্রীজাতিকে আমি সহানুভূতির

সঙ্গে বিচার করেছি; দেখেছি তাদের আত্মাকে। কট্-কুয়েন্ ব'লে অপবাদও নিয়েছি মাথায় তুলে।

মায়ালতা বললে, অপবাদ নয়, সত্যি। মেয়েদের কাজ নিয়ে আপনি নিজেকে অতি ব্যস্ত রাখেন।—কণ্ঠের বিদ্রূপকে সে আর সংযত রাখতে পারলে না।

তা হবে। ব'সে সুরেশবাবু কিয়ৎক্ষণ বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে ব'সে রইলেন।

বসে রইলেন বটে কিন্তু অযথা কালক্ষেপ করবার মানুষ তিনি নন্। ঘরে তখনো দিনের আলো থাকা সত্বেও তিনি উঠে সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে দিলেন। ঘরটা হেসে উঠলো। বললেন, রাস্তার দিক্কার জান্লাটা বন্ধ করে দেবো?

কেন?—মায়ালতা তাকালো তাঁর দিকে।

এমনি বল্ছি। লোক চলাচল করছে, হয়ত অসুবিধে হচ্ছে তোমার।

অসুবিধে কিচ্ছু নেই, আমি ঘরের বউ নয়।

সুরেশবাবু তার কণ্ঠের উত্তাপটাকে হাসি দিয়ে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। বললেন, এইবার নিয়ে অনেকবার শুনলুম তোমার মুখে ওই কথাটা। ঘরের বউ হওয়াটা যেন তোমার কাছে ভয়ানক অপরাধ। কিন্তু জানো মায়া, নারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় হোলো—

আপনি অন্য কথা বলুন, সুরেশবাবু।

সুরেশবাবু আহত হয়ে চুপ করলেন। এক সময় বললেন, যাকগে। ভালো কথা, কাল আমার চিঠি পেয়েছিলে?

মায়ালতা বললে, পেয়েছিলুম, কিন্তু তাড়াতাড়ি আমার মাইনে বাড়াবার দরকার ছিল না। যা টাকা পাই, তা'তে আমার এক রকম চলেই যায়। খরচ আমার সামান্যই।

সে কি, টাকার দরকার নেই? জীবনের উন্নতি, ঐশ্বর্য্য, প্রতিষ্ঠা—

মায়ালতা হাসলে। বললে, আমি মেয়েমানুষ, ওগুলোর চেয়ে বড় প্রলোভনও আমার থাকতে পারে।

ব্যগ্র হয়ে সুরেশবাবু বললেন, সেটা কি আমি জানতে পারিনে? ওঃ বুঝেছি—ব'লে হেসে তিনি একটা স্বস্তির নিশ্বাশ ফেললেন, পুনরায় বললেন, এবার বুঝতে পেরেছি তোমার মন খারাপের কারণটা—

হাসতে হাসতে তিনি উঠে একবার পায়চারি ক'রে নিলেন। সে-হাসির মধ্যে গভীর ঈর্ষ্যা মিশ্রিত ছিল, তাই নিজের হাসিতেই তাঁর নিজের মুখখানা জ্বালা ক'রে উঠলো।

তাঁর এই থিয়েটারি ভঙ্গি দেখে মায়ালতা সোজা হয়ে বসলো। বললে, কী বুঝেছেন সুরেশবাবু?

প্রশ্ন শুনে পুনরায় বিদীর্ণ হাসিতে সুরেশবাবু ঘরখানাকে ভরিয়ে তুললেন। হাসি থামলে বললেন, বৈষ্ণব সাহিত্যে একটা গান আছে, 'ধৈরয নাহি মানে গো, কৃষ্ণ বিনে জীবন আমার বিফলে গেল, আর যে ধৈরয ধরিতে নারি।'

এটা বৈষ্ণব সাহিত্যের আখড়া নয়, আপনি যান্।—ব'লে উঠে মায়ালতা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

সুরেশবাবু এইবার প্রকৃতিস্থ হলেন।

উপরে গিয়ে মায়ালতা বিছানায় গা এলিয়ে শুয়ে পড়ল। চোখ ভ'রে তার কান্না এলো, বুক ভ'রে ব্যথায় টন টন করতে লাগল; আর সে পারে না কদর্য্য আবেষ্টনকে সহ্য করতে, ধৈর্য্যচ্যুতি ঘট্‌তে আর দেরি নেই। বালিশের মধ্যে মুখ থুবড়ে সে কাঁদতে লাগল। ভালবাসায় এত দুঃখ সে জান্‌ত না, একজনের অভাবে সমস্ত কিছুর প্রতি মন যে এত বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠবে, এ সে কল্পনাও করেনি।

অনেকক্ষণ পরে সে উঠ্‌লো। কখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, ক্ষেমীর মা আলো জ্বালিয়ে গেছে ঘরে। তার লজ্জা হোলো, সম্ভবত ক্ষেমীর মার কাছে

আর কিছু গোপন নেই। আজ সে ডাকতেও সাহস করেনি। কিন্তু আর দেরী করা চলে না। অমরেশ আজ আসেনি, তার একবার খবর নেওয়া দরকার। বেচারীর জ্বর ছাড়লো কিনা কে জানে!

কাপড় গুছিয়ে, পায়ে চটি জুতোটা দিয়ে সে বেরিয়ে এলো। ক্ষেমীর মা একটা সেলাই নিয়ে দালানে বসেছিল; মায়ালতা বললে, তুমি খেয়ে নিয়ো ক্ষেমীর মা যদি আমার আসতে দেরি হয়। দেরি অবশ্য আমার হবে না।

আচ্ছা দিদিমণি।

মায়ালতা নীচে নেমে গেল। নীচেটা অন্ধকার; অপিসঘরের ভিতর দিয়ে যাবার আগে আলোটা সে একবার জ্বাললে। কিন্তু জ্বেলেই সে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। অন্ধকারে সেই তখন থেকে ব'সে আছেন সুরেশবাবু।

একি, আপনি যাননি চ'লে?

না, বসে আছি তোমার কাছে ক্ষমা চাইব ব'লে।—সুরেশচন্দ্র অনুতপ্ত কণ্ঠে বললেন, মেয়েদের সঙ্গে আলাপে সব সময়ে আমার মাত্রাজ্ঞান থাকে না, সে জন্য আমি লজ্জিত। আমি তোমাকে কখনো আঘাত দিতে চাইনি মায়ালতা, বরং তুমি সকল রকমে স্বস্তিতে থাকতে পাও আমি তারই চেষ্টা করি।

মায়ালতা চুপ ক'রে দাঁড়ালো।

সম্ভবত আমার ক্ষুদ্রতাটাই তোমার চোখে পড়ে। কি করব, নিজের চরিত্রকে আমি বদ্‌লাতে পারিনি। বড় হতে যাই, কিন্তু বংশগত শিক্ষার দোষটা ছোট হওয়ার দিকে টেনে আনে।—অলক্ষ্যে সুরেশবাবু তার মুখের চেহারাটা একবার দেখে নিলেন এবং তারপর নিজের কণ্ঠে প্রচুর আন্তরিকতা ঢেলে দিয়ে বললেন, তোমার কাছেই আমি পদে পদে হার মানি, তোমার কাছেই হয় আমার উদারতার পরীক্ষা। তোমাকে এই জন্যে আমার দরকার যে, তুমিই আমার চরিত্রের মালিন্যকে নির্ম্মল ক'রে দিতে পারো। তোমার কাছে হার মানতেই আমার আনন্দ।

মায়ালতা আস্তে আস্তে বললে, আমি এখন একটু বাইরে যাবো।

বাইরে যাবে? চলো না পৌঁছে দিই তোমাকে? সন্ধ্যার দিকে খোলায় হাওয়ায় বেরোলে শরীর ভালোই হবে। তোমার প্রকৃত শুভার্থী ব'লে' আমি গর্ব্ব করব না, কিন্তু যারা তোমার কোনো ভাল মন্দরই খবর নেয় না, তারাও তোমার কেউ নয় মায়ালতা।

এর মানে মায়ালতা বুঝতে পারলে না, কেবল সে একবার মুখ তুলে তাকালো। সুরেশবাবু বললেন, বন্ধু বান্ধবের নিন্দা করা আমার পেশা নয়, ওটা আমি ঘৃণা করি। কিন্তু ধরো, আমি বলছিলুম সুরপতিবাবুর কথা। চ'লে যাবার সময় তোমার নাম একবার মুখেও আনলেন না, এটাই কি তাঁর উদারতার পরিচয়?

মায়ালতা থমকে দাঁড়ালো। বললে, তিনি চ'লে গেছেন, আপনি জানলেন কেমন ক'রে?

সুরেশবাবু হাসলেন। বললেন, বলতে গেলে নিজের মহত্ত্বটা প্রকাশ হয়ে পড়বে, কিন্তু পরের কাজও আমি কিছু কিছু ক'রে থাকি। জানতুম সুরপতিবাবু বেকার, তাই বিদেশে সেদিন একটা কাজের খোঁজ পেয়ে—

বিদেশে, কোথায়?—একটা চাপা আর্ত্তনাদ মায়ালতার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল,—কোথায় পাঠিয়েছেন তাঁকে?

সুরেশবাবু তার ব্যাকুলতাটা লক্ষ্য করেও সহজ কণ্ঠে বললেন, কাজটা মন্দ নয়, একটা জমিদারীর সহকারী ম্যানেজারের কাজ, ভবিষ্যতে উন্নতির আশা আছে। কাঁচা পয়সা হাতে আসবে, যদি বিশ্বাসের সঙ্গে কাজ ক'রে যান্—

কোথায় বলুন না আপনি, কোন্ দেশে?—অধীর কণ্ঠে মায়ালতা প্রশ্ন করলে।

কী যেন জায়গাটার নাম, ঠিক মনে আসছে না; জল-হাওয়া বেশ ভালো। ধরো, তাঁর বেশ সুবিধেই হয়ে গেল। নিজে তিনি যখন জমিদারী ফাঁদবেন, তখন কি আর আমাদের তিনি মনে রাখবেন? জমিদার আমারই এক মক্কেলের আত্মীয়।—ব'লেই সুরেশবাবু একবার হাসলেন—তোমার প্রশ্নটি ভালো।

আর দেশে! এই ভারতবর্ষেরই মধ্যে, এমন কি এই বাংলা দেশেই। কী যেন নামটা, মনে আসছে না। নোট-বইটা সকাল থেকে খুঁজে পাচ্ছি না, সম্ভবত তাইতে টুকে রেখেছি।

মায়ালতা একখানা চেয়ারে অবসন্ন হয়ে ব'সে পড়লো। বোঝা গেল না, কোন্‌টা তার ভিতরে বড় হয়ে উঠেছে; আনন্দ না বেদনা—কিন্তু তার চোখে ভাষা ছিল না, কানের মধ্যে তার আর কোন শব্দ পৌঁছচ্চে না। অভিভূতের মতো ব'সে রইলো। চেতনা তার লুপ্ত হয়ে গেছে।

সুরেশবাবু তাকে লক্ষ্য করছিলেন। এবার বললেন, যাবার সময়ে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেও তিনি ভুলে গেলেন, এটা তাঁর উচিত হয়নি। এই কি মানুষের পরিচয়? আমি ত জানি তাঁর দুর্দ্দিনে তুমি যথেষ্ট দেখেছ। তাই, আজকে তিনি যখন তাচ্ছিল্য ক'রে চলেই গেলেন, আর উচিত হবে না তাঁর জন্য উদ্বিগ্ন হওয়া। মেয়েদের অপমান করাই পুরুষদের স্বভাব-ধর্ম্ম। আর এ অপমান মাথায় তুলে নেওয়া মানে আত্মসম্মানকে ভাসিয়ে দেওয়া।

মায়ালতা বললে, তাঁকে চাক্‌রী দিতে হঠাৎ ব্যস্ত হতে গেলেন কেন?

সুরেশবাবু হেসে বললেন, চিরকাল, আমার এই বদ্ স্বভাব। ওটা আমি পারি নে। পুরুষ মানুষ হয়ে কেউ আমার চোখের ওপর নিষ্কর্ম্মা হয়ে বসে থাকবে, এ আমার সহ্য হয় না। এই অমরেশটার জন্যেও ভাবছি, ওর যদি একটা সুবিধে ক'রে দিতে পারি···এরা ছুটে যাক্ দিক্‌বিদিকে, ভোগ করুক পৃথিবীকে বীরের মতো, লুটে নিয়ে আসুক জগতের ধন-সম্ভার,—জ্ঞানে, শক্তিতে, ঐশ্বর্য্যে আমার এই আঁচল ধরা হতভাগ্য জাতকে বীর্য্যবান্ ক'রে তুলুক। মায়ালতা, তুমি আমার স্বপ্নের চেহারাটা জানো না, আমার বুকের মধ্যে অনির্ব্বাণ অতৃপ্তি আর দুরাশার জ্বালা জ্বলছে—

মায়ালতার সুন্দর নধর হাতখানা টেবলের উপর প্রসারিত, মাথার চুলের একটা গোছা নেমে এসেছে আয়ত দুটি চোখের উপর; কাঁধের একদিক্‌কার

আঁচলটা পড়েছে খ'সে,—তার দেহের অপরিমেয় তারুণ্য বিদ্যুতের আলোয় উদ্ভাসিত। সেই দিকে উজ্জ্বল লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে স্থরেশবাবু বলতে লাগলেন, প্রেতের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি সমাজের দরজায় দরজায়। কোথায় প্রাণ, কোথায় মানুষ, কোথায় শক্তি? কে মুছে দেবে এই অধঃপতনের লজ্জা, কে আনবে দেশব্যাপী সংগ্রাম, কে জ্বালিয়ে তুলবে সমাজ বিপ্লবের অগ্নিকাণ্ড? মায়ালতা, আমার আজীবন তপস্যা, এই সব ছেলে-মেয়ের মনে অশান্তি আর বেদনা জাগিয়ে তোলা, এই বেদনার মধ্যে এক নতুন জাতির জন্ম হোক; দাসত্ব আর দুর্ভাগ্য ঘুচিয়ে আবার আমাদের সেই গৌরবময় মহা অতীতকে ফিরিয়ে আনুক, প্রাণ শক্তি বিকীর্ণ ক'রে দিক্ দিকে দিকে—

মায়ালতার সুন্দর দু'খানি পায়ের দিকে উৎসুক মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে স্থরেশ বলতে লাগলেন, প্রেম আর হৃদয়-দৌর্ব্বল্য স্থগিত থাকুক,—মায়ালতা, তোমাকে মিনতি করছি, তুমি এ কাজের ভার নাও। চারিদিকে আমাদের অপমান আর দুর্নাম স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে, এসো, আমরা সবাই মিলে তার সমাধান করি। দুর্নীতি আর কুনীতিকে আমরা তাড়াবো; শুচিবায়ুগ্রস্ত সমাজপতির অতি-নীতিজ্ঞানকে আমরা শাসন করবো; কামাতুর যৌন-সাহিত্যকে দেশ থেকে দেবো নির্ব্বাসন; সমাজে, জীবনে, চিন্তাধারায় সৌখীন পাশ্চাত্য আদর্শকে ধ্বংস করবো,—এসো আমরা কাজে নামি। কী দুর্দ্দিন এলো বলো ত? একেই ত ভগ্নস্বাস্থ্য, অশিক্ষিত, দরিদ্র দেশ, তার ওপর এই ভয়ানক নৈতিক অবনতি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে দ্যাখো, সেখানে সহশিক্ষার নামে তৈরী হয়েছে প্রজাপতি-সঙ্ঘ, সাহিত্যের নামে চলছে কামকলা-প্রচার, সমাজে চলছে নারীহরণ আর বিবাহ-বিচ্ছেদ, রাষ্ট্রে চলছে দেশনেতাদের গোপন ব্যভিচার আর স্বার্থের হানাহানি, রঙ্গমঞ্চে ভদ্রঘরের মেয়েদের অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় পা তুলে নাচা এবং তাই দিয়ে অর্থোপার্জ্জন, নারী-আন্দোলনের নামে চ'লে যাচ্ছে চুপি চুপি অসতীপনা—

মায়ালতা এবার উঠে দাঁড়ালো। বললে, রাত হয়ে যাচ্ছে, আজকে আর—

হ্যাঁ, এই আমিও উঠি। বড় একটা নিশ্বাস ফেলে সুরেশবাবু বললেন, ওঃ অনেক বকলাম। বাস্তবিক এই শাড়ীখানা পরলে তোমাকে প্রতিমার মতো দেখতে হয়। হ্যাঁ, তুমি বেড়াতে যাবে বললে যে? হাওয়ায় তোমার রুক্ষ চুলগুলো উড়ছে, আজকে স্নান করোনি? যাক্ খুব বক্তৃতা দেওয়া গেল,— যাবে নাকি বেড়াতে?

না, আজকে আর নয়।

আচ্ছা আচ্ছা থাক্, রাতও হয়েছে। এখানে এসে বসলে ফিরে যেতে আর মন সরে না, কত অপরাধ করে ফেলি,—আমার সম্বন্ধে তোমার ধৈর্য্য আর বিবেচনা অসীম।

মায়ালতা বললে, ঠিকানা তা'হলে আপনার মনে নেই কেমন?

কা'র ঠিকানা?—সুরেশবাবু আকাশ থেকে পড়লেন, বললেন, ওঃ তুমি এখনো ভোলোনি দেখছি। কি জানি, নোটবুকখানা···দেখি যদি মনে করতে পারি···নানা কাজ নিয়ে ব্যস্ত—

কাল আপনার সঙ্গে কোথায় দেখা হবে? যদি ঠিকানাটা খুঁজে পান, তাহ'লে—

অত্যন্ত উদাসীন কণ্ঠে সুরেশবাবু বললেন, দেখি যদি পাই, সময় আজকাল বড় কম, পূজো এসে পড়েছে—

মায়ালতা সাগ্রহকণ্ঠে ব্যাকুল হয়ে বললে, একটু দয়া ক'রে খুঁজবেন আপনি, তা হ'লেই—

আপন মনের অসংযত দাহকে অতর্কিতে প্রকাশ ক'রে ফেলে সুরেশবাবু অপরিসীম ক্ষোভ নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আলোটা নিবিয়ে দরজাটা বন্ধ ক'রে মায়ালতাকে ভিতরে আসতে হোলো। এত-রাতে আর পথে বেরুনো চল্‌ল না। কিন্তু নীচের বারান্দা পার হতে গিয়ে অন্ধকারে হাসির শব্দ ক'রে কে যেন চক্ষের নিমেষে হাত চেপে ধরল।

চমকে উঠে মায়ালতা বললে, ওমা, কী দুষ্টু তুমি অমরেশ, ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম। কখন্ এলে ?

অমরেশ হেসে বললে, অনেকক্ষণ। তোমাদের আলাপ-আলোচনাদি কান পেতে শুনলুম। উত্তমরূপে চিনলুম আজ সুরেশদাকে। তোমার হৃদয় জয় করবার জন্য দাদার কী ব্যাকুলতা! বাস্তবিক, তোমার মায়াদয়া এতটুকু নেই, মায়াদি!

মায়ালতা অমরেশের কান ম'লে দিল। বললে, ফাজলামি করো না, ওপরে এসো। খবর শুন্‌লে ত সুরপতিবাবুর ?

আনুপূর্ব্বিক শুনলাম। পথের কাঁটা সরিয়েছেন আপন স্বার্থের জন্য। তা সরাবেন না, বলো কি? পঞ্চাশ বছর বয়সেও হেলেন্ ছিলেন সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা, তবুও তাঁকে জয় করার জন্য তখন বাধলো ট্রয়ের যুদ্ধ। আর তোমার জন্যে—

— অমরেশ ?

আচ্ছা মায়াদি, জিহ্বা সংযত করলুম। শোনো, রাত হয়েছে, আজ আর ওপরে উঠ্‌বো না। খিড়কি দিয়ে এসেছিলুম, এবার যাবো সদর দরজা দিয়ে। দুদিনের মধ্যেই সুরপতিবাবুর সন্ধান আন্‌বো।—উৎসাহে অমরেশের চেহারা বদলে গেছে।

কেমন্ ক'রে ?—মায়ালতা বললে।

কী আশ্চর্য্য !—বুঝলে না যে, খবরের কাগজে 'কর্ম্মখালির' বিজ্ঞাপন প'ড়ে সুরেশদা কাজের খোঁজ পেয়েছিলেন ? তাই দেখে উনি পাঠিয়েছেন সুরপতিবাবুকে, আমিও যেন সে বিজ্ঞাপনটা দেখেছিলুম মনে হচ্ছে; কালকেই গিয়ে আমি কোনো একটা লাইব্রেরী তোলপাড় করব।

তার আন্তরিকতা, তার আগ্রহ, তার অকৃত্রিম বন্ধুটিকে অনুভব ক'রে মায়ালতা সাশ্রু চোখে বল্‌লে, আন্‌তে পারবে ত ?

হেসে অমরেশ বললে, যদি পারি কী দেবে বলো ত ?

দুই হাতে সস্নেহে তার মুখখানা চেপে ধ'রে মায়ালতা বললে, ভাই নয়, তুমি আমার বন্ধু। যা চাইবে তাই দেবো, বন্ধু।

তাই দেবে? যদি আমার কালকের প্রতিজ্ঞা ভাঙে?

মায়ালতা তার কণ্ঠালিঙ্গন ক'রে বললে, যাতে না ভাঙে তার শক্তি দেবো।

যদি দুর্ব্বলতা আসে?

তুমি দুর্ব্বল পুরুষ নয়। শিল্পি, রং আর তুলি এনো, এই দেহটা তোমার জিম্মায় ছেড়ে দেবো, চোখ মেলে দেখো, সাধ মিটিয়ে ছবি এঁকে নিয়ো।

শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।—ব'লে অমরেশ মায়ালতার দুই হাতে ঝাঁকানি দিয়ে হেসে অন্ধকারে বেরিয়ে গেল।

ছয়

সেদিন সকাল থেকেই মায়ালতা ব্যস্ত। কোথায় সে গিয়েছিল, এই কিছুক্ষণ আগে ফিরে এসেছে। আজ তার হাসি-হাসি মুখ, চোখে ও ভ্রূরেখায় উৎসাহ আর খুশির আভাস। প্রতি দিনের অভ্যস্ত জীবনযাত্রাকে দুই হাতে ঠেলে দিয়ে সে যেন আজ নতুন ক'রে জেগে উঠেছে। আজকে নেই আর কোনো বাঁধাবাঁধি।

ক্ষেমীর মার নিবিষ্ট লক্ষ্যটি ছিল তার দিকে। স্ত্রীলোক হয়ে সে জন্মগ্রহণ করেছে, সুতরাং কৌতূহলটা তার রক্তগত। এক সময়ে হাসিমুখে কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললে, আজ বুঝি চড়িভাতি করতে যাবে কোথাও দিদিমণি?

মায়ালতা বললে, হ্যাঁ গো ক্ষেমীর মা, তোমার কথাই সত্যি! কী ঘটা আজ চড়িভাতির; প্রকাণ্ড একখানা নৌকো ভাড়া করা হয়েছে, গানবাজনা, নাচ-পাঁচালি, সে এক মহাস্ফূর্তির কাণ্ড!

ক্ষেমীর মা বললে, কে কে যাবে?

কে আর যাবে বলো, মেয়েদের মধ্যে কেবল আমি। ছেলেরা যাবে একদল, তারা সব তরুণ—আমি তাদের মক্ষিরাণী!

সুরেশবাবু যাবেন না?

না ক্ষেমীর মা, ওঁর একটু বয়স হয়ে গেছে, পঁচিশ বছরের বেশি হ'লে আমি সে-ছেলেকে পছন্দ করিনে।—ব'লে মায়ালতা হাসতে লাগল।

ক্ষেমীর মা কিছুক্ষণ অবাক্ হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর হঠাৎ বললে, এসব তোমার মিছে কথা দিদিমণি।

কেন?

তুমি কেউটের বাচ্ছা, জাত সাপ। এমন কাজ যে সব মেয়ে করে আমি তাদের জানি, তুমি সে দলের নয়।—নিজের কথায় ক্ষেমীর মা নিজেই

ভরসা পেয়ে গেল, পুনরায় বললে, তুমি যাবে স্ফূর্তি করতে ছেলেদের সঙ্গে? অনেক ভদ্দরলোকের মেয়ে এমন কাজ করে জানি, কিন্তু তুমি তেমন ছোট হ'য়ে জন্মাওনি। তুমি জাতের কাঠ দিদিমণি।

তবে কোথায় যাচ্ছি বলো ত ক্ষেমীর মা?

তা জানিনে বাছা। যেথানেই যাও, শরীর ভালো রেখো; আমি তোমার বয়সে বড়, আমি এ কথা বলতে পারি।

ক্ষেমীর মার হাতে ধ'রে হেসে মায়ালতা বললে, তোমার এই কথার মধ্যে আর কোনো ইঙ্গিত নেই ত ক্ষেমীর মা?

ক্ষেমীর মা বললে, যদি থাকে মাপ ক'রো। মেয়েমানুষ হয়ে মেয়েমানুষকে এ কথা না ব'লে পারিনে দিদিমণি। তুমি এক্‌লা, তোমাকে কেউ দেখবার নেই।

এত লোক থাকতে আমি একলা, কি বল্‌ছ ক্ষেমীর মা?

ক্ষেমীর মা মুখের একটা শব্দ ক'রে বললে, দিদিমণি, ওরা সব মৌশুমী ফুল! —এই ব'লে সে চ'লে গেল। সে যেন আপন হৃদয়ের একটি অতীত বেদনার কথা জানিয়ে দিল।

রান্নাঘরের কাছে গিয়ে মায়ালতা দাঁড়াল। বললে, ক্ষেমীর মা, যদি ফিরতে আমার কিছুদিন দেরি হয়?

মুখ তুলে ক্ষেমীর মা বললে, ইস্কুল খোলবার পরেও দেরি হবে?

তা হ'তে পারে। ধরো, আমি বিদেশ যাচ্ছি ত!

অপেক্ষায় থাকবো দিদিমণি। তবে একলা বাড়ী কিনা—

মায়ালতা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর বললে, আর যদি ফিরে না আসি?

ওমা, সে কি কথা গো! ফিরে না এলে ইস্কুল যে গোল্লায় যাবে।—ব'লে ক্ষেমীর মা চোখ কপালে তুললে।

মায়ালতা বললে, কারো জন্য কি কিছু আটকায় ক্ষেমীর মা? রাজা গেলে রাজ্য যায় না, আবার নতুন রাজা হয়। সবাই তোমরা রইলে।

ক্ষেমীর মা নিশ্বাস ফেলে নীরবে রইল কিন্তু এক সময় করুণ কণ্ঠে বললে, তুমি গেলে আমিও থাকবো না দিদিমণি, দেশে চ'লে যাবো। মেয়েটার বিয়ে দিয়ে, যেমন করেই হোক একটা পেট চ'লেই যাবে।

এমন সময়ে বাইরে থেকে ডাক এলো। মায়ালতা গলার সাড়া দিয়ে বললে, ভেতরে এসো।

একটি লোক উপরে উঠে এলো। মায়ালতা পুনরায় বললে, শ্রীধর, বাবু কি এখুনি জিনিষপত্র নিয়ে যেতে বলেছেন?

হ্যাঁ মা। ব'লে শ্রীধর তার হাতে একখানা চিঠি দিলে। চিঠিখানা অমরেশের।

চিঠি পড়ে মায়ালতা বললে, এসো, আমি সব গুছিয়ে দিচ্ছি।

জিনিসপত্র কিছু কিছু বাঁধাছাঁদা ছিল। শ্রীধর সেগুলি একত্র ক'রে নিলে। বিছানা, বাক্স, একটা স্যুট্‌কেশ—এ ছাড়া আর কিছু নয়। মানুষের গতিশীলতা বন্ধ হলেই তার চারিদিকে জঞ্জাল জমে। নিষ্প্রয়োজনীয় যা কিছু আসবাবপত্র ঘরের চারিদিকে ছড়ানো রইল—মায়ালতা তাঁদের দিকে ফিরেও তাকালো না। তিনটি লগেজ মাথায় তুলে নিয়ে শ্রীধর চ'লে গেল। আগে থেকেই ব্যবস্থা হয়ে আছে, সুতরাং নতুন ক'রে তাকে নির্দ্দেশ দেবার আর কিছু নেই।

ক্ষেমীর মা বললে, কিছু মনে করো না দিদিমণি, আমার একটু সন্দ হচ্ছে। বল্‌ব?

মায়ালতা হেসে বললে, ব'লে ফেল ক্ষেমীর মা, দেরি করো না। সত্যি কথা বল্‌তে কি, আমারো একটা সন্দ হচ্ছে।

কি সন্দ দিদিমণি?

আগে তুমি বলো।

আমি ভাবছিলুম তুমি বুঝি আর আসবে না।

আশ্চর্য্য!—মায়ালতা বললে, ঠিক ধরেছ ক্ষেমীর মা, আমিও ভাবছিলুম,

আর বুঝি ফিরতে পারব না। অনেক দিনের সাজানো ঘর, ছাড়তে গেলে বুকে ব্যথা লাগে, এমনি করেই যেন সব ফেলে যেতে হয়।

আর কি তুমি কোথাও কাজ পাবে দিদিমণি ?

না ক্ষেমীর মা, এ কাজ আমার ভালোই ছিল, এ বাজারে এমন কাজ পাওয়াই কঠিন, এ আমি জানি।

তবুও যাচ্ছ দিদিমণি ? কেন ?

বারান্দার বাইরে দূরের দিকে চেয়ে মায়ালতা হাসতে লাগল।—মন ছুটেছে ক্ষেমীর মা, ধ'রে রাখতে পারব না নিজেকে। আশায় মন ভরা। ভেলা ভাসিয়ে দিলুম, দেখি কি হয় !

তার কথার অর্থ অস্পষ্ট, ক্ষেমীর মা নীরবে নিজের কাজ করতে লাগল। তবু মায়ালতার শেষ কথাটার সুরে গোপনে তার একটা নিশ্বাস পড়ল। করুণকণ্ঠে বললে, তোমার মতন মনীব আর পাবো না দিদিমণি।

এমন সময় নীচে সুরেশবাবুর আওয়াজ পাওয়া গেল। মায়ালতা সাড়া দিয়ে বললে, ওপরে আসুন।

ওপরে যাবার হুকুম নেই যে !—আওয়াজ এলো।

এত বাধ্য আপনি কবে থেকে ? ওপরে আসুন, অনুমতি দিচ্ছি।

জুতোর শব্দ করতে করতে সুরেশবাবু উপরে উঠে এলেন। মায়ালতা বললে, ক্ষেমীর মা, মাদুরটা ঘরে পেতে দাও ত।

ক্ষেমীর মা তাড়াতাড়ি মাদুর পেতে দিয়ে এলো। সুরেশবাবু বললেন, কোর্টে যাবার পথে আসা গেল। আজ আমার ভাগ্যি ভালো। দে[illegible] স্মরণ করেছেন ! কিন্তু যে কথাই হোক, আজ দেবীর কাছ থেকে একটি বর প্রার্থনা করব।

হেসে মায়ালতা বললে, কী বর চান্ বলুন না ?

ঘরের ভিতরে এসে সুরেশবাবু বললেন, আমি তব মালঞ্চের হবো মালাকর !—একি, জিনিসপত্র গেল কোথা ? ঘর খালি কেন ?

মায়ালতা তাঁর দিকে চেয়ে তেমনি হাসিমুখেই বললে, আপনার এখানে আমার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকলে তেমন বর অবশ্যই আপনি পেতেন।

সুরেশবাবুর কানে সে-কথা ঢুক্‌ল না, তাঁর মুখের চেহারা অন্যরকম হয়ে গেল; তিনি বললেন, যাবার আয়োজনটা হচ্ছে কোথা?

মুখের একটা শব্দ ক'রে মায়ালতা কপট নিশ্বাস ফেলে বললে, বৈষ্ণব কবিতা আমার মুখস্থ নেই আপনার মতন, তবে একছত্র সেদিন গ্রামোফোনে শুনেছি—'যোগিনী হইয়ে যাবো সেই দেশে যেথায় নিঠুর হরি।'

হেঁয়ালী আমি বুঝতে পারিনে মায়ালতা!

পারেন না? আশ্চর্য্য! সারাজীবন আপনি লোক-সমাজে মুখোস প'রে ঘুরলেন, আপনি বোঝেন না হেঁয়ালী! কী সরল আপনি!—মায়ালতা হেসে উঠ্‌ল।

বিদ্রূপ শোনবার সময় সুরেশবাবুর নেই, তাঁর অনেক কাজ। বললেন, তুমি যেখানে যাচ্ছ, আমি কি সেখানে নিয়ে যেতে পারতুম না?

মায়ালতা বললে, আপনার সঙ্গে কি যাওয়া আমার পক্ষে সঙ্গত হোতো? বড় বড় দার্শনিক তত্ত্ব আপনি বলেন, কিন্তু সামান্য বুদ্ধির পরিচয় আপনার কথায় থাকে না।

মুখের একটা শব্দ ক'রে সুরেশবাবু বললেন, আমি অতি বোকা! কিন্তু কোথায় যাচ্ছ, আমাকে তুমি বলবে না?

বলবার দরকার ত নেই!—মায়ালতা বললে।

দরকার নেই?—সুরেশবাবু উত্তপ্ত কণ্ঠে বললেন, স্কুলের সেক্রেটারী জানবে না কে, প্রধান শিক্ষয়িত্রী কোথায় যাবেন? মায়ালতা, তুমি আমাকে বিদ্রূপ করতে পারো, কিন্তু একটা আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মূল নীতিকে আঘাত করতে পারো না! আজকে যে মেয়ের দল স্বেচ্ছাচারকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নাম দিয়ে ছুটোছুটি করে, মায়ালতা, আমি মনে করি, তুমি তাদের দলে নও!

মায়ালতা বললে, স্কুলের ছুটির মধ্যে কি আমার স্বাধীনতা নেই ?

নিশ্চয়ই আছে। স্বাধীনতা তোমার জন্মগত অধিকার। কিন্তু তার শ্রীকে কি তুমি মানবে না? বিনা নোটিশে পালিয়ে যাওয়াটাকেই কি তুমি অবাধ স্বাধীনতা বলো? নিজের স্বার্থ আর প্রবৃত্তির রাশ আল্‌গা ক'রে ছোটাকে বল্‌বে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ? সংসারে কি আর কিছু নেই ?

মায়ালতা বললে, স্নুরেশবাবু, নীতিকথা বলবারও অধিকারী-ভেদ আছে ! আপনার এই বক্তৃতা আমার পাঁচ বছর আগে ভালো লাগত।

তারপর দুইজনেই কিয়ৎক্ষণ নীরবে রইল। খালি ঘরখানায় স্নুরেশবাবু এধার থেকে ওধারে বারকয়েক পায়চারি ক'রে নিলেন। পরে বললেন, ছুটির যখন শেষ হয়ে এলো, তখন তুমি চল্‌লে বেড়াতে ! তুমি ফিরবে কবে, একথা বলবারও কি আমার অধিকার নেই ?

ফিরব কবে, এই দিনস্থির ক'রে আমি যাচ্ছি নে।

মানে ?—স্নুরেশবাবু থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, তুমি না থাকলে স্কুল খুল্‌বে কে ?

মায়ালতা বললে, স্নুচরিতা খুল্‌বে, তাকে ব'লে গেলুম।

স্নুরেশবাবুর ভিতরে একটা জ্বালা ধরেছিল। বললেন, তাহলে তুমি এখন অনেকদিনের জন্যেই চল্লে, কেমন ? কার সঙ্গে যাচ্ছ ?

মায়ালতা বললে, একলাই যাবো।

কিন্তু মেয়েছেলে হয়ে একলা বিদেশে যাওয়াটা—

একলা যাওয়াই আমার অভ্যেস, আমি পথের মেয়ে। এতদিন আমার জন্তে কেউ ভাববার ছিল না, আজও কেউ থাকে, আমি পছন্দ করি নে। আপনাকে খবর দিয়ে যাওয়া উচিত তাই আপনাকে ডাকতে পাঠিয়েছিলুম।

স্নুরেশবাবু বল্‌লেন, একাজ কি তোমার পছন্দ নয় ?

এ প্রশ্ন বাহুল্য ! এখন এর জবাব দেওয়া কঠিন।

কিন্তু এ আমার জানা দরকার ! স্নুরেশবাবু উচ্চকণ্ঠে বললেন, এ স্কুলের

দায়িত্ব আমার হাতে—এর নীতি, এর শৃঙ্খলা, এর ভালোমন্দ। বিনানোটিশে তোমার চলে যাবার অধিকার নেই, তা তুমি জানো?

মায়ালতা বললে, যদি যাই, আপনি কি করতে পারেন?

যা সবাই করে, অর্থাৎ আদালতের শরণাপন্ন হওয়া। কিন্তু তা করতে চাই নে, কারণ সেটা তোমার সুনামের পক্ষে হানিকর।

আপনি যদি তাই করেন, তবে আমি বাধা দেবো না। যদি করেন অবিলম্বে করুন।—মায়ালতা ফিরে দাঁড়াল।

সুরেশবাবু বললেন, করলে তোমার পরে অবিচার হবে, কারণ আদালতে অনেক কথাই প্রকাশ হয়ে পড়বে, মনে রেখো।

এমন কী কথা আছে, যা প্রকাশ পেলে আমি ভয় পাবো?

এই ধরো গতিবিধি, এখানে ওখানে আসা-যাওয়া, অনেক রাতে বাড়ী ফেরা।

তার মানে?—মায়ালতা বললে।

তার মানে আদালত জানে, আমি জানি নে।

এমন সময় ক্ষেমীর মা ডাকল, তোমার খাবার দিয়েছি দিদিমণি।

যাই ক্ষেমীর মা। আচ্ছা নমস্কার,—আপনার সঙ্গে তা'হলে আবার আদালতেই দেখা হবে!—ব'লে মায়ালতা দ্রুতপদে রান্নাঘরের দিকে চ'লে গেল।

মিনিট পনেরো পরে ফিরে এসে দেখা গেল, জান্‌লার একটা গরাদ ধ'রে সুরেশবাবু দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মায়ালতা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললে, আমার গাড়ীর সময় হয়ে এলো, আপনি কি আর কিছু বলবেন?

সুরেশবাবুর মুখ চোখ রাঙা; হাতে একখানা রুমাল নিয়ে তিনি নাড়াচাড়া করছিলেন। মুখ তুলে কোমল কণ্ঠে বললেন, এর পরে আমার আর কি বলার থাক্‌তে পারে মায়ালতা?

মায়ালতা নতমস্তকে বললে, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।

তুমি কেন ক্ষমা চাইছ, অপরাধ ত আমারই। যাক্ সে কথা। আচ্ছা, তোমার সিদ্ধান্তটা কি কিছুতেই বদলানো যায় না মায়া?

মায়ালতার গলার আওয়াজটা এবার গেল বদ্‌লে। বললে, আপাতত আমি ছুটিতে যাচ্ছি।

সুরেশবাবু বললেন, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, তুমি আর ফিরবে না।

উত্তর না পেয়ে সুরেশবাবু ব্যগ্র ব্যাকুল চ'ক্ষে তার দিকে চেয়ে পুনরায় বললেন, বেশ ত, এ ছাড়াও ত সংসারে তুমি অনেক কাজ করতে পারো, যা তোমার ভাল লাগবে? দেশ ছেড়ে চ'লে না গেলে কি হয় না?

মায়ালতা অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইল মাথা হেঁট ক'রে। তারপর এক সময়ে বললে, আপাতত আমাকে যেতেই হবে। হয়ত শীঘ্র ফিরে আসব, তখন দেখা করব আপনার সঙ্গে।

কবে আস্‌বে?—অধীর কণ্ঠে সুরেশবাবু প্রশ্ন করলেন।

সে আপনাকে চিঠি দিয়ে জানাতে পারব। আচ্ছা, আমি যাই এবার। —ব'লে মায়ালতা কাপড় বদ্‌লাতে গেল পাশের ঘরে।

আদালতে কাজ রয়েছে অনেক; বেলাও প্রায় বারোটা বাজে,—তবু সুরেশবাবু নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন; রৌদ্রদীপ্ত আকাশের চেহারাটা যেন আজ অত্যন্ত রুক্ষ মনে হোলো,—যা তাঁর কোনো দিনই মনে হয় না—তাঁর চারিদিকে, তাঁর জীবনে যেন কেউ নেই, তিনি যেন নিতান্তই নিঃসম্বল। আজ পর্য্যন্ত এই মেয়েটির প্রতি তিনি যা প্রকাশ করেছেন সে-বস্তুর চেহারাটা অতিশয় মলিন, তা প্রেম নয়, স্নেহ বন্ধুত্ব নয়—তার নাম দৈন্য, আপন যৌন-প্রকৃতিতে জড়ানো কেমন একটা অদ্ভুত দারিদ্র্য। তাঁর চেহারায়, চরিত্রে, পোষাক-পরিচ্ছদে, তাঁর আচার-ব্যবহারে কেমন একটা নিখুঁৎ পালিশ, চোখ-ধাঁধাঁনো চাকচিক্য, অত্যন্ত নির্ভুলভাবে সভ্যসমাজে সুখ্যাতি পাবার যোগ্য—কিন্তু আজ দেখা গেল, সেই উচ্চশিক্ষার পালিশ আর নিখুঁৎ চাকচিক্যের আড়ালে স্ত্রীলোকের নিকটে আত্মসম্ভ্রম-ক্ষুণ্ণ-করা কদর্য্য ভিক্ষাবৃত্তি বারে বারে প্রকাশ পেয়েছে—এ ছাড়া আর কিছুই নয়।

অতীত জীবনের দিকে তিনি ফিরে দাঁড়ালেন। চেয়ে দেখলেন,

বাল্যকাল, স্কুল ও কলেজের পাঠ্যাবস্থা। শিক্ষা অর্জ্জন করেছেন, বিদ্যা অর্জ্জন করেন নি। যে-বিদ্যা চরিত্রকে মধুর করে, সুন্দর করে, সহজ করে; যে-বিদ্যায় চিত্তের উদার প্রসন্নতা মূর্ত্ত হয়, যে-বিদ্যায় রয়েছে স্বভাবের কল্যাণশ্রী—এ তিনি জানেন না। জীবন জোড়া আত্মপ্রবঞ্চনা—আবরণের পর আবরণ জড়িয়ে আপন স্বভাব-সত্যকে তিনি বীভৎস অন্ধকারের মধ্যে টুঁটি টিপে মেরেছেন, নিজের কাছেও তিনি বিশুদ্ধ নন্। সুলভ উপন্যাসের নায়কের মতো তিনি ঘটনার স্রোতে ভেসে চলেছেন, আপন কৃতকর্ম্মের বোঝা ও অভিজ্ঞতা নিয়ে তাঁর বিসদৃশ আত্মপ্রসাদ, নিজেকে জানেন নি, নিজেকে জানতে দেন নি।

সুরেশবাবু ঘরময় পায়চারি ক'রে বেড়াতে লাগলেন। এই মেয়েটিকে পাওয়া গেল না—এটা তাঁর বেদনা নয়, এই তাঁর চরম অধঃপতনের ইঙ্গিত। এ মেয়ে তাঁকে কেবল আঘাত করেই গেল না, এ কথা জানিয়ে গেল, ভালোবাসার পরম দুর্লভ ক্ষেত্রে তাঁর প্রবেশাধিকার নেই। তিনি পুরুষ, কিন্তু মানুষ নন্। প্রেমের জন্য যে আত্মশুদ্ধি, যে-সংস্কৃতি, যে-চরিত্র-মাধুর্য্যের প্রয়োজন, সে-বস্তু তাঁর মধ্যে নেই, তাঁর চরিত্রের ভিতরে বিষাক্ত গন্ধের আব্‌হাওয়া—দেবত্বের তপস্যা সেখানে চলে না। তিনি ভালোবাসতে চাননি, রূপকে আকর্ষণ করতে চেয়েছেন সম্ভোগের দিকে, সর্ব্বনাশের দিকে,—তাঁর সমস্ত চেষ্টা, যত্ন, পরিশ্রম স্ত্রীলোককে পাবার জন্য, প্রেমকে উপলব্ধি করবার জন্য নয়।

দরজার সুমুখ দিয়ে মায়ালতা পার হয়ে যাচ্ছিল, তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন। বললেন, গাড়ীর সময় কি এখনই ?

গলার আওয়াজ তাঁর ভাঙা। মায়ালতা পিছন ফিরে একবার ক্ষেমীর মা'র দিকে চেয়ে দেখলে, তারপর বললে, হ্যাঁ, যেতে যেতেই সময় হবে।

আমি যাব তোমার সঙ্গে ?

আপনার কাজ রয়েছে, আমি একাই যেতে পারব।

সুরেশবাবু বললেন, যদি ক্ষতি না মনে করো, তবে আমি ষ্টেশন পর্য্যন্ত যেতে পারি। যাবো?

মায়ালতা ইতস্তত ক'রে বললে, যেতে চান্ চলুন।

ক্ষেমীর মা নীচের দরজা পর্য্যন্ত এসে সাশ্রুনেত্রে তার দিদিমণিকে বিদায় দিল। দুই জনে নিঃশব্দে পথে নেমে চলতে লাগল। সঙ্গে আর কিছু জিনিস মায়ালতা নিল না।

কিছুক্ষণ চলবার পর এক সময়ে সুরেশবাবু বললেন, তুমি গিয়ে ঠিকানা পাঠালে তবে এ মাসের দরুণ টাকা তোমায় পাঠাতে পারব।

মায়ালতা বললে, আচ্ছা।

পথের খরচপত্র তোমার কুলিয়ে যাবে ত?

আপাতত চল্‌বে। মায়ালতা বললে।

এর পরে আর কথা খুঁজে পাওয়া যায় না। যদিই বা পাওয়া যায়, প্রকাশ করা কঠিন। এমন হয়। পথরোধী প্রাথরের পিছনে রয়েছে নির্ঝরের ধারা, কিন্তু গতির পথ বন্ধ। সুরেশবাবুর ভিতরে কে যেন সর্ব্বস্বান্তের মতো আর্ত্তনাদ করছিল। হঠাৎ এক সময়ে তিনি বললেন, একটা কথা কিন্তু কিছুতেই জানা গেল না, তুমি ফিরবে কি না।

এবারে তাঁর কণ্ঠে যেন শক্তি নেই, কেমন একটা করুণ অসহায়তা। মায়ালতাও একটু থমকে গেল। বললে, সে আপনাকে পরে জানাতে পারব!

আমি কি তোমার কোনো ক্ষতি করেছি?

মুখ ফিরিয়ে তাঁর দিকে চেয়ে মায়ালতা বললে, আমার ক্ষতি আপনারা কেউই করতে পারেন না, যদি না নিজে আমি ··· এই ট্যাক্‌সি, দাঁড়াও—

পথের মাঝখানে মোটর দাঁড়াল। মায়ালতা গিয়ে উঠ্‌ল, সুরেশবাবু তাঁকে অনুসরণ করলেন। ট্যাক্‌সি ছুট্‌ল হাওড়া ষ্টেশনের দিকে।

সুরেশবাবু আপন চিত্তচাঞ্চল্যে অধীর হয়ে উঠেছেন। পকেট থেকে নোট-বইখানা বা'র ক'রে বললেন, বুঝতে পেরেছি কোথায় তুমি যাবে।

কোনো বাধা দেবো না, অধিকারও নেই বাধা দেবার। এই সুরপতির ঠিকানা এনেছি সংগ্রহ ক'রে।

বইখানার দিকে মায়ালতা একবার চেয়ে দেখলে, নেবার কোনো আগ্রহ দেখা গেল না। সুরেশবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, এ তোমার কি আর দরকার নেই ?

মায়ালতা বললে, ছিল, এখন আর নেই।

তবে তুমি কোথায় চলেছ ? বলো মায়ালতা, পথ ফুরোতে আর দেরি নেই !—তাঁর দ্রুত নিশ্বাসের বাতাসটা মায়ালতার কাঁধের কাপড়ের উপর সশব্দে স্পর্শ করছিল।

মায়ালতা ভীতকণ্ঠে বললে, এবার আপনি নেমে যান্ সুরেশবাবু।

না, অমনি আমি তোমাকে চ'লে যেতে দেবো না, তুমি জানিয়ে দিয়ে যাও আমার অযোগ্যতা। তুমি আমার উন্মাদনা জাগিয়েছ, খুঁচিয়ে তুলেছ আমার আসক্তির আগুন, প্রাণ নিয়ে করেছ খেলা—এই চরম মুহূর্তে আমাকে লাথি মেরে চ'লে যেতে তোমাকে দেবো না—ব'লে প্রবল শক্তিতে সুরেশবাবু তার হাত চেপে ধরলেন। উন্মত্ত কণ্ঠে পুনরায় বলতে লাগলেন, তুমি মেয়েমানুষ, তাই অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতের আশায় নিশ্চিন্ত সম্ভোগ ছেড়ে যাচ্ছ। তোমার আশার অতিরিক্ত আমি দিতে পারতুম, দেবার মতো বস্তু আমার আছে। মানুষের যে এত পরাজয় ঘটে আমি জানতুম না। আজ বলতে আর বাধা নেই, আমি রূপবান, আমি শিক্ষিত, আমার প্রচুর সম্পদ, সামাজিক সম্ভ্রম, বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য—আর তোমারই জন্য ভিতরে আমার অশান্ত কামনা। আমি তোমার একটুও অযোগ্য নই। মায়ালতা, আমাকে ধ্বংস ক'রে তোমাকে যেতে দেবো না। চলো, তুমি ফিরে চলো, চলো তোমার পায়ে পড়ি।

কঠিন আলিঙ্গনে মায়ালতাকে জড়িয়ে ধরবার ঠিক মুহূর্ত্তেই ট্যাক্সি ষ্টেশনের ভিতরে এসে ঝাঁকানি দিয়ে দাঁড়াল। সুরেশবাবু পাগলের মতো কাৎ হ'য়ে বসে রইলেন।

অমরেশ, কতক্ষণ এসেছ? একটু দেরি হলো বন্ধু, গাড়ী পাবো ত?
বলতে বলতে মায়ালতা নামল।

পাবে, একটু তাড়াতাড়ি এসো। আরে সুরেশদা যে, সঙ্গে এলেন বুঝি? ব'লে অমরেশ হেঁসে কাছে এসে দাঁড়াল।

সুরেশবাবু সজাগ হয়ে গাড়ী থেকে নামলেন। ক্ষুব্ধ, রুষ্ট, ব্যর্থ দুই চোখ তাঁর রাঙা, মাথার চুল বিক্ষিপ্ত, অবিন্যস্ত, গাউনের বোতাম খোলা। উত্তেজনা দমন ক'রে বললেন, তুমিও যাচ্ছ নাকি সঙ্গে?

হ্যাঁ, মায়াদির সখ চাপলো দেশ-ভ্রমণের। বিবাগী হয়ে যাবেন কিনা, তাই কবিকে নিলেন সাথী হিসেবে।

অমরেশ ট্যাক্সি-ভাড়া দিতে গেল, সুরেশবাবু বাধা দিয়ে বললেন, থাক্, আমি এ গাড়ীতে ফিরে যাবো।

কুলীর মাথায় জিনিসপত্র নিয়ে অমরেশ দাঁড়াল। মায়ালতা স'রে এসে, বললে আর কিছু বলবেন সুরেশবাবু?

না, আর কীই বা বলব! আমাকে কি মনে রাখবে?

নিশ্চয়ই রাখ্‌ব, আচ্ছা নমস্কার।—ব'লে ইসারায় অমরেশকে ডেকে নিয়ে মায়ালতা দ্রুতপদে ষ্টেশনের ভীড়ের মধ্যে চ'লে গেল।

সাত

জনতার কলরবের ভিতর স্তম্ভিত নিশ্চল হয়ে সুরেশবাবু কিয়ৎক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন, এমন সময় ট্যাক্সিওয়ালা ডাক্‌ল, কিরায়া দিজিয়ে বাবুসাহেব।

সুরেশবাবু মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। মনে করেছিলেন এই গাড়ীতেই আদালতে ফিরে যাবেন, কিন্তু মত-পরিবর্ত্তন ঘট্‌ল অকস্মাৎ। মীটার দেখে নিঃশব্দে তিনি ভাড়া চুকিয়ে দিলেন। ট্যাক্সি চ'লে গেল।

আরো যেন কিছু ছিল মায়ালতাকে বলবার, তাঁর কথা এখনো ফুরোয়নি। যেদিকে তারা গেছে সেদিকে তিনি প্রাণপণ উৎসাহে পা চালিয়ে দিলেন। কিন্তু ভীড়ের ভিতর দিয়ে কোন্ দিকে তারা গেল, খুঁজে বা'র করতে যাওয়া বৃথা। আর যদিই দেখা পাওয়া যায়, কী তিনি বল্‌তে পারেন? যে তাঁকে পদে পদে অপমান ক'রে চ'লে গেল, এবার কি তাকে তিনি জয় ক'রে আনবেন কেবল মাত্র মুখের কথায়? না। সুরেশবাবু ফিরে দাঁড়ালেন। অপমান তাঁর আকণ্ঠ হয়ে এসেছে। স্ত্রীলোকের অনিচ্ছায় বলপূর্ব্বক তার হৃদয়ে আসন নিতে যাওয়ার মতো বিড়ম্বনা সংসারে কি আর কিছু আছে? শিক্ষিত লোক হয়ে এই সামান্য কথাটা তাঁর বুঝতে এত দেরি হোলো কেন? কেন তিনি ওর কাছে প্রকাশ করতে গেলেন আজন্মের কাঙালপণা? ছি ছি, স্ত্রীলোকের কাছে স্নেহভিক্ষা ক'রে বেড়ানো তাঁর আর কতদিনে ঘুচবে? নিজের প্রতি সুরেশবাবুর ঘৃণা এসে গেল।

ষ্টেশনের সীমানা থেকে বেরিয়ে তিনি গঙ্গার পুলের উপর এসে উঠলেন। হ্যাঁ, অপরাধ কেবল তাঁর একার নয়। আধুনিক মেয়ের প্রকৃতিতে বর্ত্তমান কালের হাওয়ায় ভেসে এসেছে একটি গভীর দুরভিসন্ধি

—যে কোনো পুরুষকে অকারণ বশীভূত করতে চায় তারা আপন চাকচিক্যে; পথে ঘাটে ভাবে-ভঙ্গিতে পুরুষকে পরোক্ষভাবে মুগ্ধ ক'রে চলে যাওয়াই তাদের কাজ, তাদের আনন্দ। অপরাধ কি কেবল তাঁরই একার? সুরেশবাবুর মনে হোলো, আজকের এই নারী-স্বাতন্ত্র্যের পিছনে কোনো সুসঙ্গত উচ্চ আদর্শবাদ খুঁজে পাওয়া যাবে না,—এর ভিতরে আছে কেবল অতৃপ্ত লিপ্সা, আত্মদ্রোহিতা, গভীর উচ্ছৃঙ্খলতা! মায়ালতার মহৎ আদর্শের তলাতেও ছিল এই দুষ্প্রকৃতি—যৌন-আবেদনের দ্বারা সুরেশবাবুকে কেবলমাত্র উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে কাজ আদায়ের সফল প্রচেষ্টা! ছি ছি!

কিন্তু তবু যেন একটা পরাজয়ের গ্লানি তাঁকে বিঁধছে; তাঁকে হতমান হ'তে হয়েছে। এই মেয়েটির সংস্পর্শে এসে তাঁর আত্মসম্ভ্রম যেন ক্ষুণ্ণ হোলো। এটা তাঁর জীবনে নতুন। মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় হওয়া ভালো কিন্তু সে-পরিচয় যদি লিপ্সায় মলিন হয় তবে সে বড় শ্রীহীন। আজকে তাঁর এই পরাজয়ের পিছনে রয়েছে সেই বাসনার চেহারা—এ বস্তু তাঁকে অনেক নীচে নামিয়ে এনেছে। মায়ালতা যত অপরাধই ক'রে চ'লে যাক্ কিন্তু তাঁর নিজের লজ্জা লুকোবার ঠাঁই আর সংসারে কোথাও রইল না। তাঁর এই ভদ্র পরিচ্ছদের নীচে একজন লালায়িত পশুর সন্ধান নিয়ে একটি মেয়ে আজ তাঁকে প্রত্যাখ্যান ক'রে চ'লে গেল।

হাঁটতে হাঁটতে দুপুরের রৌদ্রে সুরেশবাবু আদালতে এসে পৌঁছলেন নিত্যকার কর্ত্তব্য কর্ম্মে মনোযোগ দেবার আয়োজন করলেন, কিন্তু সেই কাজগুলিই যেন আজ তাঁর ব্যবহারের প্রতিবাদ করতে লাগল। তাঁর মন বস্‌লো না।

অত্যন্ত অসময়ে অনেকগুলি হাতের কাজ ফেলে রেখে এক সময়ে হঠাৎ আবার তিনি পথে বেরিয়ে পড়লেন। বাস্তবিক, একান্তভাবে তাঁর জীবন নিঃসঙ্গ! কাজের জটলা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিলে দেখা

যায়, নিতান্ত তিনি একা, সুখ সাহচর্য্য দেবার মতো মানুষ সংসারে তাঁর আর কেউ নেই। তাঁর বাড়ীর বৃহৎ পরিবারের মধ্যে অসংখ্য অন্তরীয় স্বজন—কিন্তু বহু পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতায় তাদের ভিতর থেকে নূতন কিছু পাবার আর নেই, দেবার যা কিছু সব ফুরিয়ে গেছে। তারা সব সাজানো পুতুল, তাদের দিকে তাকালে চোখ ক্লান্ত হয়ে আসে।

চিত্ত বৈলক্ষণ্য তাঁর সহসা ঘটে না। বাড়ীতে এসে অসময়ে তাঁকে উপরে উঠতে দেখে মা এগিয়ে এলেন। বললেন, ওমা, এমন সময় এলি কেন সুরেশ? শরীর ভালো আছে ত?

হ্যাঁ, ভালোই আছে।

রক্ষে পাই, যে অসুখ বিসুখের হুজুগ চলেছে! ব'লে মা নিশ্চিন্ত হয়ে চ'লে গেলেন।

সুরেশচন্দ্র ঘরে এসে দাঁড়ালেন। গৃহসজ্জাগুলি অতি পরিচিত, অতি পুরাতন। প্রতিদিন একই চেহারা নিয়ে তারা চেয়ে থাকে, তাদের ক্ষয় নেই, লয় নেই। বাস্তবিক, বৈচিত্র্যহীনতাই মৃত্যু। এই বৈচিত্র্যের পিছনে সুরেশচন্দ্র আবাল্য ছুটে চলেছিলেন। বহু নারীর সঙ্গে তাঁর যে অন্তরঙ্গতা, সেও এই বৈচিত্র্যেরই আস্বাদন। খুঁজে বেড়িয়েছেন তিনি সেই পরম বৈচিত্র্যময়ী একাকিনীকে বহুর মধ্যে—যার ভিতরে সমস্ত কিছুর গভীর ঐক্য। যার পরে পুরুষের আর আবিষ্কারের ক্ষুধা নেই।

লৌকিক পরিচয়টা তাঁর ভালো নয়। পূর্ব্বজীবন যতদূর মনে পড়ে, অনেক স্থানেই তাকে জঞ্জাল ঘাঁটতে হয়েছে। মানুষ তিনি, রক্তের ভিতরে তাঁর ছিল জৈবিক তৃষ্ণা, বর্ত্তমান কালের হাওয়ায় তিনি বর্দ্ধিত—আত্মজয়ী তিনি নন। বিবাহ তিনি করেন নি, তার কারণ, তাঁর কল্পনার মতো মেয়ে তিনি খুঁজে পান নি। অর্থাৎ মানুষ হিসাবে তিনি ছোট হলেও তাঁর আদর্শটা বড়ই বলব। বীরাঙ্গনা তিনি চান্। স্বাতন্ত্র্যে, স্বকীয়তায়, তেজস্বীতায় যার কাছে পদে পদে তিনি মানবেন পরাজয়; দাসী হয়ে যে

সেবা করবে না, দেবী হয়ে যে পূজা নেবে। ধরা দিতে যে আসবে না, যাকে ধরবার জন্য ছুটতে হবে।

টেবলের কাছে এসে একটা ছোট চিঠি পাওয়া গেল। কাগজের টুকরোটা তুলে নিয়ে পড়লেন—"কাল দুঃখ ক'রে গিয়েছিলেন, সেজন্য আমারও দুঃখিত। চিঠি দিয়ে লোক পাঠালুম। দয়া ক'রে হুজুর আজ আমাদের এখানে চা খাবেন। ইতি—সুচরিতা।"

উৎসাহিত হবার মতো চিঠি, কিন্তু সুরেশচন্দ্রের কোনো মনশ্চাঞ্চল্যই দেখা গেল না। পৃথিবীর কোথাও যেন আজ রং নেই,—ফিকে হয়ে গেছে। কাল তিনি দুঃখ ক'রে এসেছেন, কিন্তু আজকে তাঁর যে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন এসেছে একথা সুচরিতাকে বিশ্বাস করাবার কোনো উপায় নেই। তারা জানে সুরেশবাবু সুলভ, সুরেশবাবু নিরভিমান, তারা জানে সুরেশবাবু নিমন্ত্রণের অপেক্ষা রাখে না,—স্ত্রীলোকের হাতছানিতে তিনি নরকে যেতেও প্রস্তুত। কিন্তু তারা একথা জানতে শেখেনি, মানুষের দুঃখ আছে, ব্যর্থতা আছে, মানুষের বুকের ভিতরটা আকস্মিক ধ্বংসে শ্মশান হয়ে যেতে পারে।

চিঠিখানা কুচিয়ে ছিঁড়ে ফেলে তিনি ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন।

চাকর এসে দরজার কাছে দাঁড়ালো। মুখ ফিরিয়ে তিনি বললেন, কি চাই রে?

একজন বাবু ডাকছেন।

অগাধ জলে ডুবতে ডুবতে তিনি যেন আশ্রয় পেলেন। বললেন, যাচ্ছি, বস্‌তে বল্‌।

চাকর চ'লে গেল। ক্যালেণ্ডারের দিকে চোখ পড়তেই মনে হোলো আজ শুক্রবার, স্কুলের প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে লোক এসেছে; আজ কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভা। মায়ালতার সম্বন্ধে আজ রিপোর্ট দিতে হবে। ট্রাউজার ছেড়ে ধুতি পরলেন, কোট ছেড়ে পরলেন পাঞ্জাবী, তারপর

চটিজুতোটা পায়ে দিয়ে নীচে নেমে গেলেন। মুখে চোখে যেন তাঁর অপরাধীর ছায়া পড়েছিল।

বাইরের ঘরে ঢুকে দেখা গেল তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু মহিম। বললেন, কি হে, তুমি যে আজ অসময়ে?

মহিম বললে, বারান্দায় ব'সে পড়ছিলুম খবরের কাগজ, চোখে পড়লো পথ দিয়ে হন্ হন্ ক'রে চলেছেন শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র। বুঝলুম মক্কেল জোটে নি। সুতরাং একটু আড্ডা দিতে আমার বাসনা হোলো।

তুমি ত লোকের কাজকর্ম্ম পণ্ড ক'রে বেড়াও!

ওইটেই আমার কাজ, আমি হচ্ছি জন্ম-বেকার। দুঃখের কথা বলি তবে, সেদিন বেকার সমিতির মেম্বার হ'তে গেলুম, তারাও চাইলে চাঁদা। যাক্, তোমার খবর কি বলো?

সুরেশচন্দ্র বললেন, খবর কিছু নেই, এদিকে সব ফিনিশড্!

মহিম বললে, ফিনিশড্ মানে? তোমার গলার আওয়াজে যেন দুঃখের সুর বাজলো!

সুরেশচন্দ্র চেয়ারখানা টেনে নিয়ে নীরবে বসলেন, সিগারেট বা'র ক'রে দু'জনে ধরালেন, কিন্তু কথা বললেন না। মহিম তাঁর নিরুৎসাহিত মুখখানার দিকে চেয়ে হঠাৎ হেসে বললে,—

"এবার আমার হৃদয়-ক্ষত
ধুয়ে মলিন চিহ্ন যত,
হবো নিষ্কলঙ্ক।"

সুরেশ বললেন, হ্যাঁ তাই। আর পারিনে। কেবল নষ্টই হোলো, কিছু পাওয়া গেল না। এতদিনের এত কল্পনা, এত দিবাস্বপ্ন, সব মিথ্যে হোলো।

মহিম হেসে বললে, রবিবাবু বলেছেন, 'জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা। ভাবচো কেন, এতদিন মিথ্যে নিয়ে কারবার করেছ, এবার সত্যের সংস্পর্শে কিছু দুঃখ পাবে বৈকি। সুরেশ, কুলগ্নে আমাদের জন্ম

হয়েছিল। তুমি আর আমি না বাঙলার যুবকের কাল্‌চারের মুখপাত্র? নিজেদের চরিত্রের দিকে একবার চেয়ে ভাখো ত'?

সুরেশ বললে, আমরা মন্দ কিসে?

মন্দ নই; কিন্তু এক জায়গায় আমাদের শোচনীয় দৈন্য! মেয়েদের সংসর্গ নিয়ে এতদিন মাতামাতি করেছ, সে কি ইস্কুল গড়বার, প্রতিষ্ঠান চালাবার মহৎ আদর্শ নিয়ে? তার পিছনে কী ছিল? বুকে হাত দিয়ে বলো, তাদের উপকার করতে ছোটনি, ছুটেছিলে বায়োলজির তাড়ায়। লাভ্‌ নয়, লাষ্ট্‌! ফ্লার্ট করেছ, ইন্‌টেলেক্‌চুয়েল কথা বলেছ, পার্টিতে যাতায়াত করেছ, মধুর অন্বেষণ ক'রে ফিরেছ আঁচলের পিছনে পিছনে, সম্মান দিতে পারোনি, সম্মান নিতে জানোনি। আজ দুঃখ করলে চল্‌বে কেন?

সুরেশ বললে, মহিম, আমি কিন্তু মায়ালতাকে ভালো বেসেছিলুম।

মহিম বললে, মিছে কথা। তোমাকে আমি চিনি। ভালোবাসলে কৌশলে তুমি তাঁকে লালসায় বন্দী করতে চাইতে না। আমি তোমাকে বারণ করেছিলুম, পাগলের মতো তাঁর পিছনে ছুটো না; মৌমাছির নেশাকে মেয়েরা ভয় পায়, অবিশ্বাস করে। ফল পাকবার অবকাশ তুমি দাওনি। সমস্ত ভালো জিনিস পাবার আগে গভীর প্রতীক্ষার দরকার আছে। তুমি আপন মোহমত্ততায় তাঁকে অধীর ক'রে তুল্‌তে চেয়েছিলে, কিন্তু তাঁর ছিল দিব্যদৃষ্টি। তোমার কথা শুনে আমার কেবলই মনে হয়েছে, তুমি নিজের মহিমাকে প্রকাশ করোনি, যা করেছ তার নাম প্রবৃত্তির দৌর্ব্বল্য!

সুরেশ বললে, কিন্তু আমি ত বরাবর তাঁর ভালই করতে চেয়েছিলুম, মহিম!

সেইটে তুমি তাঁর চোখে আঙুল দিয়ে বার বার জানাতে চাইছিলে, তাইত এই বিড়ম্বনা। তুমি তাঁর ভালো করোনি; কিন্তু নিজের সুবিধা করতে চেয়েছিলে। কৃতজ্ঞতার ফাঁদে ফেলে মেয়েমানুষের কাছে ভালোবাসা আদায় করতে চাও? সুরেশ, আত্মবঞ্চনার চেষ্টা ক'রো না।

সুরেশ বললে, ধরো যদি আমার জায়গায় তুমি হতে, কী করতে?

মহিম বললে, আমি হ'লে? একদিন জোর ক'রে তাঁর হাত ধরতুম। শক্তির দ্বারা করতুম জয়, ছিনিয়ে আনতুম, সকলের কাছ থেকে। প্রকাশ করতুম নিছক বর্বরতা!

মুখের একটা শব্দ ক'রে সুরেশ বললে, ব্রুটাল্!

মহিম বললে, কিম্বা কিছুই করতুম না। তাঁর চরিত্রে যথেষ্ট মাধুর্য্য ছিল, তাঁকে দেখেই খুশি হয়ে চ'লে আসতুম। যাকে আদর্শ মেয়ে ব'লে মনে করব, তার সান্নিধ্যটাই ত বড় কথা, টানা-হেঁচড়া করতে চাইব কেন? উপকার করতে পেরেছি, সে আমারই সৌভাগ্য, তিনি সে উপকার গ্রহণ ক'রে আমাকে ধন্য করেছেন,—তার জন্যে আবার দাবি থাকবে কেন?

সুরেশ চুপ ক'রে রইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে মহিম বললে, সুরেশ, তুমি বিয়ে করো।

সুরেশ বন্ধুর মুখের দিকে তাকালো। মহিম পুনরায় বললে, তুমি বিয়ে করো। নিজের দায়িত্ব অন্যের উপর তুলে দাও, অন্যের দায়িত্ব নিজের মাথায় তুলে নাও! বিশেষ কোনো মেয়ের প্রতি তোমার আগ্রহ নেই, তুমি চাও ভালো একটি মেয়ে। বিয়ে করো, সুরেশ।

বাইরে তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

*

* *

রেলপথের দু'ধারে জলা, বিল, প্রান্তর শরৎকালের প্রচুর শস্যে পরিপূর্ণ। মাঝে মাঝে কাশের জঙ্গল। আকাশে এখানে ওখানে নানাবর্ণের মেঘ ছড়ানো, যেন কোন্ খামখেয়ালীর কাঁচা হাতের তুলি রং ছড়িয়ে দিয়েছে। তার ছবির কোনো সামঞ্জস্য নেই। দূরে দূরে খণ্ড খণ্ড দরিদ্র গ্রাম, তাদের সভ্যতালেশহীন রহস্যময় জীবন যাত্রার কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। কোথাও আঁকাবাঁকা বনপথ, মাঠের উঁচু নীচু কিনারা পার হয়ে, তাল-সুপারির জঙ্গল অতিক্রম ক'রে জলা ডিঙিয়ে এক সময় হারিয়ে গেছে

নিরুদ্দেশের দিকে। সূর্য্যাস্তের এখনো দেরি রয়েছে। গম-গম ক'রে ট্রেণ ছুটেছে।

ইণ্টার ক্লাসে ভীড় তেমন নেই। একটি বাঙালী পরিবার অল্প জায়গাটুকু নিয়ে নিজেদের বিধি-ব্যবস্থায় ব্যস্ত। সমস্ত পথটা আহার এবং স্বাচ্ছন্দ্য নিয়েই তাদের কাটল। খুব সম্ভব পূজাবকাশের কন্‌সেসনের যাত্রী—বেপরোয়া হাঁকডাক এবং টাইম্‌টেবল-আলোচনা দেখে তাই মনে হয়। এদিকে জন দুই পশ্চিমগামী মুসলমান, তাদের রুটি, মাংস, তামাক আর ফল-পাকড়ের নানা আয়োজন চলছে। তাদেরই সম্মুখে জানলার ধারে মুখোমুখি ব'সে মায়ালতা আর অমরেশ। গাড়ীর দোলায় মায়ালতার চোখে তন্দ্রা আসছিল, ট্রেণ-ভ্রমণের ক্লান্তির ছায়া তার মুখে চোখে। অমরেশের হাতে রবীন্দ্রনাথের একখানা কবিতার বই। তার মাথার চুল মাঝে মাঝে বাতাসের ঝাপটায় ন'ড়ে চ'ড়ে উঠছে।

মায়ালতা বললে, বেলা গড়িয়ে এলো, কখন্ পৌছুবো বলো দিকি ?

অমরেশ বললে, পথ আর বাকি নেই।

এইবার নিয়ে তিনবার বললে এই কথা। কবি, তোমার মৎলব কি, পথ ভুলিয়ে কোন পথে নিয়ে চলেছ শুনি ?

তোমায় ভোলাবো পথে ?—অমরেশ হেসে বললে, পথ ভুলিয়েছ তুমি। ছিলুম শহরের এক অন্ধ গলির ধারে, সঙ্কীর্ণ জীবনযাত্রার বাইরে গতিবিধি ছিল জিয়োমেট্রির কিতাবের মতন। পথ দিয়ে তরুণী পার হয়ে গেলে তাঁকে নিয়ে লিখতুম কবিতা, গড়ের মাঠ ঘুরে এসে ছবি আঁকতে বসতুম —এমন সময়ে তুমি এলে অপ্রত্যাশিত। পথ ভোলালে, ঘর ভোলালে, তোমার টানে এলো বিষয়-বৈরাগ্য—এখন নিয়ে চলেছ দেশছাড়া ক'রে। মায়াদি, অসীম শক্তি তোমার। সুরেশদা বড় গাছেই নৌকো বেঁধেছিলেন।

মায়ালতা হেসে উঠল। বললে, তবু সেই নৌকোর কাছি ছিঁড়লো।

ছেঁড়েনি, কাছির গেরো আলগা হয়ে নৌকো গেল ভেসে। বেচারি ! আচ্ছা, কেন তাঁকে ভালো লাগল না বলো ত ?

সত্যি বল্‌ব ?

মিথ্যে যদি বলো, বুঝতে পারব।

মায়ালতা বললে, ভদ্রলোকের চোখে মুখে বহু অভিজ্ঞতার চিহ্ন দেখেছি ; বলবানের দাবি দেখিনি, দুর্ব্বলের অতি-পূজার দৈন্য। আর বল্‌ব ?

না, থাক্। তুমি বুঝিয়ে বলতে পারোনি কিন্তু আমি বাকিটা বুঝতে পারছি। আর এক কথা জিজ্ঞাসা করব, বল্‌বে স্পষ্ট ক'রে ?

স্পষ্ট বলা মেয়েদের চরিত্রে নেই। বল্‌তে পারব না, প্রকাশ করতে পারব, এমন প্রশ্ন করো।

অমরেশ বললে, সুরপতিবাবু আমার সম্মানের পাত্র, কারণ তিনি তোমার ভালোবাসার মানুষ। তবু প্রশ্ন উঠ্‌ছে মায়াদি, ক্ষমা ক'রো। কতখানি পরিচয়, কী পেয়েছ তুমি ? তোমার মধ্যে কেমন ক'রে এলো এই বন্যা ?

মায়ালতা বললে, বন্ধু, কিছুই পাইনি। কিন্তু যদি পাই, সেই হবে আমার অফুরন্ত, এই আমার আশা। অতি অল্পদিনের পরিচয়, তবু চিন্‌তে পেরেছি তাঁকে। মহৎ হৃদয়, বড় হবার উচ্চাভিলাষ, বিষয়-বৈরাগ্য, মুক্ত মন। এক কথায় যার নাম চরিত্রবান্।

তার কী পরিচয় পেয়েছ ?

অপরাহ্ণের বিস্তৃত প্রান্তরের দিকে চেয়ে মায়ালতা বললে, বলা কঠিন। কেবল দেখেছি তাঁর সংগ্রাম। আত্মীয়-স্বজন থেকে দূরে, দুস্তর দুর্ভাগ্য বরণ ক'রে, নিজের জীবনের লক্ষ্য স্থির রেখে চলতে দেখলুম তাঁকে। বড় ভালো লাগল। কথা বললুম, জবাব নেই। সেবা দিতে চাইলুম, নিষ্ঠুর বৈরাগ্য দেখে পিছিয়ে এলুম। মনে মনে দুর্জ্জয় পুরুষের কাছে মাথা হেঁট করলুম।

কতক্ষণ অমরেশ নীরবে রইল। তারপর বললে, এখন চলেছ কেন ?

মায়ালতা বললে, কেন, তার কারণ তাঁকে আমি ছেড়ে দিতে পারব না। তাঁর কাজকেই নিজের কাজ মনে করব, তাঁর সাহচর্য্যে নিজেকে উজ্জ্বল ক'রে তুল্‌ব।

অর্থাৎ ?

অর্থাৎ, তুমি তাঁর দরজায় আমাকে পৌঁছে দিয়ে ছুটি নেবে। একদিন তোমাকে আদর ক'রে খাওয়াবো, তারপর ট্রেণে তুলে দিয়ে যাবো, তুমি চ'লে যাবে তোমার যেদিকে দু'চোখ যায়।

অমরেশ রাগ ক'রে বললে, এর নাম স্ত্রীলোক। তোমার স্বার্থের খেলায় আমি হলুম খেল্না, কাজ ফুরলে পথের ধারে গুঁড়ো ক'রে ফেলে দেবে, তারপর নিজের ঘরকর্ণা করবে পরমানন্দে—কেমন ?

মায়ালতা হাসিমুখে বল্লে, তুমি আমার স্মৃতি নিয়ে লিখবে কবিতা, প্রথম বই উৎসর্গ করবে আমার নামে। আর যদি কোনোদিন মদ খাও, তবে বন্ধুসমাজে আমাকে 'মানসী' ব'লে পরিচয় দিয়ো।

বুঝলুম তোমার বিদ্রূপ, কিন্তু আমার বাকি জীবনটার খোঁজ তুমি রাখবে না ?

এটা আবেদন, না প্রশ্ন ?

দুইই।

মায়ালতা বললে, কবি, আমি খুশী হবো, যদি তুমি দুঃখ পাও। ভাত কাপড়ের নয়, আশ্রয়হীনতার নয়, ব্যর্থ প্রেমের নয়, তার চেয়ে বড়, আরো গভীর। যে-দুঃখ তোমাকে পরম রসের সন্ধান দেবে, যা তোমাকে মলিন করবে না, দীপ্তিময় ক'রে তুল্বে।

তথাস্তু।

এমন সময়ে গাড়ী এসে দাঁড়াল একটা ষ্টেশনে। ফেরিওয়ালারা হেঁকে চলেছে। অমরেশ এবার উঠে দাঁড়িয়ে বললে, এর পরের ষ্টেশনে আম্‌রা নাম্‌ব। কি খাবে, বলো মায়াদি।

মায়ালতা বললে, বাতাবি লেবু আর চা।

অমরেশ ফিরিওয়ালাকে ডেকে চা আর লেবু কিন্‌লে, দাম চুকিয়ে দিলে। তবুও সে গাড়ী থেকে নেমে যাচ্ছে দেখে মায়ালতা জিজ্ঞাসা করলে, আবার কোথায় চল্‌লে ?

তোমাকে লুকিয়ে একটা কাজ সেরে আসবো।

মায়ালতা তার হাত ধরে' কাছে বসিয়ে বললে, লুকিয়ে সারতে যাবে এমন অন্যায় করতে দেবো কেন? সিগারেট বা'র করো, আমি দেশালাই জ্বেলে দিচ্ছি। লজ্জা করবে কেন আমাকে?

এর পরে আর কোনোমতেই গোপন করা চলে না। সিগারেট বা'র ক'রে অমরেশ বললে, এবার তুমি আমাকে সত্যিই লজ্জা দিয়েছ, মায়াদি।

লেবু ছাড়িয়ে মায়ালতা তার হাতে দিলে, তার সঙ্গে মাটির ভাঁড়ে চা খেতে খেতে বললে, আমার লজ্জা কোথায় ছিল, যেদিন পরণের কাপড় ফেলে দিয়ে তোমাকে ছবি আঁকতে দিয়েছিলম? তুমি পুরুষ, তুমিই রাখবে মেয়েমানুষের সম্মান, তাই অনাবৃত দেহ নিয়ে তোমার শিল্পমন্দিরে গিয়ে দাঁড়াতে পেরেছিলুম। মনে নেই?

অমরেশ সলজ্জ রক্তিম মুখে চা খেতে লাগল। সহজ মনের বাতাস যেখানে বয়, সেই সারল্যের সম্মুখে অমরেশের আর কথা নেই।

গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে। জান্‌লার ধারে মাথাটা আবার হেলিয়ে রেখে মায়ালতা বললে, কবি, সেই কবিতাটি আর একবার পড়ো, শুনি। 'হে অতনু—'

সিগারেট ফেলে দিয়ে অবসন্ন দিনের অস্পষ্ট আলোয় অমরেশ অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করলে—

"ভস্ম অপমান শয্যা ছাড়ো, পুষ্পধনু,
রুদ্র-বহ্নি হ'তে লহো জলদর্চ্চি তনু।
যাহা মরণীয় যাক্ ম'রে,
জাগো অবিস্মরণীয় ধ্যানমূর্ত্তি ধ'রে।
মৃত্যু হ'তে জাগো, পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহ তনু।"

চোখ বুজে কোমল ক্লান্ত হাসিমুখে মায়ালতা বললে, কোথা থেকে ভেসে এলুম, তুমি ছিলে কোথায় দাঁড়িয়ে, ক'দিনেরই বা পরিচয়, কোথায়

আবার হারিয়ে যাবো দু'জনে অজানা জনসমুদ্রে—কিন্তু তোমাকে আজ বড় ভালো লাগলো অমরেশ। বলো, ত, তুমি কী চাও?—চোখ বুজেই সে প্রশ্ন করলে।

অমরেশ বললে, চাইবো কিছু, এমন কথা ভাবো কেন? তোমাকে দেখতে চেয়েছিলুম, দেখা হোলো। তোমার ওই অনির্ব্বচনীয় রূপের পরিমণ্ডলে আমি পাই জীবনের অদ্ভুত অনুপ্রেরণা। তোমার জন্য যদি কোনোদিন প্রার্থনা করি, তবে এই বলব, অনেক দিয়েছ তুমি আমাকে, তুমি যেন সর্ব্বোত্তমকে পাও। মায়াদি, বলো ত তুমি গৃহত্যাগ করেছিলে কেন?

হঠাৎ চোখ খুলে মায়ালতা অমরেশের দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকালো। অমরেশের চোখের মধ্যে ছিল ব্যাকুল জিজ্ঞাসা, নিবিড় কৌতূহল। কিন্তু আবার সে ধীরে ধীরে চোখ বুজলো। অমরেশ বললে, বলতে বাধা আছে?

না। কিন্তু বলার দোষে তুমি হয়ত ভুল বুঝবে কবি।

তবে থাক্, বলতে তুমি যদি বাধা পাও—আমি কেবল জানতে চেয়েছিলুম, সংসার এত ছোট কেন, যেখানে তোমার ঠাঁই হোলো না?

ঠাঁই ছিল, কিন্তু আমি গ্রহণ করিনি, বন্ধু। তোমাকে আজো বলা হয়নি যে, আমি বিয়ে করেছিলুম।

বিয়ে করেছিলে!

চোখ বুজে মায়ালতা হাসলে। বললে, খেলা করেছিলুম। জানতুম না যে, বিয়ে মানে আত্মবিলোপ।

কে তোমার স্বামী, মায়াদি?

একজন সাধারণ ভদ্রলোক। তিনি আবার বিবাহ করেছেন। তাঁর অপরাধ নেই, তিনি দিতে চেয়েছিলেন সোনার খাঁচা, আমি চেয়েছিলুম অরণ্যের মুক্তি। আমার হাতেগড়া সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে গুঁড়ো ক'রে দিয়ে, তিনি আমাকে চাইলেন কেবল তাঁর সন্তানের মা হিসেবে। অন্দর-মহলের কর্তৃত্ব দিয়ে সদর দরজায় দিলেন চাবি। বিরোধ

বাধলো। বন্ধু, সে যে কী বিরোধ, মেয়েমানুষ না হয়ে জন্মালে বোঝা যায় না। নিন্দা আর কলঙ্কে জর্জ্জরিত হয়েছি, এমন দিনে এসে দাঁড়ালেন হরিহরদাদা। মুক্ত পুরুষ, কিন্তু নিষ্ঠুর, দায়িত্বজ্ঞানহীন। মানেন না নীতি, মানেন না সংস্কার—পুরুষকে ঠেলে দেন দুর্গমের দিকে, মেয়েমানুষকে ঠেলে দেন বিপদের দিকে। তবুও তাঁরই সঙ্গে একদিন দেশ ছেড়ে পালিয়ে এলুম। নিঃসম্বল অবস্থা, অন্নবস্ত্র নেই। একখানা ভাঙা বাড়ীতে একলা রেখে হরিহরদাদা উধাও হলেন—মমতা নেই, বিবেচনা নেই। উপবাস ক'রে প'ড়ে থাকি অন্ধকার প্রকোষ্ঠে, মাঝে মাঝে তিনি এসে কিছু আহার দিয়ে আবার পালিয়ে যান্। নির্লিপ্ত, নির্দ্দয়, অন্ধ! তারপরে তুমি সব জানো, কবি।

দ্রুতগতিতে ট্রেণ চলেছে। তারই মতো দ্রুত কল্পনার অশান্ত আন্দোলন জেগে উঠেছিল অমরেশের মনে। সরল কণ্ঠে এক সময় সে প্রশ্ন করলে, তোমার বিবাহিত জীবনের সম্বন্ধে আরো অনেক কথা থেকে যায় মায়াদি।

এইবার চোখ খুলে মায়ালতা বললে, পাগল, তুমি কী বলতে চাও! একটি দিনও নয়, একটি মুহূর্ত্তও নয়!

এ কি সম্ভব? তুমি কি আজো কুমারী?

হাসিমুখে মায়ালতা বললে, কায়মনোবাক্যে!—ব'লে সে আবার চোখ বুজে জান্লায় হেলান্ দিয়ে রইল।

মায়াদি?

হুজুর!

ট্রেণের দোলা না থাকলে আজ আবার তোমার ছবি আঁকতে বসতুম।

এমন দুর্বুদ্ধি কেন হোলো?

অমরেশ বলে, কবিতার মতন তুমি। ঘুম-জড়ানো দুই চোখ' ক্লান্তিতে রক্তিম তোমার মুখ, প্রিয়মানুষটির ধ্যানে নিস্তরঙ্গ প্রশান্তি হাত দুখানা লাবণ্য-রসে ভরা। সন্ধ্যার রশ্মি এসে পড়েছে তোমার ভাঙা চুলে—মূর্ত্তিমতী স্তব তুমি। এই ছবি আমার মনে রইল মরণান্ত কাল পর্য্যন্ত।

বাঁ-হাতখানা বাড়িয়ে মায়ালতা বললে, ছুঁয়ে বলো ত পুরুষ, তোমার প্রশংসার পিছনে কি লোভ নেই?

হাতখানা হাতের মধ্যে নিয়ে অমরেশ বললে, ছুঁয়েই বলব লোভের আধ্যাত্মিক রূপটাই প্রশংসা। তুমি দুষ্প্রাপ্য, তুমি সকল প্রত্যাশার অতীত' তাই পুরুষের স্তুতিগান! তবু বিশ্বাস করো নারীর সম্বন্ধে যদি এমন কোনো অনুভূতি থাকে যা নির্ম্মল, যা দেবতার পূজার উপকরণ, যা হৃদয়কে অনির্ব্বচনীয় কল্যাণ-কামনায় পরিপ্লাবিত করে—আজ তোমার প্রতি আমার সেই আবেগ। আজ আনন্দ-বেদনায় কোনো পার্থক্য নেই, জীবন আমার ব্যর্থ হয়েছে, কি সার্থক হোলো—আমার জীবন আর মৃত্যু, ইহকাল আর পরকাল,—তোমার এই বিপুল মায়ার সমুদ্রে তলিয়ে গেল! একদা—একদা সবচেয়ে দরিদ্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলুম, আজ অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য মাথায় নিয়ে ফিরে যাবো।—তার তরুণহৃদয় বিগলিত অশ্রুতে ভেঙে পড়ল।

সান্ত্বনা কিছু নেই, কেবল মায়ালতার সেই হাতখানা আরো শক্ত হ'য়ে তার হাতটি চেপে ধরলো।

গাড়ী ষ্টেশনে এসে দাঁড়াতেই গা-ঝাড়া দিয়ে দু'জনে উঠ্‌ল। সঙ্গে ছোট একটি চামড়ার ব্যাগ, সেইটি হাতে নিয়ে অমরেশ আগে আগে প্লাটফর্মে গিয়ে নাম্‌ল। চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেছে।

যে-বাঙালী পরিবার এতক্ষণ এদের সমস্ত কিছুই লক্ষ্য ক'রে স্তম্ভিত হ'য়ে চেয়েছিল, তাদেরই গৃহিণী এবার প্রশ্ন ক'রে ফেললেন কান্নাকাটি কেন গা? কি হয়েছে? উটি তোমার কে?

মুখে একরাশ বিরক্তি ফুটিয়ে মায়ালতা বললে, আর সে-দুঃখের কথা বলবেন না মা, মা-মরা ছেলেকে নিয়ে আমার হয়েছে যত জ্বালা!

দেওর বুঝি?

আমার শত্তুর! বলে গায়ে চাদর সামলে মায়ালতা দ্রুতপদে গাড়ী থেকে নেমে গেল।

ষ্টেশনের বাইরে এসে অনেক খোঁজাখুঁজির পর একখানা গোরুর গাড়ী পাওয়া গেল। হারিকেন লণ্ঠন নেই, ঘোলাটে আলোয় পথ চিনে চিনে যেতে হবে। মাঝখানে ছ' মাইল শালের জঙ্গল, তারপরে বলরামপুর। পথে আছে একটা পাহাড়ি নদী, গতকাল সেই নদীতে ঢল্ নেমেছিল। শালের জঙ্গলে ভয় আছে, সুতরাং দু'টাকার কম গাড়ী পাওয়া যাবে না।

অমরেশ বললে, কদমতা চিনিস রে?

গাড়োয়ান বললে, চিনে না বাবু।

যমুনার তীর কোন্‌দিকে?

নেই বাবু, জানিনে।

মায়ালতা অমরেশের গায়ে একটা গোঁজা দিয়ে বললে, দুষ্টু, এমন সময় তোমার বিদ্রূপ?

অমরেশ বললে, মায়াদি, বৈষ্ণব কবি হ'লে এই অভিসারের বর্ণনা ক'রে বলতুম—

'কানু অনুরাগে হৃদয় ভেল কাতর রহই না পারই গেহে,
গুরুদুরুজন ভয় কিছু নাই মানয়ে চীর নাহি সম্বরু দেহে।
ঘন আঁধিয়ার ভূজগ ভয় কতশত
পন্থ বিপথ নাহি মান!
গো—
পন্থ বিপথ নাহি মান!'—

চল্ বাবা, দেড় টাকা পাবি। প্রাণে বাঁচলে আর চার আনা!

গাড়োয়ান রাজি হোলো। গাড়ীর ভিতরে খড়ের বিছানা, মাথার উপরে দর্মার ছই ঘেরা—অন্ধকারে কোনো ক্রমে বাঁশের উপর পা দিয়ে মায়ালতা তার ভিতরে ঢুকল। কিন্তু সেখানে একজনের বেশি আর জায়গা হওয়া বড় কঠিন। ভীত কণ্ঠে সেইদিকে একবার তাকিয়ে অমরেশ বললে, ও মায়াদি, আমি বাপু হেঁটে যাবো।

কেন ?

ওইটুকু জায়গায় পরস্ত্রীর সঙ্গে যাওয়া অসম্ভব।

পাজি কোথাকার! ব'লে মায়ালতা হেসে তার হাত ধরে ভিতরে তুলে নিলে।

নানা উৎকট শব্দ ক'রে গোরুর গাড়ী খানা-খোন্দলে চাকা বসিয়ে মন্থর গতিতে চল্‌তে লাগল।

নিস্তব্ধ অন্ধকার পথ। অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় শালের জঙ্গলের নীচে সে-পথ যেমন জটিল, তেমনি রহস্যময়। অতিদূরে মাঝে মাঝে রেল-পথের লাল নীল আলো চোখে পড়ছে। কখনো শোনা যাচ্ছে কোনো কোনো দেহাতীর গলায় স্বর, কোন্ পথ দিয়ে কোন্ পথে সেই আওয়াজ মিলিয়ে যাচ্ছে তার হদিস নেই। গাড়ীর ভিতরে দু'জনেই নির্ব্বাক্।

অমরেশ এক সময়ে প্রশ্ন করলে, ওহে গাড়োয়ান, তোমার ঘর কোথায় ?

এজ্ঞে, কেত্তিকপুরে। এখান থেকেন' আট কুশ।

বলরামপুরের জমিদারের অবস্থা কেমন ?

খুব ভাল এজ্ঞে, এই জঙ্গলটা তেনাদেরই। এদিকে তেনারা বনশূয়োর মারতো। হ্যা, হুরিয়্যা! ব'লে সে আবার গোরুর ল্যাজ ম'লে দিয়ে গাড়ী চালাতে লাগল।

মায়ালতা বললে, পা গুটিয়ে বসি বাবা, বাঘের চেয়ে বনশূয়োর ভয়ানক!

অমরেশ বললে, হ্যাঁ, যেমন কবির চেয়ে ভয়ানক ইংরেজির প্রফেসর।

ঠিক হোলো না উপমা। যেমন সুরেশবাবুর চেয়ে ভয়ানক তুমি!

আমি? অমরেশ বললে, আমি তোমার শ্রীচরণে কী অপরাধ করলেম, দেবী ?

মায়ালতা বললে, বাঘের হিংস্রতা সবাই জানে, কিন্তু হৃদয় জয় করার আর্ট তুমি ভালো বোঝো। অর্থাৎ মেয়েরা কখন্ খুশী হয় জানো?—বাঘটা যখন ভদ্রবেশে একটু একটু ক'রে তাদের মোলায়েম ক'রে খায়!

অমরেশ বললে, আমি তেমন নই,—তুমি নিশ্চয় দৈনিক খবরের কাগজে পড়া বৃটীশ চরিত্রের কথা বলছ।

দু'জনেই হাসতে লাগল।

কিছুদূর গিয়ে মায়ালতা বললে, এই রাত্রে গিয়ে কেমন ক'রে তাঁকে খুঁজে পাবো ?

অমরেশ বললে, আমি ভাবছি আর এক কথা। তিনি আর কোথাও চ'লে যাননি ত ?

মায়ালতার চোখ ছল ছল ক'রে এলো। বললে, তা হ'লে এই রাত্রে··· তিনি না থাকলে আমাদের জায়গাই বা দেবে কে ?

অনেক চিন্তার পর অমরেশ বললে, চলো আগে জমীদারের বাড়ী ওঠা যাক্। বেরিয়েছি যখন, তখন তাঁকে ধরবোই, কিন্তু আজ রাত্রে থাকার সম্বন্ধে—

শালের জঙ্গল পার হ'য়ে ফাঁকা জায়গায় গাড়ী এলো। ছইয়ের মধ্যে চাঁদের আলোর আভাস এসে পড়েছে। এমন সময় গাড়োয়ান বললে, নদীতে গাড়ী নামবে, সাবধান বাবু।

দুজ'নে শক্ত করে' গাড়ী ধ'রে রইল। গাড়ী গড়িয়ে নামল নদীতে। জল কম নয়, গোরুর গলা পর্য্যন্ত ডুবলো। খড়ের ফাঁক দিয়ে জল উঠল গাড়ীতে; দু'জনের কাপড় ভিজলো। দুর্য্যোগটা উপভোগ করলো দু'জনেই।

ছোট নদী পার হ'য়ে গাড়ী উঠে বলরামপুরের পথে পড়লো। দূরে একদল আলো দেখা যাচ্ছে। গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানা গেল, আজ ওখানকার বারোয়ারি তলায় গ্রামের যাত্রা হচ্ছে। চার পাঁচখানা গ্রামের লোক জড়ো হয়েছে। মায়ালতা বললে, মানুষের চিহ্ন দেখে বাঁচলুম। কি বলো কবি ?

অমরেশ হেসে বললে, ওটা আমার মত্ নয়।

কেন ?

তোমাকে নিয়ে জনহীন পৃথিবীতেও থাকা যায় কিন্তু গোরুর গাড়ী থেকে

নামলে আমি বাঁচবো। বাবারে, প্রাচীন ভারতের সভ্যতা আজ হাড়ে-হাড়ে উপলব্ধি করছি।

হাসিতে হাসিতে পথ মুখরিত হোলো। দূরের আলো তখন কাছে এসেছে, জনতার গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

বাগ্দিপাড়ার তাড়ির আড্ডা পার হয়ে গাড়ী এসে দাঁড়াল বারোয়ারিতলার কোলে। দু'জনে নামতেই তাদের চেহারা আর হাবভাব আর বেশভূষায় আকৃষ্ট হয়ে মেয়ে-পুরুষ এসে দাঁড়াল ঘিরে।

এটা বলরামপুর ত বটে?

এজ্ঞে। কা'কে চান্ আপনারা?

জমীদারবাবুকে। তাঁর নাম গোপেশ্বর সিংহী ত?

এজ্ঞে। আসুন আসুন, আপনারা যাত্তাতলায়। তিনারা আসবেন বোধায়।

একজন বললে, খবর পৌছেদে রাজাকে।

দু'জন ছুট্‌ল। অমরেশের সঙ্গে সঙ্গে মায়ালতা গেল বারোয়ারি তলায়। চুপি চুপি মায়ালতা বললে, তাঁর খবর নাও।

জনতা তাদের কাছে যুক্তকরে দাঁড়িয়ে। অমরেশ প্রশ্ন করলে, সুরপতিবাবুকে জানো তোমরা? ওই যিনি নতুন কাজ নিয়ে এসেছেন?

সবাই মুখ চাওয়াচায়ি ক'রে বললে, না এজ্ঞে, কই তাঁকে ত জানিনে? জমীদার বাবুর শালা?

ক্লিষ্ট ও চিন্তিত মুখে মায়ালতা অমরেশের দিকে তাকালো। ব্যর্থ হয়ে গেল বুঝি সব পরিশ্রম। অমরেশ বললে, না হে, তিনি নন। তাই ত যাঁকে চাই তিনি—

এমন সময় গোলমাল শোনা গেল, অতিথি আপ্যায়নের জন্য স্বয়ং রাজা আসছেন। সবাই পথ ছেড়ে দিয়ে দাঁড়াল। প্রজাদের রাজা জমীদার সবাই জানে। ওরাও দু'জনে বিনয় ও ভক্তি সহকারে দাঁড়িয়ে গেল।

কিন্তু যিনি এলেন তাঁকে দেখেই উৎফুল্ল উত্তেজনায় মায়ালতা এগিয়ে গেল।

সুরপতিকে চিন্‌তে তার মুহূর্ত্ত বিলম্ব হয়নি। কম্পিত কণ্ঠে হাসি মুখে বললে, আমরা এলাম আপনার এখানে। আপনি আমাকে না ব'লে যে চ'লে এসেছিলেন ?

আদর নেই, অভ্যর্থনা নেই, প্রশ্নের জবাব নেই, সুরপতি কেবল উপস্থিত সকলের দিকে একবার তাকালো। তারপর বললে, এখানে থাকবেন কোথায় ? উনি কে—?

উনি আমার কবি বন্ধু, অমরেশ।—মায়ালতা প্রাণপণ চেষ্টায় সহজ হতে লাগল। অমরেশ প্রথম দেখলে সুরপতিকে, চেহারায় কোথাও স্নেহের ছোঁয়াচ নেই, কেমন যেন নিরাসক্ত রুক্ষ পুরুষের রূপ। সে সবিনয়ে নমস্কার বিনিময় করলে।

আসুন আমার সঙ্গে।—ব'লে সুরপতি আগে চল্‌ল।

গোরুর গাড়ীর ভাড়া চুকিয়ে দু'জনে চল্‌তে লাগল সুরপতির পিছনে পিছনে। বুকভরা গর্ব্বের সঙ্গে এক সময়ে মায়ালতা বললে, আপনাকে এখানে সবাই রাজা বলে ?

এইবার সুরপতি কথা বললে, আমি ওদের সেবা ক'রে থাকি তাই ভালোবাসে।

অমরেশ হেসে বললে, অনেক দুঃখে আপনাকে পাওয়া গেছে, আপনাকে আমরা ছাড়বো না।

সুরপতি বললে, আসুন আমার ওখানে। মাটির ঘর, থাকতে একটু কষ্ট হবে। ব্যাগটা দিন্ আমার হাতে।

মায়ালতার কথা বলবার আর শক্তি নেই, কেবল অন্ধকারে চল্‌তে চল্‌তে অপরিসীম আনন্দে তার চোখে অশ্রু ভ'রে এলো।

আট

বারোয়ারিতলার আলো যতদূর পর্য্যন্ত দেখা যায় পথ চেনা গেল। তার-পরে সবই অন্ধকার। নিকটে শালের জঙ্গল সমস্ত গ্রামকে চারিদিক থেকে বেষ্টন ক'রে রয়েছে, সেদিকে জোনাকির ক্বচিৎ ক্ষণদীপ্তি ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। পথের পাশেই একটা পুকুর তারপরেই দুই চারিটা তাল সুপারী গাছ। হু-হু ক'রে বাতাস বয়ে চলেছে।

সুরপতির পথ চলাটাও নির্লিপ্ত। সামান্য দু'একটা কথা যা হয়েছে তার ভিতরে অতিথিগণের প্রতি শুষ্ক কর্ত্তব্যের আবেদন স্নেহের ছোঁয়াচ ছিল না বিন্দুমাত্র। তার যেন কোথায় প্রকাণ্ড পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে। অভ্যাগতদের আশ্রয় দিতে হবে এইটেই তার কাছে বড় কথা, তাদের সমাদর না করলেও চলবে। সে চলতে লাগল আগে আগে।

অমরেশের মুখে সাড়া নেই। তার ভালো লাগছে এই পথ চলাটুকু। সমাদর তার না পেলেও চলবে, তার আশ্রয় মিলে গেলেই সে খুশি। জীবনে নানা সমস্যার আলোড়ন আছে। আছে ভালোবাসার মান-অভিমান, আছে স্নেহের তারতম্য। কিন্তু আজকের এই ভ্রমণকাহিনী তার জীবনে অক্ষয় হয়ে রইল; সকাল থেকে রাত্রি—একটি সম্পূর্ণ দিন যেন হৃদয়ের অফুরন্ত মধুতে ভরা। একবার সে মায়ালতার দিকে চেয়ে দেখলে, কিন্তু কিছুই বোঝা গেল না। মেয়েদের চোখে নির্লিপ্ত সৌন্দর্য্যবোধ নেই, ব্যক্তিগত আনন্দ ও দুঃখের রঙে এই বিশ্বপৃথিবী তাদের দৃষ্টিতে হয় সুন্দর, নয় ত মরুভূমি। এ তাদের অপরাধ নয়, এই তাদের স্বভাবধর্ম্ম।

কাল অমরেশকে চ'লে যেতে হবে। যাবে সে কলকাতায় কিন্তু বেকার দিন তার কেমন ক'রে কাট্‌বে তা সে জানে না। আবাল্য সে নিঃসঙ্গ, কিন্তু সেই

নিঃসঙ্গতার চেহারা যে কত ভয়ানক এইবার গিয়ে তাকে উপলব্ধি করতে হবে। যে-ব্যথার সংবাদ সে জান্‌ত না, সেই ব্যথা জমল তার বুকে। মায়ালতাকে তার ভালো লেগেছে, মায়াদিকে সে ভালোবেসেছে—এতে অপরাধ কিছু নেই, এইটুকুই সংসারের সকলের চেয়ে সহজ। সেই ভালো লাগাটুকু রইল ওই জোনাকিদের দীপ্তিতে, রইল ওই বনরেখার অন্ধকারে, রয়ে গেল আজকের এই বিচিত্র পথ যাত্রার মাধুর্য্যের মধ্যে। মনে মনে সে প্রার্থনা করতে লাগল, কাল বিদায় নিতে যেন তার কষ্ট না হয়, বেদনা যেন তাদের স্বচ্ছন্দ বন্ধুত্বকে বিড়ম্বিত না করে।

এমন সময় মাথার উপরে গুরু গুরু মেঘ ডেকে উঠ্‌ল। আকাশে কখন্ মেঘের ঘন আয়োজন হয়েছে কেউই জান্‌ত না, তিনজনেই একটু চম্‌কে উঠ্‌ল। বিদ্যুদ্দীপ্তিতে দূরের মাঠ আর শালের জঙ্গল একবার জেগে উঠে পুনরায় অন্ধকারে তলিয়ে গেল। উঁচু-নীচু ডাঙার উপর দিয়ে তারা চলতে লাগল।

মায়ালতা এতক্ষণে কথা বললে—বৃষ্টি এলো দেখছি। আপনার বাসা কতদূরে?

এই যে এসে পড়েছি, ওই মন্দিরটার গায়ে।—সুরপতি বললে।

এখানে মন্দির আছে নাকি? অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

কিন্তু শরৎকালের বৃষ্টি। দেখতে দেখতেই ধারাপাত সুরু হোলো। দ্রুত চলবার উপায় নেই, অপরিচিত পথ। উঁচু নীচু কাঁকরের রাস্তা পার হয়ে তারা যখন মন্দিরের চৌহদ্দি পার হয়ে গেল, তখন বেশ ঝড়-জল আরম্ভ হয়ে গেছে। অমরেশের কোনো ব্যস্ততা নেই, দুর্য্যোগটুকু সে বেশ উপভোগ করতে লাগল।

মন্দিরের উত্তর দিকে একটা প্রাচীন বটগাছ। তারই নীচে এসে তিনজনে দাঁড়ালো। সুরপতি সেইখান থেকে হাঁক দিল, নটবর, ও নটবর!

দূর থেকে উত্তর এলো, আজ্ঞে, ক'ন?

আলোটা একবার আনো ত? এই যে আমরা এই বটতলায়।

হারিকেন-লণ্ঠন নিয়ে একটা লোক তাড়াতাড়ি ছুটে এলো। সুরপতি ওদের নিয়ে খামার পার হয়ে মাটির দালানে গিয়ে উঠ্‌ল। নটবর বললে, এরা কে, রাজা?

আমার আত্মীয়। কল্‌কাতা থেকে এসেছেন। ওই বড় ঘরটা খুলে দাও। আর একটা আলো জ্বালো।

আজ্ঞে।

রান্নার ব্যবস্থা হবে ত?

হবে বৈ কি, আজ্ঞে।

বেশ, আর দ্যাখো এঁদের সঙ্গে বিছানা নেই।

নটবর উৎসাহিত হয়ে বললে, বাবুর ঘর থেকে এখুনি সব এনে দিচ্ছি।

আর একটা আলো জ্বেলে রেখে যে যখন খাবার উদ্যোগ করছে, মায়ালতা তখন বললে, এই বৃষ্টিতে ও যাবে কতদূরে?

এ আর কি বৃষ্টি মা, এই যাবো আসবো। আপনারা রাজার লোক, উনি আমাদের দেবতা। এই বলে' নটবর দ্রুতপদে অন্ধকারে নেমে চ'লে গেল।

ঘরখানার মেঝেটা চাটাই বিছানো, কিছু কিছু আসবাব-পত্রও আছে। একধারে কতকগুলো খাতাপত্র জড়ো করা, তার পাশে হুঁকা ও তামাকের সরুঞ্জাম। ঘরখানা মন্দ নয়। মায়ালতা বললে, আপনি থাকেন এখানে?

সুরপতি বললে, না, এটা অপিসঘর, বাইরের লোকজন এখানে বসে।

অমরেশ বললে, আপনার কাজকর্ম কে করে সুরপতিবাবু?

নিজেই করি, তবে ওই নটবরের বৌ-ছেলে-মেয়ে আছে, ওরাও কিছু কিছু সাহায্য করে। একটা মানুষের ঝঞ্ঝাট নেই।

অমরেশ সাহস সঞ্চয় ক'রে বললে, আমি যদি আপনার ব্যক্তিগত কথা জিজ্ঞাসা করি তাহলে কিছু মনে করবেন?

সুরপতি হাসি মুখে বললে, কি বলবেন বলুন?

অমরেশ একবার মায়ালতার দিকে তাকালো। পরে প্রশ্ন করলে, আচ্ছা বলুন ত, এখানে আপনার কী কাজ?

কাজ নানা রকম। ওর কি আর শেষ আছে? প্রধানত গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি, শিক্ষা বিস্তার, চাষী ও জমিদারের উন্নতি, শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা—এইসব।

অমরেশ বললে, আপনি কলকাতার ধনী পরিবারে চিরদিন মানুষ, সহরের সভ্যতা ও রীতিনীতি আপনার রক্তে, এই পল্লী-জীবনের মধ্যে নিজের আত্মবিলোপ কি আপনার সহ্য হবে?

মায়ালতা আগ্রহান্বিত দৃষ্টিতে স্থরপতির দিকে তাকালো। আলোটা পড়েছে স্থরপতির মুখে। রঙটা তার কিছু মলিন হয়েছে, কিন্তু এই কয় মাসে স্বাস্থ্য গেছে ফিরে। চোখ দুটো টানা, উঁচু নাক, কপালের উপরে কালো চুলের গোছা, ওষ্ঠের দুইদিকে কালো টানা গোঁফ—সমস্ত মুখখানায় তারুণ্য টস্‌-টস্‌ করছে। অচপল সংযমে তার চেহারাটা প্রশান্ত। এমন মানুষকে কাছে বসিয়ে নিবিড় ক'রে দেখতে সাধ যায়। পুরুষরা যে মেয়েদের কত প্রিয়, কত লোভনীয়, তা ওরা কোনদিনই জানতে পারে না। মায়ালতা যেন তার সকল ইন্দ্রিয় রুদ্ধ ক'রে কেবল চোখ দুটি খুলে রাখল।

স্থরপতি শান্তকণ্ঠে অমরেশের প্রশ্নের জবাব দিয়ে বললে, যদি সহ্য না হয় তবে ফিরে যেতে হবে অমরেশবাবু।

কণ্ঠ তার কোমল, কিন্তু দৃঢ়তায় ভরা। এখানে আর বিতর্ক তোলবার কিছু নেই, তাকে উপলব্ধি ক'রে বুঝতে হবে তার গভীর আদর্শটা।

মায়ালতা এইবার প্রশ্ন করলে, চিরদিন আপনি এখানে থাকতে পারবেন? আত্মীয়-পরিজন কাউকে টানবেন না?

স্থরপতি তার মুখের দিকে তাকালো। বললে আপনি সবই জানেন। মনে করছি আমি আর ফিরবো না। একটা কথা আপনাদের বলা হয়নি, স্থরেশবাবুর কাছে আমি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ, তাঁর জন্যেই আমি এই কাজে আসতে পেরেছি, তাঁকে আমার নমস্কার জানাবেন।

কটুকণ্ঠে মায়ালতা বললে, নমস্কার আপনি জানাবেন, আমার অন্য কাজ আছে। যদি একটু আগেও জানতুম আমি, এ-কাজ নিয়ে আপনাকে আসতে দিতুম না। আপনাকে ফিরে যেতে হবে সুরপতিবাবু।

শ্রোতা দুজনেই হেসে উঠলো। অল্পবয়স্কা বালিকার মতো গলার আওয়াজে জিদ্‌টাই প্রকাশ হয়ে পড়লো, তার মধ্যে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা নেই। সুরপতি বললে, বেশ ত, ফিরিয়ে নিয়ে চলুন না। কিন্তু বারো কোশ পথ বলতে পারেন।

মায়ালতা বললে, সংসারে কি আর কোনো কাজ নেই? লেখাপড়া শিখে কি আপনি চাষা আর গরু ঠেঙাতে চান্? এই কি আপনার যোগ্য কাজ?

এমন সময় নটবর কতকগুলি বিছানা নিয়ে এসে দাঁড়াল। পিছনে দরজার পাশে আলো হাতে তার স্ত্রী দাঁড়িয়ে। সুরপতি বললে, একধারে তুমি রেখে যাও নটবর দরকার মতো ওঁরা বিছিয়ে নেবেন। রান্নাটা আগে চড়িয়ে দাও।

বিছানাগুলি রেখে নটবর যখন বেরিয়ে চ'লে গেল, মায়ালতা বললে, রান্নার জায়গা দেখিয়ে দিন্, আমি রাঁধতে পারব।

সুরপতি বললে, আপনারা কি ওদের হাতে খাবেন না?

খেতে আপত্তি নেই, তবে নটবর কি পারবে? আপনারো ত খাওয়া হয় নি। রাত্রে কি খান্?

আমি সূর্য্যাস্তের পর আর খাইনে। আপনারা বসুন ওর স্ত্রী আছে, সব যোগাড় ক'রে দেবে। আচ্ছা, অন্য কথা থাক্, এবার আপনাদের কথা বলুন। অমরেশবাবু, আপনি কি করেন?

অমরেশ হেসে বললে, বেকার!

তবে আসুন না আমাদের এখানে, একসঙ্গে কাজ করা যাক্।—সুরপতি বললে।

অমরেশ বললে, ছাগলকে দিয়ে যব মাড়ানো যায় না। আমার

স্বভাবধর্মে নেই মানুষের সমাজের শ্রীবৃদ্ধি করা। তুলি দিয়ে ছবি আঁকতে পারি, কলমে লিখতে পারি কবিতা। আপনি যদি রাজা বিক্রমাদিত্য হতেন তবে উজ্জয়িনীর প্রান্তে কাননঘেরা বাড়ী চেয়ে নিতুম। মায়াদির উদ্দেশ্যে পাঠাতুম মেঘদূতকে।

ভ্রূভঙ্গী ক'রে মায়ালতা বললে, কত সাধ যায় রে চিতে! মায়াদি তার বদলে পুলিশে নালিশ ঠুকে দিতো।

অমরেশ প্রতিবাদ ক'রে বললে, কেন আমি যদি সুরপতিবাবু হোতুম তা'হলে তুমি আমাকে ভালবাসতে পারতে না?

থামো। যাও, আড়ালে সিগ্রেট খাওগে।—মায়ালতা তাকে ধমক দিল।

অমরেশ হেসে বাইরে উঠে গেল। তখনকার বৃষ্টি এখনো থামেনি, বিদ্যুদ্দীপ্তির সঙ্গে মেঘের ডাক এখনো চল্‌ছে। এই বৃষ্টি কাল সকাল পর্য্যন্ত থাকলে অমরেশের যাওয়া কঠিন হবে। বাইরে এসে তাকে দাঁড়াতে দেখে নটবর এসে তাড়াতাড়ি তাকে একখানা বসবার চৌকি দিয়ে গেল। নটবরের স্ত্রী রেখে গেল একটা হারিকেন্। অমরেশ চৌকির উপরে ব'সে ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট ধরালে।

ঘরের ভিতরে সুরপতি আর মায়ালতা মুখোমুখি ব'সে রয়েছে। মায়ালতা যেন তার সকল খেই হারিয়ে ফেলেছে। এক সময়ে সে বললে, এই ছেলেটি বড় ভালো।

সুরপতি বললে, আমি আগে এঁকে দেখিনি।

মায়ালতা বললে, গতবার সরস্বতী পূজোর সময় ইস্কুলে মেয়েদের গান হয়, সেই গান অমরেশ রচনা করে। সেই থেকে আমার সঙ্গে আলাপ। মিষ্টি স্বভাব, ভদ্র মন, এমন একটি ছেলে সচরাচর চোখে পড়ে না।

সুরপতি বললে, স্কুলের চাক্‌রী আপনার কেমন লাগছে?

ও-চাকরি আমি ছেড়ে দিয়ে এলুম। ওখানে অনেক উৎপাত। সুরেশবাবুর ব্যবহার আমার ভালো লাগে না।

সুরপতি চুপ ক'রে রইল। এ সম্বন্ধে তার কিছু বলবার নেই, এটা তার নিজের কোনো সমস্যা নয়। তা ছাড়া সামান্য দু'একটি অভিজ্ঞতায় মেয়েদের সকল কথার প্রতি গভীর বিশ্বাস সে হারিয়ে ফেলেছে। এক সময়ে মুখ তুলে কেবল বললে, এখন তবে কী করবেন?

মায়ালতা বললে, কী আর করব, সংসারে একজনের আর ভাবনা কি! এই ধরুন না, এখন আপনার কাছেই আপাতত এসে পড়া গেল। আপনার নাম ত বাস্তা শুনলুম, আপনার কাছ থেকে কি আর খালি হাতে ফিরে যাবো?

সুরপতি মুখখানা ফিরিয়ে নিলে। তার মুখের রেখায় কোনো সৌজন্য কোনোরূপ অভ্যর্থনার চিহ্ন ফুট্‌লো না এ যেন শোনবার মতো একটা কথাই নয়। মায়ালতা অপ্রতিভ বিবর্ণ মুখে চুপ ক'রে গেল।

দু'জনেই নীরব, কিন্তু মায়ালতার মনের ভিতরে যেন গভীর লজ্জা কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে। সমস্ত পথটায় যে-আগ্রহ, যে-ব্যাকুলতা, যে-অপরূপ রসের নেশায় বিভোরচিত্ত হয়ে সে ছুটে এসেছে, এখন দেখা গেল তার অনেকখানিই যেন মেয়েলি হঠকারিতায় ভরা; তার বিসদৃশ দিকটা অনেকের চোখেই খারাপ লাগবে।

হঠাৎ সে যেন উষ্ণ হয়ে উঠ্‌ল। বললে, আপনি এখানে ব'সে যোগ-তপস্যা করেন?

কেন বলুন ত?—সুরপতি বললে।

আমার তাই মনে হচ্ছে,—গেরুয়া-টেরুয়াগুলো গেল কোথায়? আপনার ধরণধারন রামকেষ্টবাবাজির চেলাকেও হার মানিয়েছে!

কেন?

মেয়েমানুষের মুখের দিকে চেয়ে কথা বলতেও দেখছি আপনার আপত্তি। এ কথা মনে রাখবেন, সত্যি যারা কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করে, মানুষের সমাজে তাদের আর কিছুই দাম নেই, তারা বাতিল, তারা জঞ্জাল। এই দুটি বস্তু যতক্ষণ আপনার জীবনকে জড়িয়ে থাকে, ততক্ষণই সংসারের

ভালোমন্দর মধ্যে চলাফেরার অধিকার। আপনি আমাকে অগ্রাহ্য করতে পারেন সুরপতিবাবু, কিন্তু নিয়মের কাছে আপনাকে মাথা হেঁট করতেই হবে।

সুরপতি মৃদুকণ্ঠে বললে, আপনার সঙ্গে তর্ক ক'রে আমার কী লাভ? আমার নিজের কাজ আমি জানি।

মায়ালতা বললে, তাহ'লে ফিরে আপনি যাবেন না?

ফিরে যাবো ব'লে আমি আসিনি। একটার পর একটা কাজ চেখে বেড়ানো আমার রুচি নয়। আমি ঠিক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি।

মায়ালতা কি যেন বলতে যাচ্ছিল, এমন সময়ে কতকগুলি লোক এসে দাঁড়াল। সুরপতি উঠে গিয়ে দাঁড়াতে বললে, রাজা, জলঝড়ে যাত্রা বন্ধ হয়ে গেছে, কোথায় গিয়ে আসর পাতবো?

সুরপতি বললে, খবর ত পাঠিয়েছি, কাছারি বাড়ীর বড় দালানে বসাও গে। নিরঞ্জন, তুমি গিয়ে ব্যবস্থা ক'রে দাও।

তারা খুশী হ'য়ে চলে গেল। কিন্তু একজন রইল দাঁড়িয়ে। সে বললে, কাল কি আপনি যাবেন রায়চুড়ে? দেহাতিরা জঙ্গল কাটতে যাবে, জমীদারের বারণ শুনবে না। বলেছে, যে বাধা দিতে আসবে তাকেই কাটবে। রাজা, ওরা বড় হিংস্র লোক। ময়ূরভঞ্জে সবাই ওদের ভয় করে।

সুরপতি হেসে বললে, কাল যাবো, তোমরা প্রস্তুত থেকো।

সে লোকটা চ'লে গেল। মায়ালতা ব্যস্ত হয়ে বললে, কাল আপনি কোথায় যাবেন?

সুরপতি বললে, একখানা তালুকে, তার নাম রায়চুড়। আবাদ তেমন কিছু নেই, কেবল জঙ্গল। দেহাতিরা বলে, ও জঙ্গলে তাদের দখল আছে, তারা এখানে পুরুষানুক্রমে কাঠ কাটে—এ নিয়ে জমিদারের সঙ্গে ঝগড়া। আমি জমিদারের লোক, সুতরাং আমার সঙ্গেও তাদের শত্রুতা।

আপনি গেলে যদি আপনার বিপদ ঘটে?—মায়ালতা চিন্তিত হয়ে বললে, শুনলুম, তারা যে অতি হিংস্র লোক!

হিংস্র মানে সরল। তারা জানে না তাদের অধিকার কতটুকু। সেটুকু তাদের সহজ ক'রে বুঝিয়ে দিতে হবে। বুঝতে পারা না পারার মধ্যে যত বিরোধ। প্রতিপক্ষকেই তারা চিরদিন জানে, জমীদারকে তারা কখনো আপন ভাবতে পারেনি, তাঁদের গিয়ে জানাতে হবে আমরা তাদের বন্ধু।

একথা যদি তারা না বোঝে ?

এর নামই ত কাজ। সুরপতি বললে, এই কাজের জন্যে অসীম ধৈর্য্যের দরকার। এ যাদের নেই, তারা যেন গ্রামে না আসে। এই যোগ্যতার যাদের অভাব, তারা যেন শিক্ষার বড়াই না করে।

মায়ালতা বললে, তারা কি নিজের ভালো বুঝতে পারে না ?

না। তা'হলে কাজ সহজ হোতো। ঐক্যই যে শক্তি, ঐক্যই যে কল্যাণ—একথা কোনোকালে তারা শোনেনি। তারা কেবল জানে গ্রাসাচ্ছাদন, টিঁকে থাকা। তাদের পাশে দেশ আছে, মানুষ আছে, সমাজ আছে, তাদের নিজেদের জীবনের পরম মূল্য আছে—এমন কথা তাদের কেউ বলে না।

মায়ালতা বললে, এই বলরামপুরের জমীদার কেমন লোক ?

লোক ভালো, বলরামপুরের সঙ্গে তাঁর সংস্রব নেই, তিনি থাকেন কল্‌কাতায়। তিনি প্রজাদের ওপর কোনো অত্যাচার করেন না, কিন্তু টাকা চান্। কেমন ক'রে টাকা আসে এ তিনি জানেন না, তিনি জানেন না তাঁর জমিদারীর অবস্থা কেমন। এদের সঙ্গে তাঁর নাড়ীর সম্পর্ক নেই।

এর ম্যানেজার কে ?

সুরপতি বললে, ম্যানেজারও থাকেন কল্‌কাতায়। আসেন এখানে মাঝে মাঝে। প্রজারা তাঁর ওপর চটা। তারা জমিদারকে চোখে দেখেনি, দেখেছে ম্যানেজারকে। ম্যানেজার যান্ তাদের শোষণ করতে—তারা মনে করে, শত্রু এলো।

মায়ালতা বললে, আপনাকেও তারা বন্ধু মনে করবে না !

করবে। সেই আমার কাজ। তারা বন্ধু ভাববে এমন ব্যবহারই

আমি করব। তাদের বোঝাতে হবে—আমি তাদেরই একজন, তারাই হবে আমার অন্নদাতা, আমিই তাদের সেবক।

মায়ালতা চুপ করে' রইল। কিয়ৎক্ষণ পরে বললে, এর মধ্যে আমাকে কি কোনো কাজ আপনি দিতে পারেন না?

আপনি কি করতে পারেন?

এদের মেয়েদের মধ্যে আমি শিক্ষা প্রচার করব।

আপনার কী পরিচয়?

সে পরিচয়ের ভার আপনি নেবেন না?

সুরপতি বললে, আপনার কথার অর্থ আমি বুঝি নে। এটা গ্রাম, যাদের নিয়ে কাজ তারা অশিক্ষিত, আপনাকে সহজে গ্রহণ করবার মতো মন তাদের এখনো তৈরী হয়নি। তা ছাড়া আপনি এখানে কেমন ক'রে বাস করবেন?

মায়ালতা বললে, আপনি আমাকে সাহায্য করবেন না?

সুরপতি মাথা নীচু ক'রে রইল। অনেকক্ষণ পরে মাথা তুলে বললে, সম্ভব নয়।

নটবর এসে দরজার কাছে দাঁড়ালো। বললে, রাজা, খাবার দেওয়া হয়েছে।

সুরপতি নিজেই আগে উঠে দাঁড়াল। বললে, হাত পা ধোবার জল দাও।

দেওয়া হয়েছে, আজ্ঞে।

মায়ালতার অনেকখানি উৎসাহ ক'মে গিয়েছিল। ভারাক্রান্ত মনে উঠে সে বাইরে এলো। দেখলে চৌকীতে ব'সে দেয়ালে মাথা হেলান দিয়ে অমরেশ ঘুমিয়ে পড়েছে; বেচারি সারাদিনে পরিশ্রান্ত। সে গিয়ে অমরেশের কপালে হাত দিয়ে সস্নেহে ডাকল, কবি?

অমরেশ তাকাল। মায়ালতা হেসে বললে, এসো আমি তোমাকে হাতে ক'রে খাইয়ে দেবো।

অমরেশ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল।

শরৎকালের বৃষ্টি। চারিদিক ইতিমধ্যে কখন পরিচ্ছন্ন হয়ে গেছে। কিয়ৎক্ষণ আগেকার আকাশ-প্রান্তরব্যাপী দুর্যোগ—সে যেন কোন্ অতীতকালের, তার আর চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। শুক্লপক্ষের কোনো একটা তিথি হবে, পশ্চিম দিকে চাঁদ উঠে দাঁড়িয়েছে। হয়ত পূজা আসতে আর বিলম্ব নেই, মহালয়ার কথাটা সে শুনে এসেছিল, আজই হয়ত সেই মহাপঞ্চমী। আসবার সময়ে অন্ধকারে পথের কোনো রেখাই চোখে পড়েনি, এতক্ষণে অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় মন্দিরের গায়ে সেই বটগাছটা দেখা যাচ্ছে—ওই পথটা হয়ত সেই বারোয়ারিতলায় গিয়ে মিশেছে। যাই হোক, সকাল না হ'লে আর কিছুই স্পষ্ট ক'রে জানা যাবে না।

আহারাদির পর ঘুমজড়ানো চোখে অমরেশ বললে, অচেনা জায়গা, আমার ভয় করে। আমি তোমার কাছে শোবো, মায়াদি।

মায়ালতা হেসে বললে, ওমা, তাই কি হয়? এ কি রামরাজত্ব।

তবে আমি সুরপতিবাবুর কাছে শোবো।

উনি কোথায় শোবেন, কেমন ক'রে জানব? এই ত উনি বারোয়ারিতলায় বেরিয়ে গেলেন। রাত হয়ত এখন প্রায় বারোটা হবে। তোমার বুঝি ঘুম পেয়েছে?

খুব। তুমি ব'সে থাকো তোমার প্রিয়তমর জন্যে, আমি চললুম, ওই ঘরে শুইগে।

মায়ালতা হেসে বললে, আচ্ছা যাও, দরকার হ'লে তোমাকে ডেকে অন্য জায়গায় শোয়াবো।

অমরেশ চ'লে গেল। মায়ালতা একখানা বই খুলে ব'সে রইল। নটবর আর তার স্ত্রী তাদের ঘরে গিয়ে ঢুকেছে।

অমরেশ একটা ঘরে এসে ঢুকল। আলো জ্বলছে। ঘরের চারিদিকে নানারকমের বই কাগজ। একপাশে একটা বিছানা, তার উপর ময়লা

একটা মশারি। এক ধারে কতকগুলো কাপড় জামা জড়ো করা। বিছানার পাশে একখানা ছোট চৌকীর উপর কতকগুলি লেখাপড়ার সরঞ্জাম। যেমন অগোছালো, তেমনি বিশৃঙ্খলা। এই লোকটার হাতে যে এত বড় জমীদারির এতখানি দায়িত্ব, তা এই অপরিচ্ছন্ন ঘরখানির ভিতরে এসে দাঁড়ালে কিছুতেই বোঝবার উপায় নেই।

নানারকমের বই। পড়াশুনো সুরপতির প্রিয়, এ কথা অমরেশ আগেই শুনেছে। সে সংসারী মানুষ নয়, তার চিন্তা ভিন্ন পথ ধ'রে চলে, জগতের কিছুর প্রতিই তার আগ্রহ নেই, আকর্ষণ নেই, এই অল্প সময়টুকুর ভিতরেই অমরেশ লক্ষ্য করেছে! কোথায় সে যেন পাথরের মতো কঠিন, বরফের মতো শীতল,—তার মনের চাঞ্চল্য দেখা যায় না। এমন মানুষের কাছে স্নেহের আশা করা বিড়ম্বনা। তার চরিত্রে কোথাও ছিদ্র নেই, যেন একটা নিরেট পাথরের তৈরী দুর্ভেদ্য দুর্গ। অতিথিরা এসেছে, তার জন্ম বিশেষ অভ্যর্থনা নেই; এখনই যদি চ'লে যায় তবে কিছুমাত্র ভাবান্তর দেখা যাবে না।

বিছানার উপর অমরেশ শুয়ে পড়ল। মাথার বালিশের কাছে কতকগুলি ইংরেজি ও বাংলা বই ছড়ানো। সেগুলোর মধ্যে কোনোখানাই নাটক, নভেল অথবা কবিতার বই নয়, প্রত্যেকখানিই ধর্মপুস্তক, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান ইত্যাদি। বইগুলি যেন পাঠকের চরিত্র-গাম্ভীর্য্যের নিরন্তর সাক্ষ্য দিয়ে চলেছে। অমরেশ বইগুলো গুছিয়ে একধারে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করতেই ভিতর থেকে একখানা খোলা চিঠি বেরিয়ে এলো। চক্ষের নিমেষে দেখা গেল, চিঠির হাতের লেখাটা পরিচিত। পরের চিঠি পড়া অমরেশের অভ্যাস নয়, তবু লোভ সামলানো কঠিন হোলো। এঘরে এখন কারো আসা সম্ভব নয়। খোলা চিঠিখানির উপর সে চোখ বুলোতে লাগল। চিঠিখানা সুরেশবাবুর লেখা।

"প্রিয় সুরপতিবাবু, আমার আগের চিঠি এতদিনে পাইয়া থাকিবেন।

মনে করিয়াছিলাম, আপনাকে বলিবার দরকার নাই। কিন্তু এদিকে যে দুর্নীতি চলিতেছে, তাহা আপনাকে না জানাইয়াও থাকা যায় না। আপনি থাকিতে থাকিতেই আমার প্রতি তাঁহার যে লক্ষ্য পড়িয়াছিল, তাহা আপনাকে জানাইয়াছি। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মেয়েরা এইরূপই হইয়া থাকে। তাহাদের বাদবিচার নাই, ছোট বড় জ্ঞান নাই। তাঁহার চরিত্র এখনকার 'তরুণ সাহিত্যের' নায়িকাকেও হার মানাইয়াছে। সেদিন 'সুনীতি-সঙ্ঘের' এক অধিবেশনে আমি বক্তৃতা দিয়া এইরূপ তরলমতি যুবক-যুবতীর চরিত্র-বিশ্লেষণ করিয়াছি।

প্রকাশ করিতে লজ্জা করে, একদিন আপনার প্রতি মায়ালতার গভীর আসক্তি দেখিয়াছি, অথচ সেই একই সময়ে আমার প্রতিও তাঁহার অকারণ পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য করিয়াছি, কিন্তু সম্প্রতি অমরেশ নামক একটি বাউণ্ডুলে বেকার যুবকের সহিত তিনি যে অসৎ সম্পর্ক পাতাইয়া স্থানে অস্থানে দিনরাত কাটাইতেছেন, তাহা আপনাকে না জানাইয়া রাখিলে আমার অধর্ম্ম হইবে। আশা করি, ইহার বেশি আপনাকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে না।

'কাজকর্ম্ম কেমন চলিতেছে? কুশলদানে সুখী করিবেন। প্রীতি নিন্।

ইতি—

আপনাদের

সুরেশচন্দ্র'

অমরেশের চোখের তন্দ্রা ছুটে গেল। মনে হোলো, আলোটা যেন রক্তের মতো লাল। ঘরখানা দুলছে, বিছানার ভিতরে অসংখ্য হিংস্র সর্প যেন কিলবিল করছে। বাইরের সমস্ত অন্ধকার রাত যেন লক্ষ লক্ষ দানবের মতো তার ঘরের মধ্যে ঢোকবার চেষ্টা করছে। অমরেশের দম বন্ধ হয়ে এলো।

এত বড় অন্যায় মানুষ অবাধে ক'রে যাবে? এত বড় মিথ্যাকে নির্ব্বিচারে দেবে প্রশ্রয়? এর কি কোনো প্রতিবিধান নেই? অমরেশ

বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল। চিঠিখানা মুঠোয় নিয়ে সে বাইরে এলো। নিঃসাড় রাত্রি—অদূরে প্রকাণ্ড গাছটার পাশে পশ্চিম দিকে শুক্লপক্ষের চন্দ্র অস্তে নেমেছে। আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র বিমূঢ় বিস্ময় নিয়ে তার দিকে চেয়ে রয়েছে। এই পৃথিবীর বিষাক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নেবার অভিরুচি আর অমরেশের নেই।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে মায়ালতার ঘরে এসে সে ঢুকল। আলো জ্বলছে। তারই পাশে একখানা বই হাতে নিয়ে মায়ালতা ঘুমে নেতিয়ে পড়েছে। ঘুম কি সে ভাঙাবে? না, ঘুম ভাঙিয়ে এত বড় আঘাত দেবার সাহস অমরেশের নেই। আলোটা একটু কমিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে দরজাটা ভেজিয়ে অমরেশ আবার চ'লে গেল।

এর প্রতিশোধ সে নেবে। মানুষকে হিংসা করা তার স্বভাব নয়—কিন্তু প্রতিহিংসা তাকে নিতেই হবে। সে কবিতা লেখে, ছবি আঁকে মধুরের সাধনায় কাটে তার দিনরাত; কিন্তু সে দুর্ব্বল নয়, তার ভিতরে আছে শক্তিমান্ পুরুষ—সেখানে আঘাত করলে প্রতিঘাত আসে। সুরেশবাবুকে উপযুক্ত শিক্ষা না দিয়ে তার আর স্বস্তি নেই।

মাটির দালানের উপর পিঞ্জরাবদ্ধ জন্তুর মতো অমরেশ পায়চারি ক'রে বেড়াতে লাগল।

ভোরবেলা এসে পৌঁছল সুরপতি। রাত্রে সে ফেরে নি; কারণ এখানে রাত্রি অতিবাহিত করা তার পক্ষে আপত্তিকর ছিল।

স্নান সেরে পরিচ্ছন্ন দেহে সে যখন এসে দাঁড়াল, তখনো মায়ালতা ঘুম থেকে ওঠেনি। নটবর মাঠের দিকে কাজে বেরিয়েছে, তার স্ত্রী ঘর দোর পরিষ্কার করতে লেগেছে।

সকালের আলো ঘরে এসে ঢুকতে মায়ালতা উঠে বসলো। সুমুখেই

সুরপতি ছিল দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞাসা করলে, রাত্রে ঘুম হয়েছিল? বিছানা পাতেন নি কেন?

মায়ালতা বললে, মনে করেছিলুম আপনি ফিরবেন। ফিরলেন না যে?

সুরপতি বললে, আমি কাছারীবাড়ী শুতে গিয়েছিলুম। অমরেশবাবু কোথায়?

আপনার ঘরে, ঘুমোচ্ছে। ডেকে দিন, সকালের গাড়ীতে ওর যে যাবার কথা।

সকালের গাড়ী চ'লে গেছে ভোর সাড়ে পাঁচটায়। আবার গাড়ী যায় বেলা দুটোয়। কৈ আমার ঘরে অমরেশবাবু নেই ত?

তা'হলে মুখ ধুতে গেছে; আসবে এখুনি।—ব'লে মায়ালতা বাইরে বেরিয়ে এলো। নূতন দেশ, নূতন আলো। পাখী ডাকছে চারিদিকে শালবনে বইছে হাওয়া। সে উচ্ছলিত আনন্দে ব'লে উঠ্‌ল পাড়াগাঁ কী সুন্দর আমার আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না।

কিন্তু অমরেশের কোনো চিহ্ন নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল সে ফিরল না। শেষ কালে সুরপতির বিছানার বালিশের কাছে এক চিঠি পাওয়া গেল। অমরেশ লিখে গেছে—

মায়াদি, ক্ষমা ক'রো, তোমাকে না ব'লেই চ'লে যাচ্ছি। কারণ জানাতে পারব না, একদিন তুমি নিজেই জানবার চেষ্টা ক'রো। তোমার সঙ্গে আমার দেখা না হয় এই আমার ইচ্ছে। সুরপতিবাবুর ঘর থেকে পাঁচটা টাকা নিয়ে যাচ্ছি, গিয়ে পাঠিয়ে দেবো। তুমি চিরদিন শান্তিতে থেকো এই কবির প্রার্থনা। ভালবাসা নিয়ো। ইতি—

তোমার আমরণ-বন্ধু,

অমরেশ

চিঠিখানা হাতে নিয়ে স্তম্ভিত হয়ে মায়ালতা দাঁড়িয়ে রইল। কিছুই সে বুঝতে পারলে না।

নয়

জীবনযাত্রার পদ্ধতিটা সম্পূর্ণ বদ্‌লে গেছে। নটবর ও তার স্ত্রীর সংসারে প্রায় তিন মাস কাট্‌লো। কল্‌কাতার স্কুল থেকে একখানা চিঠি এসেছিল—পুনরায় কাজে যোগদান করার অনুরোধ নিয়ে, মায়ালতা তার কোনো জবাব দেয়নি। স্কুল-কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধটা গৌণ, সুরেশবাবুর ইসারাটাই সে-চিঠির আসল কথা। কিছুদিন পরে মোটা টাকার একটা মণি-অর্ডার এলো। টাকাগুলি মায়ালতা রেখে দিয়েছে খরচ করার কোন অজুহাত পাওয়া যায় নি। অমরেশও যথাসময়ে টাকা পাঠিয়েছিল; কিন্তু কুপনে সে কিছু লেখেনি। মায়ালতা চিঠি দিয়েছিল, জবাব আসেনি। অর্থাৎ প্রায় তিন মাস হ'লো, পৃথিবীর সঙ্গে তার একরকম সম্পর্ক ঘুচে গেছে।

নূতন ছাঁচে নিজেকে ঢেলে বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী ক'রে তৈরী করার অসাধারণ কৃতিত্ব মেয়েদের। মায়ালতার পরিবর্ত্তন ঘটেছে তার নিজেরই অজ্ঞাতে। তিনটি মাসের ভিতরেই জানা গেল, নটবরের স্ত্রীর সঙ্গে তার মূলত কোনো প্রভেদ নেই। আচার ব্যবহার তার এই পারিপার্শিকেরই উপযুক্ত। সাজসজ্জায় সে গ্রামের মেয়ে। রূপের দিক থেকে তার অসাধারণত্ব গ্রাম্য সাজসজ্জায় চাপা প'ড়ে গেছে। গ্রামের মাটির ছোঁয়াচ লেগেছে তার সর্ব্বাঙ্গে। ছেলেমেয়েদের সে মাসী, পাড়ার লোকের সে দিদিমণি। পুকুঘাটে গিয়ে সে স্নান ক'রে আসে, মন্দিরে গিয়ে বিশ্বেশ্বরের পূজায় বসে! একখানা ঘর তার নিজস্ব। নটবর তার স্ত্রীর কাছে হাসি মুখে ব'লে দিদিমণি আমার লক্ষীছিরি এনে দিয়েছে।

নটবরের স্ত্রী বলে, আমার বুন্, মনে নাই?

নটবর বলে, আমার দিদি।

মায়ালতা হেসে তাদের ঝগড়া থামিয়ে দেয়।

এমনি ভাবে দিন-যাপনের ভিতরে আছে নারীর মনের একটি তপস্যা। একটি মানুষকে কেন্দ্র ক'রে তার যত আগ্রহ আর উৎসাহ। মধুর অবকাশ তার চারিদিকে ছড়ানো; অদ্ভুত আত্মবিস্মৃতির ভিতর দিয়ে তার আহার বিহার নিদ্রা আর জাগরণ। দিক্‌নির্দেশের কাঁটার মতো একটা বিশেষ দিকেই থাকে তার মনের প্রত্যাশা। দিন কাটে, রাত্রি কাটে কেমন রহস্যময় যন্ত্রণায়; তার মধ্যে আনন্দ আছে এমন কথাও বল্‌ব।

সুরপতির বাসা এখান থেকে তুলতে হয়েছে। যেদিন থেকে জানা গেল, এখান থেকে যাবার আগ্রহ মায়ালতার নেই, সুরপতি সেইদিনই গেছে কাছারী বাড়ীতে। সেখানে তার থাকার অসুবিধা নেই। এ গ্রামে প্রতিষ্ঠা তার দৃঢ়, কিন্তু গ্রামের নীতির দিকে তার কড়া নজর। আধুনিক কালের সহজ মেলামেশা গ্রামের শিক্ষার ধারায় খাপ খাবে না—একথা সে জানে। গ্রামের সকলের কাছে তার চরিত্রটা আদর্শ, অতএব নিজের পরিচয়কে খাঁটি না রাখলেই চলবে না। এ বাড়ীতে সে জলগ্রহণ করা বন্ধ করেছে। মায়ালতা তার এই ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ ক'রে খুশী হয়েছে।

মনের চেহারাটা রাত্রির অন্ধকারে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সকল কাজ সেরে নিজের ঘরে এসে সে যখন বিছানায় বসে, তখন সে ভাবে, এ বাড়ীতে তার থাকার অধিকার কোথায়? যে বস্তু সে চাইছে, তার কতখানি তার পক্ষে পাওয়া সম্ভব? পাওয়ার অভ্যাস কিছুই নেই, আশ্বাসও নেই; কেবলমাত্র দুরাশা নিয়ে বেঁচে থাকাটাই কি তার চরম লক্ষ্য? ভালোবাসাটাই জীবনে একমাত্র বড় কথা নয়। যদি না থাকে সম্মান, যদি না থাকে সুখে দুঃখে ভালোয় মন্দয় একান্ত দায়িত্ববোধ—তবে কোথায় কে কবে সুখী হ'তে পেরেছে? মেয়েমানুষ জানে নিরাসক্তির চেহারাটা কী নিষ্ঠুর, বৈরাগ্য তাদের হৃদয়কে কী উৎপীড়ন করে!

নিজের জীবনের অপরিসীম অভাবটা তার চোখে পড়ে। বাল্যকাল থেকে সুখের চেহারা তার জানা নেই। একটা অদ্ভুত বেদনা যেন তাকে

চিরদিন সক্রিয় ক'রে রেখেছে। মনের তৃপ্তি সে খুঁজে বেড়িয়েছে গ্রামের গাছপালায়, নদীর ধারে, পরিচিত মানুষের চোখে, আত্মীয়ের স্নেহের ভিতরে। ভাবে ভোলা, আনমনা, উদাসীন মন ছিল তার—আপন হৃদয়ের রহস্যটা ছিল আপনার কাছেই অজ্ঞাত। তারপর বয়স বাড়লো, কৈশোর এলো যৌবনে, অতৃপ্তিটা হোলো গভীর। ভাবলে, লেখাপড়ায় বুঝি পরম আনন্দ! জানা গেল, কথাটা সত্য নয়; জ্ঞান আহরণের অবস্থাটা ঠিক যেন অন্ধকারে পথ হাতড়ানো—আলো নেই। আলো কোথায় পাওয়া যাবে? মেয়েমানুষের মন বললে, চাই মনের মানুষ, চাই ভালোবাসা। তাই গ্রামের গণ্ডীর মধ্যে মন টিঁকলো না, এলো গণ্ডী ছেড়ে। পরিবারের মধ্যে প্রমাদ ঘটল। মেয়েকে গ্রেপ্তার ক'রে এনে বিয়ে দেওয়া হোলো। হায় রে বিয়ে! ভালোবাসার কোনো পরিচয় নেই, আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধন—শ্বাসরোধ হয়, হৃদয় যায় ম'রে, মনে হোলো চির-বন্দিনী হয়ে থাকাটাই নারীজীবনের একমাত্র সার্থকতা! স্বামী চিঠি লিখে জানালেন, দেহসম্ভোগের কথা, সে চিঠি লিখে জানালো, অসম্ভব! তার উত্তরে স্বামী দলিল লিখে পাঠালেন, তুমি আমার স্ত্রী নও, আমি নই তোমার স্বামী। মায়ালতা জানিয়ে দিলে, বিয়ে আমার হয়নি, দেহদান করবো না কোথাও বিনামূল্যে!

তারপর আর বাকি রইল কী! এলো গ্রাম ছেড়ে শহরে,—অপরিচিত জীবনের মাঝখানে। সে আর কোথাও অধীনতা মানবে না, দুঃখের ভিতর থেকে আবিষ্কার করেছে নিজেকে। এবার জানা গেল, নিজের পা দুটো ছাড়া আর কোথাও দাঁড়াবার জায়গা তার নেই, তার ভার আর কেউ নেবে না। যেদিন থেকে জানা গেল, নিজের দায়িত্ব নিজের, সেদিন থেকে সে হোলো কঠিন। পুরুষকে তাচ্ছিল্য করলে, দূরে সরিয়ে দিলে। বাইরের দিকটা যত কঠিন হোলো, হৃদয় ততই গেল শুকিয়ে, নিজের পরে এলো বিজাতীয় বিতৃষ্ণা। তখনভাবলে, চিরবঞ্চিত হয়ে জীবন নির্ব্বাহ ক'রে যাওয়াটাই বুঝি মেয়েমানুষের বিধিলিপি!

বাইরে অন্ধকার রাত্রি সাঁ সাঁ করে। আলোটা ম্লান হয়ে আসে। মায়ালতায় চোখে নামে তন্দ্রা।

সেদিন সকালবেলা সুরপতি এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললে, আপনার টাকা রেখে গেলাম নটবরের কাছে, দরকার হ'লে নেবেন।

মায়ালতা বললে, কোথায় যাচ্ছেন আপনি ?

যাচ্ছি আদাপুর তালুকে, কাজ আছে। ফিরতে বোধ হয় কিছু দিন দেরী হবে।

দেরী হবে ?—ব'লে মায়ালতা মুখ তুলে তার দিকে তাকালো। মায়া-দয়া সে মুখে কিছুমাত্র নেই, বিবেচনা নেই, নেই দায়িত্ববোধ। বললে, আপনি এমন ক'রে এড়িয়ে থাকতে চান্ কেন ? আপনার কোথায় অসুবিধে হচ্ছে খুলে বলুন।

সুরপতি বললে, এখানে এখন মেয়েদের পাঠশালা করা সম্ভব হবে না, আপনাকে এখন কাজ দেওয়া কঠিন। আর তা ছাড়া—

তা'ছাড়া কি বলুন। আমার এখানে থাকায় আপনার আপত্তি—এই না ?

সুরপতি চুপ ক'রে রইল।

মায়ালতার গলা কাঁপছিল। বললে, আপনার চোখ নেই, আপনার মন নেই, আপনার হৃদয় নেই। আপনার অতিথি আমি, অথচ আপনি জানেন না আমার সম্ভ্রম বাঁচিয়ে রাখতে। আদর্শ পুরুষ আপনি ? আপনি ভেঙেছেন সমাজের বন্ধন ? মিছে কথা। নিজের মনে আপনার কত জঞ্জাল জমা আছে, আপনি তা জানেন ? কোথায় যেতে চান্ আপনি আমাকে ছেড়ে ?—বলতে বলতে মুখ ঢেকে দ্রুতপদে সে নিজের ঘরে চ'লে গেল।

সুরপতি স্তম্ভিত হয়ে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াল। মনে হোলো, কেমন একটা জটিল বন্ধন পাকে পাকে তার কর্ম্মজীবনকে বাঁধতে উদ্যত হয়েছে,

মুহূর্তের জন্য যেন কেমন একটা যন্ত্রণা অনুভব করলে। এটা তার চরিত্রে নেই। চিত্তদৌর্ব্বল্যটা পাপ, এ কথাটা সে নানা পুঁথি ঘেঁটে আবিষ্কার করেছে। মায়ামোহে হৃদয় ক্লিষ্ট হয়, স্নেহের বন্ধন মানুষকে পিছু টানে, কামিনী আর কাঞ্চন কর্ম্মজীবনের ধারাকে প্রতিহত করে—এই সব সন্ন্যাস তত্ত্ব তার মাথায় ভিড় ক'রে এসে দাঁড়াল। তার দেহটা আধুনিক, বয়সটা নব্য, মনটা প্রাচীন। তার মনে হোলো, এ যেন মস্ত একটা পরীক্ষা, সে যেন ফাঁদে প'ড়ে যাচ্ছে। মায়ালতা স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকের প্রলোভনে তার তপস্যা না ভাঙে। পুরুষ চিরবিরহী, চিরদিন ছুটে চলেছে সে অজানা কাজ আর আবিষ্কারের সন্ধানে, তার গতি অপ্রতিহত, সে জন্মবৈরাগী, রক্তের ভিতরে তার সর্ব্বত্যাগের ভাষা। নারীর ইতিহাসে এমন কথা নেই, সে বেঁধে ব'সে রয়েছে স্বর্ণসূত্রের জাল, পুরুষকে সে বন্দী করবে। তার প্রকৃতিতে সন্ন্যাস নেই, আছে রসের মাধুর্য্য, সেই মাধুর্য্য বত্রিশ নাড়ীতে জড়ানো, সেই নাড়ীগুলি সন্তানকামনায় ভরা। পুরুষ অগ্রগামী, নারী তার পশ্চাদ্‌ধাবিতা। স্বরপতির মনে হোলো, কেন এই হৃদয়াবেগের খেলা, কী কথা আছে এর পিছনে? একে প্রেম বললে ভুল হবে, প্রেমের মধ্যে নেই অন্ধ উন্মত্ত আকর্ষণ, প্রেম কখনও উগ্র আসক্তিতে কাছে টানে না। এই মোহ তার ভাঙা চাই।

দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে সে বললে, আপনি আমার ওপর রাগ করছেন কেন? আমার কোনো অপরাধ নেই।

মায়ালতা ততক্ষণে আত্মসম্বরণ করেছে। মুখের দিকে চেয়ে বললে, আপনার কি আর কোনো কথা নেই?

স্বরপতি বললে, আপনাকে অনেক বার জানিয়েছি, আমি কাজ করতে এসেছি এখানে, কাজই আমার ভালো লাগে।

আপনি এমন ক'রে আমার সব ভাঙতে চান কেন?

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে স্বরপতি বললে, এটা আপনার নিজের কথা, আমার নয়। চোরাবালির ওপর ঘর বেঁধেছেন, অপরাধ আপনার।

মিছে' কথা। মায়ালতা উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, একথা আপনার সত্যি নয়। আপনার নিঃশব্দ প্রশ্রয়ের পথ দিয়ে আপনিই আমাকে এখানে টেনে এনেছেন, আমি নিজে থেকে আসিনি। আপনি হরিহরদার ভক্ত, তাঁর ভালো দিক্‌টা আপনি পাননি, পেয়েছেন তাঁর বেপরোয়া দায়িত্বজ্ঞানহীনতা।

সুরপতি বললে, আপনার কথায় রাগ করা উচিত, কিন্তু আপনি আজও ছেলেমানুষ। যে জায়গায় জোর চলে না, সেইখানে আপনি শক্তি প্রয়োগ করতে চান্। প্রথম থেকে অভদ্র ব্যবহার করলেই কি আপনি খুশী হ'তেন?

ক্লিষ্টকণ্ঠে মায়ালতা বললে, ব্যবহার কবে আপনি ভাল করেছেন তাও আমার জানা নেই, আপনার সকল উৎপীড়নের দাগ আমার মনে মনে লেখা আছে সুরপতিবাবু। আমিই বরাবর আপনার মঙ্গলকামনা ক'রে এসেছি, আমিই গিয়েছি ছুটে ছুটে, আমিই ছিলুম অন্ধ।

সুরপতি কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর বললে, আপনার এই রাগের কারণ আমি বুঝি নে।

বোঝেন।—মায়ালতা বললে, কিন্তু স্বীকার করতে চান্ না।

আপনি কি তবে বলতে চান্, আমাকে সমস্ত বন্ধ ক'রে দিয়ে এখান থেকে চ'লে যেতে?

কই, সে কথা ত আমি বলিনি?

আপনার কথার অর্থই তাই। কিন্তু আমি জানি আমার একটা মাত্র পথ।—সুরপতি বললে, অনেকদিকে যারা তাকায় তাদের লক্ষ্য স্থির নয়, তারাই পথ হারায়। নিজের জীবনকে একই দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছি, জানি অসুবিধা আছে, কষ্ট আছে,—কিন্তু লক্ষ্য স্থির আছে এই আনন্দেই খুশী থাকব। আমাকে দয়া ক'রে ভুল বুঝবেন না। এদিকে বেলা হোলো, আমাকে এখুনি যেতে হবে।

দাঁড়াতে আপনাকে বল্‌ব না, আপনি যান্—মায়ালতা বললে, কিন্তু এটা জেনে যান্ আপনার নিজের কথাগুলোর মধ্যে আমার কথাও থেকে যাচ্ছে।

আপনার চোখ নেই, তা'হলে দেখতে পেতেন আমি কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি। সহানুভূতি আপনার কাছে চাইনে, দয়াভিক্ষা করতে আসিনি ছুটে, কিন্তু বিবেচনাও কি আশা করতে পারিনে আপনার কাছ থেকে?

আমার কাছে আপনি বিবেচনা চান্ কেন।—সুরপতি বললে, আমি কে?

কেউ নন্ আপনি।—মায়ালতা উত্তপ্ত কণ্ঠে বললে, আপনি রাস্তার লোক। অনাত্মীয় বলে নিজেকে সকলের কাছে জাহির করতে থাকুন, আপনাকে বাধা দেবো না। আপনাকে বিবেচনা করতে বলছি এইটুকু যে, আপনি জানেন আমার আগাগোড়া ইতিহাস, আপনি জানেন কত বিপদ আর দুর্ভাগ্য পার হয়ে এসেছি, কত অন্যায় মাথা পেতে নিয়েছি নীরবে, কত অপমান সহ্য করেছি মুখ বুজে। এ সব কি আমার মিছে কথা?

সুরপতির মুখে হঠাৎ হাসি এলো। বললে সবি সত্যি, কিন্তু আমি আপনার এ কাহিনী জেনে কী করতে পারি? এ সব বিবেচনা ক'রেই বা আমার ফল কি?

মায়ালতা বললে, ফল কিছু নেই কিন্তু আপনি এখন আমাকে কি করতে বলেন?

সুরপতি বললে, সে বিবেচনা আপনার, আমার নয়।

আপনি জানেন, আমি কল্‌কাতার সব কাজকর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে এসেছি?

শুনেছি আপনার মুখে। তবুও জানি আপনি ইচ্ছে করলেই কাজকর্ম্ম পেতে পারবেন। আপনার কাজের অভাব হবে না।

ক্রুদ্ধকণ্ঠে মায়ালতা বললে, আমি মেয়েমানুষ, একথা আপনার মনে আছে?

মেয়েমানুষ আপনি নন্।—সুরপতি বললে, আপনি স্বাধীন মেয়ে। নিজের চেষ্টায় আপনি দিগ্বিজয় করেছেন, কেউ আপনাকে কোনোদিন সাহায্য করেনি।

দুর্ভাগ্য আমাদের। স্বাধীন ব'লে আমাদের সবাই জানে কিন্তু পুরুষের গোপন সাহায্য ছাড়া আমরা আজ পর্য্যন্ত কিছুই করতে পারিনি। পুতুল

পূজো করতে গেলেও আপনাদের দরজায় হানা দিতে হয়। স্বাধীন ব'লে আর আমাকে অপমান করবেন না।—এই ব'লে মায়ালতা থামল।

এবার আমি যাই।—ব'লে সুরপতি পা বাড়ালো।

কোথায় যাবেন?

আমাকে যেতে হবে আদাপুর তালুকে। আজ সন্ধ্যার মধ্যে সেখানে আমাকে পৌছতেই হবে।

মায়ালতা বললে, এই তিন চারমাসের মধ্যে আপনি কত জায়গায় গেলেন, আমি একটিবারও বাধা দিইনি, বাধা দেবার অধিকার আমার নেই। আজো আপনাকে ছেড়ে দেবো; কিন্তু আমার জন্য কোনো ব্যবস্থাই করে গেলেন না, নটবরের বৌ পর্য্যন্ত আপনার এই ব্যবহার দেখে অবাক্ হয়ে গেছে।

সুরপতি চুপ করে রইল! মায়ালতা পুনরায় বললে, এখানে আপনার অখণ্ড প্রতিষ্ঠা, সবাই আপনাকে রাজা ব'লে ডাকে, গ্রামের আপনি প্রধান, অথচ আমাকেই ফিরে যেতে হবে রিক্ত হস্তে, আপনার কোনো সাহায্য পাবো না। সংসারে বড় হয় যারা, তারা বোধ হয় অনেকেরই মাথা মাড়িয়ে উঠে দাঁড়ায়। আমি অনেক আশা করেছিলুম, কিন্তু—বলতে বলতে তার চোখে অশ্রু এলো।

সুরপতি বললে, আপনি এখানে থাকলে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে তা আপনি বোঝেন? যারা কিছুই জানে না তারা কি বলবে?

সে চিন্তা আপনার, আমার ত নয়!

আমার চিন্তা, আমার দায়িত্ব। তারা যখন প্রশ্ন করবে, আমি তখন জবাব দিতে পারব না। যাদের বিশ্বাস আর স্নেহের ওপর আমার প্রতিষ্ঠা, তারা বিদ্রূপ করবে, গ্রাম ছাড়া ক'রে তাড়িয়ে দেবে, আমার সকল চেষ্টা মিথ্যে হয়ে যাবে।

নিজের সম্মান আপনি রাখতে পারবেন না?

না। সম্মান বড় ভঙ্গুর, আর এই ভঙ্গুর জিনিসটির উপর মানুষের জীবনের সব মূল্য নির্ভর করে। সম্মান হারিয়ে প্রতিষ্ঠা ঘুচিয়ে, সমাজ নষ্ট ক'রে বাঁচা

যায় না। আর তা ছাড়া আমার পথ সত্যি আলাদা। আপনাকে অনেকবার জানিয়েছি, সংসারের অনেক জিনিসেই আমার মন নেই। আমি মনে করি কাজের জন্যই জীবন, সুখ দুঃখের জন্যে নয়; আদর্শের জন্যে বাঁচা, ভোগের জন্য নয়। আমাকে দয়া ক'রে আপনারা মুক্তি দিন্।

অশ্রুপূর্ণ চক্ষে মায়ালতা বললে, আমাকে তবে বিদায় দিয়ে যান?

এমন সময়ে কয়েক জন লোক বাইরে সাড়া দিয়ে ডাক্‌ল, রাজা?

সুরপতি বললে, এই যে, তোমাদের সব প্রস্তুত?

হ্যাঁ, আজ্ঞে। আর দেরি করবেন না, রাজা। আপনার অন্নসেবা হয়েছে?

কিছু খাবার জন্য সুরপতি সকালে এসেছিল, এ কথা এতক্ষণ কারো মনে ছিল না। প্রশ্ন শুনে মায়ালতা তার মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু মুহূর্ত্ত মাত্র, তারপরেই সুরপতি বললে থাক্‌গে, ওবেলাই রান্না করা যাবে। চল বেরিয়ে পড়ি। আচ্ছা, আমি এবার যাই। আমার ওই ট্রাঙ্কে আপনার টাকাগুলো আছে, নিশ্চই নিয়ে নেবেন।—এই ব'লে সে দ্রুতপদে চ'লে গেল।

চোখে অশ্রু এসেছিল, সেই অশ্রু গেল শুকিয়ে। এগিয়ে এসে মায়ালতা দরজার কাছে দাঁড়াল। সুমুখের পথ পার হয়ে সুরপতি ততক্ষণে অন্য পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। এই ঘর, ওই দালান, সুমুখের বটগাছের নীচে বিশ্বেশ্বরের মন্দির, গত তিন চার মাসের অতি প্রত্যাশাময় জীবন, একটি মুহূর্ত্তে সমস্ত যেন বিষাক্ত হয়ে গেল। আজ নিজের ভিতরের চেহারাটা প্রত্যাখ্যানের আঘাত খেয়ে যেন নিজের চক্ষের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। এত বড় অসম্মান তার আর কখনো ঘটে নি। অনেক আশা যেখানে, সেইখানেই প্রবল আঘাত। ভুল করেছে সে, মস্ত বড় ভুল। মেয়েমানুষের দৈন্যটাই ছিল বড়, অতিলোলুপতাটা তাকে করেছিল অন্ধ। এ কথা সে বুঝতে পারেনি, সব পুরুষ সুরেশ নয়, সংসারে সুরপতিরাও আছে! তার মতো মেয়েকে পাবার জন্য যারা তপস্যা করে, তাদের মায়ালতা চেনে, কিন্তু জান্‌ত না তাদের, যারা নিতান্ত অবহেলায় তাকে পথের প্রান্তে

নিষ্প্রয়োজনীয় ব'লে ফেলে দিয়ে যায়! আজ তার সকল আত্মাভিমান চূর্ণ হয়ে গেল।

এই যে লজ্জা, এটাও কম নয়। এই মানুষটা, যার হৃদয়ে কিছুমাত্র স্নেহ আর মায়ার আভাস নেই, এর জন্য দীর্ঘ দিন ধ'রে কি উদ্বেগই না তার ছিল! গর্ব্ব প্রকাশ করেছে ক্ষেমীর মা'র কাছে, তাচ্ছিল্য করেছে সুরেশকে; নিজের হিতাহিত, প্রতিষ্ঠা, উপার্জ্জন, সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছে, পিছন ফিরে সে তাকায়নি--অথচ আজ তার কোনো মূল্যই পাওয়া গেল না। আপন রূপের মোহে সন্ন্যাসীকে সে আচ্ছন্ন করতে আসেনি, জয় করার প্রবৃত্তি তার ছিল না, সে এসেছিল সেবা করতে। ভালোবেসে সে খুশী করতে চেয়েছিল আপন হৃদয়ের দাক্ষিণ্যে। আকাঙ্ক্ষা ছিল তার কতটুকু? কতটুকু চেয়েছিল সে জীবনে? সামান্য একটু নিশ্চিন্ত আশ্রয়, সেই আশ্রয়টুকু হবে শান্তিতে প্রসন্ন। ঐশ্বর্য্য নয়, বিলাস-ব্যসন নয়, অলঙ্কার-আভরণের বাহুল্য নয়,—কেবল অনাড়ম্বর সুন্দর সহজ জীবন যাত্রা; পৃথিবীর এক প্রান্তে, অখ্যাত গ্রামের কোণে, নিকটের ওই ছায়াবটের নীচে মন্দির প্রাঙ্গণে, শাল আর মহুয়ার স্নেহচ্ছায়ায় দিন ও রাত্রি যাপনের মধুর আনন্দ।

আজ তার মনে হোলো, আত্মস্বাতন্ত্র্যের জন্য ছুটোছুটি কত বড় মিথ্যা! স্ত্রীলোকের স্বকীয়তাটা অন্যের মুখাপেক্ষী, নিজের পায়ে তারা চলে না। সে মনে করেছিল, সুরপতির সঙ্গে তার কোনো তফাৎ নেই; অর্থাৎ দু'জনেই ঘরছাড়া, পরিবার ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন, দু'জনেই চলেছে নূতন জীবনে; দু'জনেরই পথ এক। কিন্তু সুরপতি পুরুষ, এই কথাটা সে বিচার করেনি। সুরপতি ছুটেছিল বন্ধন ডিঙিয়ে, কিন্তু সে যে ছুটেছিল বন্ধন বরণ করতে! মায়ালতা নিজেকে ধিক্কার দিলে। নিজের প্রতি এত বড় বিতৃষ্ণা তার আর কোনোদিন আসে নি। মনে হোলো, ভালোবাসা মেয়েমানুষকে নিষ্ক্রিয় করে, অকর্ম্মণ্য করে, তাদের গতিকে আচ্ছন্ন

ক'রে দেয়। পুরুষের আছে ঐশ্বরিক শক্তি, তারা অভিভূত হয়, আবদ্ধ হয় না।

সুমুখের পথ দিয়ে শীতশেষের রুক্ষ বাতাস ধূলাবালি উড়িয়ে চলেছে, মন্দিরে সকালের পূজার ঘণ্টা থাম্‌ল,—নূতন ক'রে আজ সকালে আবার দিন আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু এ সমস্ত যেন প্রাণহীন, মৃত্যুর মতো এরা যেন নিঃসাড়। মায়ালতা বাইরে এসে দাঁড়াল। তাকে চ'লে যেতে হবে, এখানে 'আর তার থাকার অধিকার নেই! তার স্নায়ুর মধ্যে এরা সবাই এই কয় মাসে জড়িয়ে গিয়েছিল, আজ সেখানে ভয়ানক চিড় খেয়েছে, তাকে সব ছিন্ন ক'রে যেতে হবে। কিন্তু কোথায়, কোথায় তার পথ? সে স্ত্রীলোক, একথা আজ নিতান্ত নিরুপায় হয়ে তাকে উপলব্ধি করতে হচ্ছে, কতদূর সে যেতে পারে? কোথায় তার নিরাপদ্ আশ্রয় মিলবে? একদিন তার ভিতরে প্রবল বলশালিতা ছিল, ছিল প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি, ছিল দ্রুতবেগ—সে শক্তি কে হরণ ক'রে নিল?

নটবরের স্ত্রী এসে দাঁড়াল। বললে, দিদি, তোমার জল-বাটনা দিচ্ছি, আজ রান্নার বেলা হয়ে গেল। গরম মুড়ি চারটি এনে দিব?

মায়ালতা তার চিবুক ধ'রে বললে, না, ভাই ব্যস্ত হয়ো না, আজ চাপড়া ষষ্টি, আমাকে খেতে নেই।

ওমা, সে কি কথা? উপোস য়্যাবে কেন?

আচ্ছা যদি ইচ্ছে হয়, পরে খাবো। নটবর কোথায় গেল বোন্?

বৌ বললে, হাট থেকে তোমার জন্যে ডাব আনতে পাঠিয়েছি, এই এলো ব'লে।

ও আমার লক্ষ্মী!—মায়ালতা তাকে আদর ক'রে বললে, তোমার এত বিবেচনা?

ও কথা বলতে নাই, আমরা কি তোমার যোগ্যি? তুমি আমাদের মাথার মণি। তোমার জন্যেই উহার ঘর উঠ্‌ল, রাজার দয়া হল'।—এই ব'লে গামছাখানা কাঁধে ফেলে খুকীর মা স্নান করতে চ'লে গেল।

সামান্ত কাপড় জামা, দুই একটা প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, খানকয়েক বই,—পৃথিবীতে এর বেশী মায়ালতার আর কিছু নেই। সেগুলি গুছিয়ে সে স্যুট্‌কেসে তুললে। স্নান তার আগেই হয়েছিল। বেলা দশটা নাগাৎ নটবর এসে পৌছল। মায়ালতা বললে, কি আন্‌লে নটবর ?

ডাব আনলম দিদিমণি। আর এই তোমার প্রণামী। হাটে গিয়ে পড়লাম, ভাবলম কি নিয়ে যাই দিদিমণির জন্তে। দেখলম সব নতুন সাড়ী, লোভ্‌হয়। তুমি নিতে অমত ক'রো না দিদিমণি, আমরা তোমার খেয়ে মানুষ।

তাই ব'লে তুমি সাড়ী কিনে আনলে ? মায়ালতা অবাক্ হয়ে গেল।

নটবর উৎসাহিত হয়ে বললে, আর এই মাথার তেলটুকু, খুব মিষ্টি গন্ধ দিদিমণি। তোমার মাথা রুক্ষু হয়ে থাকে, এক মাথা চুল, আমার বড় কষ্ট হয়।

মায়ালতা হেসে বললে, রুক্ষু মাথাই যে এখনকার ফ্যাসন্ নটবর! এঃ তুমি দেখছি নিতান্তই গ্রাম্য, বলি হাল আমলের সঙ্গে তোমার বুঝি পরিচয় নেই ? তাদের সব ঝড়ের পাখীর সাজ, ময়ূরপঙ্খী ঘোড়া, তারা নতুন রসের কারবার করে, বুঝলে নটবর ? আমার মাথা রুক্ষু দেখে তোমার কষ্ট হল, তাদের দেখলে তোমার নিশ্চয় কান্না পেতো। যাক গে, শোনো বলি নটবর, তোমাকে এখুনি একটা বিশ্বাসী লোক দিতে হবে !

কেন-দিদিমণি ?

আমি এখুনি চ'লে যাব। আমার বাক্সটা ষ্টেশনে পৌছে দিতে হবে। লোক পাওয়া যাবে ত ?

নটবর অবাক্ হলে বললে, তুমি চ'লে যাবে ?

চমকে উঠো না নটবর। মায়ালতা বললে, অনেক দিন দেশ ছেড়ে আছি, আর ত থাকা চলে না ভাই, খুব বেড়ালুম, খুব খেলুম, তোমারা আনন্দ দিলে অনেক,—এবার আমি যাব।

আজই যাবে ?

এখুনি যাব। ডাবটা কেটে দাও, খাই। বাক্স গোছানই আছে, স্নান হয়েছে, রাজাকে জানিয়ে দিয়েছি—। এই ব্'লে' মায়ালতা পায়ে চটিজুতাটা প'রে নিল,—তারপর বললে, অতএব আর মুহূর্ত্ত দেরি নয়, আমি যাত্রা ক'রে ওই মন্দিরের দালানে অপেক্ষা করি, তুমি একটা লোক ঠিক ক'রে দাও। হ্যাঁ, ওই যে আমার স্যুট্‌কেস।

স্তম্ভিত নটবর কেবল বললে, আমি তোমাকে তুলে দিয়ে আস্‌ব।

তুমি ত এই মাত্র পরিশ্রম ক'রে এলে নটবর?

দিদিমণি, আমার পরিশ্রমটাই দেখছ, ক্ষতিটা দেখলে না।

মায়ালতা হাসিমুখে বললে, ক্ষতিটা কি?

সে জানাবো ভগবানকে। এই ব'লে নটবর ঘরে গিয়ে স্যুট্‌কেসটা নিয়ে এল। তারপর বললে, দুঃখ রয়ে গেল, আর একটা দিনও তোমাকে রাখা গেল না। কেবল আমরাই নই, রাজাও বড় দুর্ভাগা দিদিমণি?

ও-কথা বলতে নেই নটবর। মায়ালতা বললে।

বল্‌তে নেই? একশো বার বলব, দিদিমণি। আমার চোখ কানা নয়, দেখি সব, বুঝি সব। তাই বুক বাজিয়ে বলতে পারি, তোমাকে যারা দুঃখু দেবে তারা জীবনে শান্তি পাবে না।

নটবর, জীবনে সকলের চেয়ে ভাল জিনিষটি ত্যাগ ক'রে গেলে কি আনন্দ হয় না?—মায়ালতা অতি কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করতে লাগল।

নটবর একটিবার মাত্র তার এই পরম স্নেহের ও সম্মানের ভগ্নীটির দিকে তাকাল, কি যেন কঠিন কথা বলতে গেল, কিন্তু ঢোঁক গিলে আত্মসম্বরণ ক'রে বললে, আমরা গাঁয়ের লোক, অতি মুখ্যু। চল দিদিমণি।—এই ব'লে সে স্যুটকেস হাতে নিয়ে অগ্রসর হয়ে গেল।

মায়ালতা একবার এদিক ওদিক তাকাল, তার পর গলায় আঁচল দিয়ে দরজার চৌকাঠে একটি প্রণাম করলে। পরে মনে মনে বললে, চেষ্টা করব আবার নতুন জীবন তৈরী করতে, কিন্তু তোমার পায়ে কখনো

কুশাঙ্কুর না ফোটে, ওগো বৈরাগী, এই প্রার্থনা জানিয়ে গেলুম। তুমি সুখে থাকো।—এই ব'লে মাথায় ঘোমটা দিয়ে সে দ্রুতপদে পথে নেমে গেল।

গরুর গাড়ী পাওয়া যায় নি; জঙ্গলের ভিতর দিয়ে তিন ক্রোশ পথ হেঁটে তারা দু'জনে ষ্টেশনে এসে পৌঁছলো। বেলা বোধ হয় দুটো বাজে। গাড়ী আসতে আর বিলম্ব নেই। মায়ালতা কল্‌কাতার টিকিট কিন্‌ল।

গাড়ী এসে যখন পৌঁছল, নটবরের চক্ষু তখন অশ্রুসজল। মায়ালতা তার কাঁধে হাত রেখে বললে, প্রায় চার মাস ছিলুম নটবর!

নটবর বললে, তোমার চিরকাল থাকার কথা দিদিমণি।

মায়ালতা বললে, এমন ত হ'তে পারে নটবর, আবার তোমাদের দেখ্‌ব? —ব'লে সে হাসলো।

নটবর বললে, মিছে কথা। কেন তুমি আসবে,—তেমন বাপের মেয়ে তুমি নও। তুমি ছোট হবে কেন, দিদিমণি?

মায়ালতা, গাড়াতে উঠে বসলো। তারপর আঁচল খুলে এক খানা দশটাকার নোট বা'র ক'রে নটবরের হাতে দিয়ে বললে, তোমার ছেলেমেয়েদের জামা কিনে দিয়ো। কিছুই দিয়ে আসতে পারিনি। বউকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ো।

নটবর হেঁট হ'য়ে পায়ের ধূলো নিলে। বাঁশী বাজিয়ে গাড়ী ছেড়ে দিল।

গাড়ীর গতি প্রথমটা মন্থর, তারপর দ্রুত। জান্‌লা দিয়ে মায়ালতা মুখ বাড়িয়ে রইল, নটবর তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল, ধীরে ধীরে তার মূর্ত্তি ছোট হয়ে এক সময় অদৃশ্য হোলো। তারপর মাঠ, মাঠের পর মাঠ, শীতশেষের শুক্‌নো গাছ পালা, এলোমেলো হাওয়া, দূরান্তরের ছোট ছোট বনময় গ্রাম,—কিন্তু মায়ালতা অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। চিন্তার কোনো ছায়া সে-মুখে নেই, ব্যাথা-বিষাদ নেই, মুখখানা যেন নিষ্প্রাণ, অচেতন; অতীত ও বর্ত্তমানকে উত্তীর্ণ হয়ে সে যেন কোন্ দূরে চ'লে গেছে। একসময়ে

তার চোখে তন্দ্রা এলো, সে-তন্দ্রা গভীর ক্লান্তির; ঝড়ের পরে প্রশান্ত সাগরের যেন নিস্তরঙ্গতা। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তার চোখে জল গড়িয়ে এলো।

একসময়ে কা'র যেন গলার আওয়াজে তার তন্দ্রা ভাঙলো। চেয়ে দেখলে একটি বৌ তার পাশে ব'সে রয়েছে। চোখচোখি হতেই বউটি বললে, আপনি সরে বসুন, মুখে রোদ লাগছে।

মায়ালতা একটু স'রে বসলো। তারপর বললে, শীতের রোদ, মন্দ লাগে না।—ব'লে সে আঁচল দিয়ে মুখ মুছলে।

বৌটি বললে, শীত আর নেই, এখন বসন্তকাল।

ও, তা হবে! ব'লে মায়ালতা বাইরের দিকে তাকালো। শীত কবে চ'লে গেছে, তার খেয়াল নেই।

বৌটি আলাপ ক'রে বললে, আপনি কতদূরে যাবেন?

আমি?—মায়ালতা বললে, যদি বলি তার কোনো ঠিক নেই?

বৌটি অবাক্ হয়ে গেল, এমন কথা মেয়েমানুষের মুখে তার শোনার অভ্যাস নেই। মায়ালতার মুখের দিকে সে তাকালো। মাথায় সিঁদুর নেই, হাতে নেই নোয়া, একটু আগে চোখের জল মুছতে দেখেছে, উপবাসী মুখ,—মাথার চুল বিস্রস্ত,—কে জানে কেমন মানুষ! এর পরে আর কোনো প্রশ্ন করতে বৌটির সাহস হোলো না।

মায়ালতা বললে, আপনার বয়েস খুব অল্প দেখছি, বিয়ে হয়েছে কতদিন?

এই তিন মাস হলো।

মাত্র তিন মাস? বাপের বাড়ী কোথায় আপনার?

উত্তরপাড়ায়।

এদিকে কোথায় গিয়েছিলেন?

সিংভূমে, আমার মামার বাড়ীতে।

মায়ালতা বললে, আপনার নাম কি?

বৌটি বললে, সুরমা। আমাকে 'আপনি' বলবেন না, আমি আপনার চেয়ে কত ছোট।

খুব ছোট নয়,—মায়ালতা বললে, আমি বরাবরই এমনি; ছোট বেলা থেকেই বাড়ন্ত গড়ন। আপনার বোধ হয় বছর কুড়ি বয়স হবে?

সুরমা বললে, না, ভাদ্রমাসে আমি একুশে পড়েছি।

তবে আপনি আমার চেয়ে তিন বছরের ছোট। আমি অল্প বয়স থেকে লম্বা চওড়া। আমার যখন দশ বছর বয়স, তখন থেকেই গ্রামের ছেলেরা আমার ঘাঘ্‌রার মধ্যে প্রেমপত্র গুঁজে দিত। তাদের আর সবুর সইত না।

সুরমা এবারে তার কথায় খিলখিল ক'রে হেসেই অস্থির। বললে, আপনি কী চমৎকার দেখতে! এত রূপ?

মায়ালতা বললে, রূপের কথা আর বোলো না, এ যেন শিমুল ফুল। গন্ধ নেই, শোভা আছে। অতি বড় সুন্দরী না পায় বর। বুঝতেই পাচ্ছ, বর জোটেনি। এই জাঁদ্রেল বপুখানি কে ঘাড়ে নিতে চায় বলো? দানাপানি ত কম লাগবে না! মোটর গাড়ী পোষার চেয়েও আমার খরচ বেশী। ভেবে চিন্তে, তাই গিয়েছিলুম এক জঙ্গলে মনের মানুষ খুঁজতে; রাজা ব'লে ডাকলুম, কিন্তু সাড়া দিলে না। নানা কৌশলে বন্দী করবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু ফাঁদে ফেল্‌তে পার্‌লুম না। রূপের গর্ব্ব খর্ব্ব হলো, পরাজয়ের কলঙ্ক মেখে ফিরে চলেছি।

সুরমা বললে, আপনার কথা শুনে আপনাকে খুব ভালো লাগে।—এই ব'লে সে হাসতে লাগল।

ওমা, তাই নাকি? ভাবছিলুম, আমার কথা শুনে মনে হবে দুশ্চরিত্র, স'রে যাবে কাছ থেকে। আমি বাঁচবো তোমার প্রশ্নের হাত এড়িয়ে। যাক্‌গে বাজে কথা, তোমার স্বামী কি করেন ভাই?

তিনি ওকালতী করেন। এখন আছেন শিমুলতলায়; তাই যাচ্ছি মামাতো ভাইকে নিয়ে। মামাদের বাড়ী আছে শিমুলতলায়।—সুরমা

বললে, আসানসোলে গাড়ী বদল করতে হবে। আচ্ছা, আপনার সঙ্গে কেউ নেই ?

মায়ালতা বললে, কে থাকবে বলো ?

আত্মীয়-স্বজন, ভাই, বন্ধু—

মায়ালতা হেসে বললে, অনেক কথাই শুনতে চাও দেখছি, কিন্তু বলব না। আপনার লোক আমার বিশেষ কেউ নেই, পর দু'চার জন আছেন। তবে কি জানো ভাই, দরকারের সময়ে কারো দেখা পাইনে।

বন্ধুও নেই ?—সুরমা হেসে বললে।

মায়ালতা বললে, মেয়ে-বন্ধু না পুরুষ-বন্ধু ? হ্যাঁ, তা আছে বৈ কি দশবিশ জন, কিন্তু ভাই তুমিও যেমন, একবারে অরুচি ধ'রে গেছে। ওরা সব মৌশুমী ফুল—এই আছে, এই নেই। বন্ধুত্ব হবে কার সঙ্গে ? সংসারে মনের মানুষ পাইনে।

সুরমা আরো কাছ ঘেঁসে বসলো। মায়ালতার আলাপের অসাধারণত্বে এরই মধ্যে সে অভিভূত হয়ে পড়েছে মুখের দিকে সে খানিক্ষণ চেয়ে রইল, তারপর বললে, একটা কথা বলব আপনাকে ?

মায়ালতা বললে, চরিত্র সম্বন্ধে ?

না, না, অন্য কথা।

তবে কি ? মাথায় সিঁদুর নেই কেন ? পুরুষ কেন নেই সঙ্গে ?

সুরমা বললে, তাও নয়।

মায়ালতা হাসি মুখে বললে, উত্তর দেওয়া সহজ হবে ত ?

নিশ্চয় হবে। আমি বলছি আপনি এতক্ষণ যা বললেন, সব কথা আপনার সত্যি নয়।

কোন্ কথাটা আমার মিথ্যে মনে হলো ?

সুরমা মাথা দুলিয়ে বললে, কোনটাই আপনার মনের কথা নয়! আপনি যা বলেন, তা আপনি নিজেই বিশ্বাস করেন না।

মায়ালতা বললে, ওরে বাবা, এ যে একেবারে মনোবিশ্লেষণ! তুমি ভাই উকিলের বৌ, জেরা করতে পারো,—আমি মুখ্যু মেয়েমানুষ।

ছি ছি, এমন কথা বলবেন না, আপনার মতন শিক্ষিত মেয়ে আমি দেখিনি।

যেটুকু দেখেছ, এইটুকুতেই আমাকে শিক্ষিত মনে হলো? তোমার পর্য্যবেক্ষণ শক্তির তারিফ করতে পারিনে।

এর পরে দু'জনে নানা আলাপ করতে লাগল। গাড়ী হু-হু ক'রে ছুটেছে। বেঞ্চের ওধারে ছিল সুরমার মামাতো ভাই প্রিয়নাথ। তার সঙ্গে আলাপ হোলো। সে আই-এ পড়ে। তার ফটোগ্রাফির সখ আছে। মায়ালতা ব'লে বসলো, আমি ওরিয়েণ্টাল ভঙ্গিতে বসবো, তুমি একটা স্ন্যাপ নিয়ে নিয়ো ভাই।

প্রিয়নাথ হেসে লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে বসলো।

সুরমা বললে, সত্যি বলুন ত, আপনি কোথায় চলেছেন?

মায়ালতা বললে, সত্যি বল্‌ব? আমার কাছে কল্‌কাতার টিকিট কেনা আছে।

আমার একটা কথা রাখবেন?

রাখার মতন কথা?

সুরমা বললে, নিশ্চয়ই। আপনি আমাদের শিমুলতলার বাড়ীতে দু'এক দিন থেকে যান্।

অতিথি-সৎকার করবে?—মায়ালতা বললে, কী খাওয়াবে বলো?

যা খেতে চাইবেন। বলুন, যাবেন।

মায়ালতা এক মিনিট চুপ ক'রে রইল। তারপর বললে, আসানসোলে গিয়ে বলতে পারি, যাবো কি না।

সুরমা তার হাত ধ'রে মিনতি ক'রে বললে, এখনি আপনাকে বলতে হবে, আসানসোলের আর দেরী নেই।

মায়ালতা রসিকতা ক'রে বললে, আমাকে নিয়ে গিয়ে তুলতে তোমার ভয় করবে না?

সুরমা বড় বড় চোখে চেয়ে বললে, কেন ?

কেন ?—মায়ালতা হাসিমুখে বললে, নতুন বিয়ে হয়েছে, তোমার ওপর এখনো তাঁর মায়া বসেনি, মনে রেখো।

ওঃ, এই কথা! সে ভয় নেই দিদি, মেয়েমানুষের চোখ নিয়ে তিন মাসেই জেনেছি, একেবারে আপনভোলা ভোলানাথ, কোনদিকে যদি তাঁর ভ্রূক্ষেপ থাকে। উর্ব্বশীও হেরে যায় তাঁর তপস্যা ভাঙতে।

সুরমার গৌরবগর্ব্বিত মুখখানি দেখে মায়ালতা মুগ্ধ হয়ে গেল।

প্রিয়নাথ বললে, আসানসোল ষ্টেশনে তিনি আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবেন, কথা আছে।

সুরমা পুনরায় বললে, কই বললেন না ত ?

মায়ালতা বললে, যদি তোমার স্বামী মত না করেন? আসানসোলে গাড়ী দাঁড়াবে, সেই সময়ে নেমে আগে স্বামীর অনুমতি নিয়ো ভাই। হাজার হোক, চেনা-পরিচয় নেই ত! আমার তেমন কোনো বাধা নেই, এক-আধ দিন স্বচ্ছন্দে থেকে যেতে পারি, কিন্তু তাঁর দিক্ থেকে—

সুরমা বললে, আমি আপনার ভক্ত হয়ে পড়েছি, ভক্তের কথা আপনাকে রাখতেই হবে, তা ব'লে রাখছি। আমি জানি, তাঁর আপত্তি হবে না, তাঁর মত সদাশিব মানুষ হয় না।

গাড়ীর গতি মন্থর হোলো। সন্ধ্যার আর বিলম্ব নেই, সূর্য্যাস্ত হয়েছে। প্রিয়নাথ জান্‌লায় মুখ বাড়িয়ে বললে, আসানসোল এসেছে।

ধীরে ধীরে গাড়ী প্লাট্‌ফরমের ভিতরে এসে দাঁড়াতেই প্রিয়নাথ আগে নাম্‌ল। শিমুলতলার গাড়ী আসতে তখন ঘণ্টাতিনেক বিলম্ব আছে।

অল্পক্ষণ খোঁজাখুঁজি করতেই সুরমার স্বামীর দেখা পাওয়া গেল। প্রিয়নাথের সঙ্গে সঙ্গে তিনি গাড়ীর কাছে এলেন। কুলী এসে জিনিষপত্র নামাতে লাগল।

তার গলার আওয়াজ পেয়ে মায়ালতা অনেকখানি মাথার ঘোমটা টেনে দিল। স্ত্রী স্বামীকে হেসে বললেন, শরীর কেমন আছে ?

স্বামী বললেন, মোটামুটি ভাল। আমার চিঠি পেয়েছিলে ত ঠিক সময়ে ?

সুরমা স্বামীর হাত ধরে' বললে, না পেলে যথাসময়ে এলুম কেমন ক'রে ? ওগো, এই ছাখো, পথ থেকে মাণিক কুড়িয়ে এনেছি। উনি কল্‌কাতায় যাচ্ছিলেন, পথে আলাপ। একলাই আছেন, আমি ওঁকে শিমুলতলায় দু'একদিন রাখ্‌ব। কেবল তোমার মতামতের অপেক্ষা। কী চমৎকার মেয়ে, যেমন রূপ তেমনি গুণ !

স্বামী বললেন, বেশ ত চলুন, আমাদের সৌভাগ্য। তারপর হেসে নমস্কার ক'রে বললেন, নমস্কার অপরিচিতা দেবী !

ঘোমটার ভিতরে মাথা হেঁট ক'রে মায়ালতা হাত তুলে' প্রতি-নমস্কার জানালো। সুরমা রাগ ক'রে বললে, তা হবে না, এখানেই আমার স্বামীর সঙ্গে পরিচয় করতে হবে, সে আমি শুন্‌ব না। এই ব'লে সে মায়ালতার ঘোমটা খপ্‌ ক'রে খুলে দিলে।

বজ্রপাত হোলো কিম্বা সর্পাঘাত বোঝা গেল না। মুখ তুলতেই মায়ালতার সঙ্গে সুরেশবাবুর চোখচোখি হোলো। মায়ালতা বললে, নমস্কার সুরেশবাবু। অনেকদিন পরে দেখা হোলো।

সুরেশবাবুর মুখ ভয়ার্ত্ত, বিবর্ণ। হাত তুলে কম্পিত কণ্ঠে বললেন, নমস্কার। ভাল আছেন ?

সুরমা স্তম্ভিত, হতবাক্। চক্ষের নিমেষে বর্ত্তমান অবস্থা উপলব্ধি ক'রে মায়ালতা হঠাৎ হেসে বললে, সুরমা তোমার স্বামীর কাছে আমি চিরঋণী। উনি দেবচরিত্র, ওঁর দয়ায় আমি একদিন কাজ পেয়েছিলুম। সুরেশবাবু, আপনার সঙ্গে আমার ঝগড়া আছে, লুকিয়ে বিয়ে করলেন অথচ আমাকে নেমন্তন্ন করলেন না ! কী অন্যায় বলুন ত ?

সুরেশবাবু বললেন, আপনি তখন দেশে ছিলেন না। হঠাৎ মায়ের পীড়াপীড়িতে বিয়ে করতে হলো, কাকেও খবর দিতে পারিনি। আমি আশা করিনি, আপনার সঙ্গে এমন ভাবে দেখা হয়ে যাবে!

এক হাতে সুরমার গলা জড়িয়ে মায়ালতা বললে, চমৎকার বউ হয়েছে আপনার। যেমন ব্যবহার, তেমনি সৌজন্য। আপনারই যোগ্য স্ত্রী।

সুরেশবাবু ভয়ে ও দুশ্চিন্তায় মাথা হেঁট করলেন। মায়ালতা পুনরায় বললে, আচ্ছা সুরেশবাবু, উর্ব্বশীও নাকি হার মানে আপনার তপস্যা ভাঙতে? ওরে বাবা, আমিও শুনে অবাক্। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর এমন অখণ্ড বিশ্বাস আর দেখিনি। বাস্তবিক আপনার মতন মানুষের উচিত কোনো সন্ন্যাসীর আশ্রমে গিয়ে থাকা। সুরমা, কী দেখছ?

সুরমা এইবার হাসলো। বললে, থিয়েটার দেখছি!

মায়ালতা তার কথায় গোলমাল ক'রে হেসে উঠলো।

সুরেশবাবু বললেন, সুরপতিবাবু ভাল আছেন?

মায়ালতা বললে, বলতে পারিনে, বহুকাল তাঁর খবর রাখিনে।

সে কি, আপনি এতদিন সেখানে ছিলেন না?

মোটেই না। আমি ছিলুম হরিদ্বারে, সেখান থেকে গিয়েছিলুম দ্বারকায়, সেখান থেকে ফিরে বৃন্দাবনে। মনে করেছি, বাকি জীবনটা তীর্থভ্রমণ করেই কাটাবো।

সুরেশচন্দ্র আর কথা বাড়াতে ভরসা পাচ্ছিলেন না। স্ত্রীকে বললেন, কল্‌কাতায় ওঁর স্কুলের চাকরী রয়েছে, আমাদের ওখানে গিয়ে থাকার সময় হয় ত উনি পাবেন না, হয়ত ক্ষতি হ'তে পারে। তার চেয়ে আমি বলি কি, বরং অন্য কোনো সময়ে—

মায়ালতা হেসে বললে, আমাকে এড়িয়ে আপনি দেখছি স্ত্রীকে নিয়ে চ'লে যেতে চান্। স্ত্রীর এত ভক্ত হলে শালীরা কি করে বলুন ত? তা হবে না, সুরেশবাবু—আর তা' ছাড়া স্কুলের চাক্‌রী আমি ছেড়ে দিয়েছি। মেয়েমানুষের কি চাক্‌রী ভালো লাগে?

সুরেশবাবু বললেন, আমাদের বাড়ীতে যাবেন সে আমাদের সৌভাগ্য, কিন্তু ফিরে গিয়ে নতুন চাকরীর চেষ্টা করাও ত দরকার, নৈলে আপনার চল্‌বে কি ক'রে ?

দেখ্‌ছ সুরমা, সাধে কি বলেছি দেবচরিত্র ? বাস্তবিক, আপনার মতন হিতৈষী সংসারে আমার এক জনও নেই। কিন্তু তবু আমি শিমুলতলায় যাবো. সুরেশবাবু, আপনার কিছু অন্ন ধ্বংস আমি করবই।—এই ব'লে মায়ালতা সুরমার হাত চেপে ধরলো।

সুরমা বললে, ওগো তুমি আর কথা ব'লো না। ওঁর কাজ উনি বুঝবেন। দু'একদিনের আগে আমি কিছুতেই ছেড়ে দিতে পারব না।

বেশ ত, তা হ'লে ত আমি খুশীই হবো।—মুখখানা কালো ক'রে প্রিয়নাথ ও কুলীর সঙ্গে তিনি এগিয়ে চললেন। পিছনে পিছনে ওরা চল্‌তে লাগল। সুরমার উপর সুরেশচন্দ্র রাগ করলেন। তার জন্যই ত এই অবাঞ্ছিত ঘটনা ? পথে ঘাটে যার-তার সঙ্গে আলাপ করাটা সুরমার একটা বদ্ অভ্যাস ! এমন বিপদে তাঁকে জীবনে আর কেউ ফেলেনি। ছি ছি, যদি সমস্ত প্রকাশ হয়ে পড়ে ? ভয়ে তাঁর সর্ব্বশরীর অসাড় হয়ে এলো। এখনি পালিয়ে গিয়ে কোথাও লুকোতে পারলে তিনি বাঁচেন। অতীতকালের গভীর কলঙ্ক আজ প্রতিশোধ নেবার জন্য এসে দাঁড়ালো, আজ থেকে তাঁর সমগ্র বিবাহিত জীবন বিষে বিষে জর্জ্জরিত হ'তে থাকবে। মেয়েদের শত্রুতা অন্তর্মুখী, একথা তাঁর জানা আছে।

লাইনের উপরকার সাঁকো পার হয়ে তারা সব অন্য প্লাটফরমে এলেন। প্রিয়নাথ মালপত্রের হেপাজতে নিযুক্ত রয়েছে।

সুরেশচন্দ্রের মনে কিছুতেই স্বস্তি নেই। নানা প্রশ্ন ক'রে তিনি মায়ালতার মনের কথা বুঝতে চান। এক সময়ে বললেন, ইস্কুলে আপনার দু'মাসের মাইনে বাকি আছে, চাইলেই পাবেন।

মায়ালতা বললে, আপনারা দেখছি দাতাকর্ণ, কাজ করিনি, মাইনে পাবো কেন ?

আপনি ত এখনো নোটিশ দেননি ? আপনার ছুটি স্যাংশন্ করা আছে। সে বন্দোবস্ত আমি ক'রে এসেছি।

টাকার দরকার সকলেরই। বেশ, গিয়ে মাইনে নিয়ে নোটিশ দিয়ে দেবো।

সুরেশচন্দ্র বললেন, ওহে প্রিয়নাথ, তোমার দিদিকে নিয়ে এখানে একটু দাঁড়াও।—আপনি একবার আসুন ত এদিকে ?

কয়েক হাত দূরে নিয়ে গিয়ে তিনি পুনরায় বললেন, আমাকে তুমি ক্ষমা করো, মায়ালতা।

মায়ালতা বললে, ক্ষমা চাইবার মতো অপরাধ ত আপনি করেন নি !

তবু অন্যায় কিছু আমার আছে, তাই তোমাকে বলতে এলুম। দয়া ক'রে সুরমার কাছে আমার সম্বন্ধে কোনো আলোচনা ক'রো না—তাঁর ভয়-ব্যাকুল মিনতিটা সমস্ত চেহারায় ফুটে উঠ্ল।

মায়ালতা বললে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি অতটা ছোট নই। আর আপনার সম্বন্ধে বলবার কীই বা থাকতে পারে ? আপনি ত আমার কোনো ক্ষতি করেন নি, বরং বরাবরই উপকার ক'রে এসেছেন।

সুরেশচন্দ্র বললেন, তুমি বলবে না জানি, তবু আমার পাপ মন, সতর্ক না ক'রে পারিনে। স্ত্রীর বিশ্বাস হারিয়ে পারিবারিক জীবনযাপন করা বড়ই কষ্টকর।

মায়ালতা হাসিমুখে বললে, আপনি বিয়ে ক'রে জ্ঞান সঞ্চয় করেছেন, দেখছি।

কথাটায় অসম্মানের খোঁচা ছিল। সুরেশচন্দ্রের মুখ মুহূর্তের জন্য উত্তেজিত হোলো, কিন্তু দায়ে প'ড়ে নীরবে তিনি এ আঘাত সহ্য ক'রে গেলেন। মানুষের দুস্কৃতি দিনে দিনে জমা হয়, কাল পূর্ণ হ'লে একদিন বীভৎসরূপে প্রকাশ হয়ে পড়ে। আপন মনের মালিন্যের এমন ভয়ানক প্রতিক্রিয়া সম্ভব হ'তে পারে, একথা সুরেশচন্দ্রের জানা ছিল না। ভদ্র

ও শিক্ষিত লোকের পক্ষে এইটিই সকলের বড় শাস্তি। একটি মেয়ের কাছে তিনি চিরদিনের জন্য হীন প্রতিপন্ন হ'য়ে রইলেন। সুরেশচন্দ্র বললেন, আর একটা কথা তোমায় বলব। একদিন আক্রোশ-বশে সুরপতির কাছে তোমার বিরুদ্ধে একখানা চিঠি লিখেছিলুম, সে চিঠিখানা অমরেশের হাতেও পড়েছিল,—তার জন্যে তুমি আমায় ক্ষমা ক'রো।

বিস্ফারিত চক্ষে ভয়ে ও বিস্ময়ে মায়ালতা প্রশ্ন করলে, কী চিঠি?

সে তোমার চরিত্র সম্বন্ধে, তুমি কিছু মনে ক'রো না। তোমার নির্ম্মল চরিত্রে আমি কলঙ্ক দিয়েছিলুম।

সুরপতিবাবুর কাছে?

হ্যাঁ মায়ালতা, তার জন্যে আমি অনুতপ্ত।

মায়ালতা একদিকে তাকিয়ে পাথরের মতো নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। সুরপতির অবহেলার রহস্যটা তার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল! কই অমরেশও ত তাকে একথা বলেনি! বলা দূরে থাকুক, নীরবে সেই মহৎপ্রাণ যুবকটি তার সংস্রব ত্যাগ ক'রে চ'লে গেছে।

নিশ্বাস ফেলে মায়ালতা বললে, অমরেশ এখন কোথায়, জানেন?

সুরেশচন্দ্র বললেন, তার কাছেও আমার লজ্জা আছে। একদিন কল্‌কাতার পথে দাঁড়িয়ে সে আমাকে অপমান করলে, হয়ত সে-অপমানের যোগ্যই আমি, তবু তার কাছেও ক্ষমা চেয়েছি। আজ তার জন্যও আমি দুঃখিত মায়ালতা।

মায়ালতা তার দিকে তাকালো। সুরেশচন্দ্র বললেন, এই দু'মাসের মধ্যে তার অনেক বিপদ্ গেছে। তার বাবা মারা গেলেন নিউমোনিয়ায়, মা গেলেন কলেরায়। বেচারী মাতৃপিতৃহীন। দিন পনেরো আগে আসবার সময়ে তার অসুখ দেখে এসেছি।

মায়ালতা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললে, এখন সে কেমন আছে?

ঠিক জানিনে। ওই যে আমাদের গাড়ী এসেছে, তোমার ত এখনো টিকিট করা হয়নি?

মায়ালতা বললে, আপনারা যান্, আমি শিমুলতলায় যাবো না।

ও, যাবে না? অসুবিধে আছে বুঝি?

আমি কল্‌কাতায় যাবো।

সুরেশচন্দ্র খুশী হয়ে বললেন, গাড়ী-ভাড়া তোমার আছে, না আমি দিয়ে দেবো?

তাঁর মুখের দিকে মায়ালতা একবার তাকালো, পরে বললে, আপনার পুরনো স্বভাবটা ছাড়ুন।—এই ব'লে সে সুরমার কাছে স'রে গেল। তারপর সুরমার হাত ধ'রে হেসে বললে, তোমাকে বাদ দিয়ে কথা বলছিলুম, অভদ্রতাটা ক্ষমা ক'রো ভাই। আমার একটা মামলায় তোমার স্বামীকে আসামী দাঁড় করাবো, তাই ওঁকে ধমক দিচ্ছিলুম।

সুরমা কেবল হেসে বললে, যাবেন ত সঙ্গে?

না ভাই, এবার আর হলো না! কল্‌কাতার একটা দুঃসংবাদ পেলাম, পরের গাড়ীতেই আমাকে ফিরে যেতে হবে। তোমাদের গাড়ী এসেছে, আর দেরী ক'রো না।

সে কি কথা, এই যে বললেন—

সুরমার চিবুক নেড়ে দিয়ে মায়ালতা বললে, আবার দেখা হবে।—এই ব'লে নিজের স্যুটকেসটা সে হাতে তুলে নিল।

সুরেশচন্দ্র সপরিবারে গাড়ীতে উঠলেন। এক সময়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন, আপনার গাড়ী সাড়ে এগারোটায়, সকালে কল্‌কাতায় পৌঁছবে,—প্যাসেঞ্জার।

ধন্যবাদ! ব'লে মায়ালতা দ্রুতপদে চলতে লাগল। যেতে যেতে তার মনে হোলো, এই লোকটা শিক্ষিত, এই লোকটা ভদ্র সমাজে সম্মানিত, এই লোকটার চেহারায় পালিশ, ব্যবহারে সৌজন্য; কিন্তু এ যে মানবসমাজের কত বড় শত্রু, মনুষ্যত্বের কত বড় আততায়ী,—এ কেবল সেই জানে।

দশ

ঘুম ভাঙলো ভোর বেলায়! ট্রেণ এসে দাঁড়ালো হাবড়া ষ্টেশনে। শরীরে তার জড়তা কাটেনি, গত রাত্রির ক্লান্তি আর অবসাদে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছন্ন। ট্রেণে তার কখনো ঘুম আসে না, মনে থাকে ভয় আর অস্বস্তি, অতি সতর্কতায় সে থাকে সজাগ। কাল রাত্রে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত সে একটানা বসেছিল, কত চিন্তায় ও কত কল্পনায় কাট্‌তে লাগল প্রহর, অন্ধকারে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে দিয়ে অর্থহীন চিন্তায় সে তন্ময় হয়েছিল। তারপর কখন্ যেন সে মেয়ে-কাম্‌রার বেঞ্চে নেতিয়ে পড়েছে, সে-কথা আর মনে নেই। নিজের সম্বন্ধে নিজের দায়িত্বের বাঁধনটা তার যেন শিথিল হয়ে গেছে। ভয় সে আর কেন করবে? সতর্কতার আর অর্থ কি? জীবনের চলস্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দাও, যা হবার হোক্, আসুক ভয়, আসুক বিপদ্। বৈরাগ্য নয়, তাচ্ছিল্য এসেছে নিজের প্রতি। সে যেন ফিকে হয়ে গেছে, তার যেন আর কোনো স্বাদ নেই, তার মূল্য গেছে ক'মে।

প্ল্যাট্‌ফরমে একে একে লোক নেমে চ'লে গেল, তাকে নিয়ে যাবার কেউ নেই। বাস্তবিক, সে যাবেই বা কোন্‌দিকে? আবার সেই পুরণো জীবন, সেই উদ্বেগ আর সংগ্রাম, সেই সুরেশচন্দ্রের সংসর্গ। না, সে আর ভালো লাগবে না। চাকরি যদি করতেই হয়, তবে অন্য জায়গায়। এমন এক জায়গায় যেখানে বেতন অল্প, পরিশ্রম বেশি, অবসর সামান্য! অন্ন-সংগ্রাম ছাড়া আর কোনো চিন্তা মাথায় নেই। এমন অবস্থাটাই তার পক্ষে ভালো। সে নিরক্ষর হ'লে অনেক সুবিধা ছিল। সাধারণ মেয়ের মতো সে খুশি থাক্‌তো বিবাহিত জীবন নিয়ে,—অলঙ্কার-আভরণ, কেরাণী স্বামী, বৃদ্ধা শাশুড়ী, দু'চারটে রুগ্ন সন্তান, মুখরা ননদ, যন্ত্রণা-দায়ক বিধবা পিসী,—অন্তত নিজের

জন্য দুশ্চিন্তা থাকৃত না। চোখ বুজে বয়সটা কাটিয়ে দিত, জীবনসমস্যা এসে ভীড় করত না। বিদ্যা অর্জ্জন ক'রে তার দুঃখ বেড়েছে। অল্পে সে তুষ্ট নয়, মানুষের ফাঁকি তার চোখে ধরা পড়ে, আদর্শ হয়েছে তার বড, জীবনকে সমালোচনা করার দিব্য দৃষ্টি তার খুলে গেছে।

আঁচল দিয়ে মায়ালতা চোখের জল মুছে ফেললে। এই অশ্রুটা রহস্যময়! জাগ্রত অবস্থায় সে কঠিন, সে সবল, দুনিয়ায় তার পরোয়া নেই, তার ব্যক্তিত্বের পরিমণ্ডলটা প্রবল দাম্ভিকতায় ভরা, কিন্তু নিদ্রায় সে শিশুর মতো নিরুপায়, সে যেন অদ্ভুত পরমুখাপেক্ষী; হৃদয় যেন তার কণ্ঠের কাছে উঠে এসে কাঁদতে থাকে। এই অশ্রু তার সেই তন্দ্রার অসতর্ক মুহূর্ত্তে কোন্ সময়ে গড়িয়ে এসেছে। বাস্তবিক, এ পৃথিবীতে সে যেন এক নূতন জীব, সে বিচিত্র, কোনো কিছুর সঙ্গে তার মেলে না, সংসারের সর্ব্বত্রই সে যেন বেমানান।

—এ মাইজি, গড়ীসে উত্রো ঝাড়ু দেঙ্গে।—গলার আওয়াজে তার চমক ভাঙল। মায়ালতা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে নেমে পড়লো। ষ্টেশনের অনেকেই তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, তার ভ্রূক্ষেপ নেই। স্যুটকেসটা মাঝে এক জায়গায় নামিয়ে ঘোমটা সরিয়ে মাথার চুলটা সে বেঁধে নিল, জামার বোতাম এঁটে দিল। তার ভাবভঙ্গীটা জনসাধারণের অপরিচিত, স্ত্রীলোককে তারা লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে চলতেই দেখেন এমন সুন্দরী মেয়ের পাহারায় পুরুষ নেই, এতেই তাদের বিস্ময়। কিছুদূর গিয়ে আবার তাকে দাঁড়াতে হোলো—কোমরের কাপড় আল্গা হয়ে গেছে। প্লাট্ফরমে দাঁড়িয়ে সে কাপড় পরলে। এমন সময় একজন ঝাড়ুদার দৌড়ে এসে ডাকলে—মাইজি, এ জুতি আপকা হ্যায়?—মায়ালতা মুখ ফিরিয়ে দেখলে, হ্যাঁ, তারই চটি! মনে নেই, খালি পায়েই সে গাড়ী থেকে নেমে এসেছে। চটিজুতোটা পায়ে দিয়ে আঁচল খুলে সে ঝাড়ুদরকে চার আনা বক্‌শিস্ দিলে। সে ছোক্‌রা সেলাম জানিয়ে গেল।

একটি লোক অনেকক্ষণ থেকে তাকে লক্ষ্য করছে। টিকিট দিয়ে গেট থেকে বেরিয়ে আসতেই লোকটি কাছাকাছি এলো। অন্যমনস্ক মায়ালতা তাকালো তার দিকে। তার দৃষ্টিতে অর্থ নেই, জিজ্ঞাসা নেই, কৌতূহল নেই। লোকটি হাসলে, ভঙ্গী করলে, তারপর মধুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, ফেলে পালিয়েছে বুঝি? ভয় কি?

কে ফেলে পালালো? কে পেলো ভয়? মায়ালতা হঠাৎ হাস্যমুখে বললে, কি বলচেন?

লোকটা একটু আস্কারা পেয়ে বললে, কল্‌কাতায় অনেক দেখবার জিনিস আছে। আমি সব দেখাতে পারি।

মায়ালতা এদিক ওদিক তাকালো। তারপর বললে, চিড়িয়াখানা আছে?

আছে বৈ কি, যদি দেখতে চান্ আমি নিয়ে যেতে পারি।—লোকটি উৎসাহিত হয়ে উঠলো।

বাঁদর আছে সেখানে? কল্‌কাতার বাঁদরগুলো শুনেছি খুব বুদ্ধিমান্!—এই ব'লে মায়ালতা এগিয়ে চল্‌ল। ষ্টেশন্ থেকে বেরিয়েই দেখা গেল, মোটর-বাস্ প্রস্তুত। নম্বরটা দেখে সে একখানা বাসে উঠে বসলো।

লোকটা এবার একটু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো। তারপর চোখচোখি হতেই অত্যন্ত লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, কই, চিড়িয়াখানা দেখাবেন বললেন যে?

মায়ালতা বললে, দেখা ত হোলো।

গাড়ী ছেড়েছে। লোকটা তার সঙ্গে সঙ্গে এসে বললে, কই দেখলেন?

মায়ালতা তার দিকে চেয়ে খিল-খিল ক'রে হেসে মুখ ফিরিয়ে নিলে। গাড়ী ছুটলো। লোকটা ফুট্‌পাতের উপর দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। কলিকাতার বুদ্ধিমান্!

গাড়ী ছুটছে। অনেকদিন পরে শহরের দৃশ্যটা নূতন লাগছে। মায়ালতার অজানা কিছু নেই, তবুও মনে হচ্ছে এদের সঙ্গে কোথায় যেন তার একটা

সুদূর ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে। পথঘাটগুলির সঙ্গে তাকে যেন আবার নূতন ক'রে পরিচয় করতে হবে। যে পল্লীগ্রামে দীর্ঘদিন সে বাস ক'রে এলো, তার ছায়াটা যেন এসেছে তার সঙ্গে। তার কাপড়ে-চোপড়ে, তার মুখে চোখে, মাথার চুলে, তার সর্ব্বাঙ্গে শালবনের সেই মৃত্তিকার প্রলেপ মাথানো। শহরের চাকচিক্যের সঙ্গে সে গ্রাম্যতা মেলে না। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই, তার হৃদয় মর্ম্মান্তিক আঘাত খেয়ে এবার নিজের লজ্জা ও জড়তা কাটিয়ে উঠেছে। তার মোহতন্দ্রা ঘুচেছে। যেখানে সম্মান নেই, সেখানে নেই ভালোবাসা। যে-দেবতা প্রসন্নময়, তাঁর নিকট আত্ম-নিবেদন গৌরবজনক। থাক্ সুরপতি, রাজা হয়ে থাকুন তিনি আপন রাজ্যপাট নিয়ে, দেশকে তিনি উন্নত করুন, করুন জাতির সেবা আর সমাজের হিতসাধন, অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য পালন ক'রে তিনি সুখে থাকুন—তাঁকে মনে মনে নমস্কার জানিয়ে মায়ালতা বিদায় নিলে। এ পৃথিবী ছোট নয়, আকাশ নয় সঙ্কীর্ণ, নদী এখনো কলস্বনা, দক্ষিণ বাতাস সুন্দর, তরুলতায় ফুল ধরে, মানুষের বুকে আজো আছে অনন্ত আশা!

গাড়ী ছুটেছে কোন্ পথ দিয়ে কোন্ পথে। কিন্তু আশা যে ছলনাময়ী! জীবনের সকল কামনা কি তার শেষ হোলো? অদম্য উৎসাহ নিয়ে নদী নেমে এসেছিল পর্ব্বত বিদীর্ণ ক'রে কিন্তু পথ হারিয়ে মরুভূমির ভিতরে সে ম'রে গেল? কেন? কে দায়ী তার জন্য? কে করলে অবিচার? চেয়েছিল সে সুন্দর জীবন, কেন হোলো সে জীবন ছিন্নভিন্ন? মায়ালতা স্তব্ধ হয়ে চলন্ত বাসের একটা সীটে ব'সে রইল। তার মনে এই মর্ম্মান্তিক প্রশ্নগুলি জলবুদ্বুদের মতো একটির পর একটি ফুটে উঠতে লাগল।

সুন্দর জীবনের অর্থ কি তার কাছে? জীবন সুন্দর হয়ে ওঠে কখন্? স্ত্রীলোকের হৃদয়ের ভিতরে এই অদ্ভুত স্বপ্ন বাসা বাঁধে কেন? মায়ালতা পথের দিকে তাকালো। সেই অতি পরিচিত চলমান সংসারের প্রবাহ, লোকযাত্রা চলেছে অশ্রান্ত, জীবন অবিরাম কর্ম্মমুখর। এর ভিতরে কী

তত্ত্ব আছে? মানুষ কী চায়? অগ্রগামী নরনারীর দল, কেবল সেই কি প'ড়ে থাকবে পিছনে? হ্যাঁ, সে চেয়েছে নদীর মতো জীবন, নিত্য ঐশ্বর্য্যময়, লোকালয় ও জনপদকে করবে ফলবান, আপন অফুরন্ত প্রাণের রসে পথের দুধারে সৃজন ক'রে চলবে। জীবনকে প্রয়োজনীয় মনে করবে, বিশ্বসৃষ্টির ছন্দের মধ্যে আনবে, এই তার কামনা।

কন্‌ডাক্‌টর টিকিট চাইলে। তাকে পয়সা দিয়ে টিকিট নিয়ে মায়ালতা ব'সে রইল।

অথচ এই কামনার পিছনে রয়েছে একটা অতি স্থূল প্রশ্ন! তার আশ্রয় কোথায়? পুরুষের আশ্রয় তার সৃষ্টি, তার সভ্যতা; তার নব নব ভাবধারা। এই পথ-ঘাট, ওই পণ্যসম্ভার, যানবাহন, মানুষের নিত্য প্রয়োজনের বিভিন্ন সামগ্রী; আকাশে উড়ো জাহাজ, সমুদ্রে জলযান, শিল্প-সাহিত্য, রাষ্ট্র-চৈতন্য—সভ্যতা ও পরিশীলনের সমস্ত উপকরণ পুরুষের সৃষ্টি। অরণ্য উচ্ছেদ ক'রে নগর বসিয়েছে পুরুষ, মাটির বুক' থেকে ছিনিয়ে এনেছে ধনসম্ভার, নব নব দেশ ও জাতি তার আবিষ্কার; সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রের গতিরহস্য তার করতলগত, তার হাতে ধ্বংস ও সৃষ্টি, তার হাতে প্রেম ও নিষ্ঠুরতা; দস্যু হয়ে সে ভোগ করে, সন্ন্যাসী হয়ে ত্যাগের বাণী শোনায়। পুরুষ অপূর্ব্ব, পুরুষ বিচিত্র! এমন মিথ্যা কথা কে বলেছে' মেয়েরা তাদের শক্তি জোগায়? যারা জন্মাবধি নিঃশক্তি—শরীরে, মনে, হৃদয়ে, চরিত্রে, চিন্তায়—শক্তি তারা আহরণ করেছে কবে? পুরুষের শক্তি সহজাত, তাদের শক্তিতে মেয়েদের অস্তিত্ব, তাদের বীর্য্যে স্ত্রীলোকরা সঞ্জীবিত নারীর স্বাতন্ত্র্য নেই, শক্তিহীনের স্বাতন্ত্র্য কোথায়? নারীর আশ্রয় দেহ, যারা সৃষ্টি করে না তাদের আশ্রয়ে অধিকার কি? একথা কে অস্বীকার করবে যে, স্ত্রীলোক চিরদিন পরাশ্রিত, পরধর্ম্মাবলম্বী, পরাধীন ও পরমুখাপেক্ষী নয়? পুরুষের যোগ্য হয়ে ওঠার জন্য তাদের শিক্ষা-অর্জ্জন, পুরুষকে খুশি করবার জন্য তাদের আপ্রাণ সাধনা। পুরুষের আনন্দের জন্য তারা হয়

প্রিয়া, ভোগের জন্য তারা হয় প্রিয়তমা, সেবার জন্য তারা হয় দাসী,—পুরুষকে লালন করবার জন্য তারা ধরে মাতৃমূর্ত্তি !

আশ্রয় তার নেই, আশ্রয় সৃষ্টি করার সহজ শক্তি তার পক্ষে নেই, সে স্ত্রীলোক। তার দম্ভ খর্ব্ব হয়েছে, আত্ম-স্বাতন্ত্র্যের অলীক আশা তার ঘুচে গেছে। আজো সময় আসেনি, এখনো দেশের মন তৈরী হয়নি, মেয়েদের পথ আজো বন্ধ। তার জীবনাবধি কালের মধ্যে সেই প্রবল আলোড়ন কি দেখা দেবে, যার প্রচণ্ড তরঙ্গে পুরাতন যা-কিছু সব যাবে ভেসে? যাবে প্রচলিত নীতি, সংস্কার, সকল বন্ধন, সমস্ত জীর্ণ শৃঙ্খলা? কবে বাধবে সেই সর্ব্বনাশী যুদ্ধ, যে-যুদ্ধ আন্‌বে সমাজ-বিপ্লব, ভয়াবহ জীবনসংগ্রাম, নরনারীর সমানাধিকারবাদের বিচিত্র সমস্যা? বিপ্লব না হ'লে নূতন সৃষ্টি নেই, যুদ্ধ ও মৃত্যু না হ'লে জীবনের সত্যকার মূল্য জানা যাবে না, সংস্কারের ধ্বংস না হ'লে নারীর নূতন আশ্রয়ের আশা নেই। তার জীবদ্দশায় সেই ভয়ঙ্কর বিপ্লব কি দেখা দেবে না?

গাড়ী এসে থাম্‌ল, আর যাবে না। ঝাঁকানি খেয়ে মায়ালতার চমক ভাঙলো। গাড়ীর এতগুলি যাত্রী এতক্ষণ তার দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিল, সে বুঝতে পারেনি। হটাৎ সে অনুভব করলে, উত্তপ্ত অশ্রু তার গাল বেয়ে নেমে এসেছে। তাড়াতাড়ি সুট্‌কেসটা হাতে নিয়ে সে গাড়ী থেকে নেমে পড়লো। আঁচল দিয়ে অশ্রু মুছলো।

কিছুদূর এসে থমকে দাঁড়ালো। সকল পথই তার চেনা, কিন্তু পা দুটো যেন অচল! শরীরে জ্বালা ধরেছে, স্নান না করলে আর চলছে না। হরিহর দাদার সেই পুরনো বাড়ীতে গিয়ে সে এখনকার মতো উঠবে, স্থির করলে। কিছুক্ষণ তার বিশ্রাম চাই, নিদ্রা চাই। একখানা রিক্‌সা দাঁড়িয়েছিল, মায়ালতা হাত বাড়িয়ে তাকে ডাকলে। লোকটা গাড়ী নিয়ে এসে দাঁড়ালো। মায়ালতা তার উপর উঠে ব'সে বললে, দর্জ্জিপাড়া চলো।

কিছুদূর গিয়ে রিক্সাওলাকে দাঁড়াতে হোলো। লোকজনের ভীড়ে পথ বন্ধ। পথের চারিদিকে একটা গোলমাল উঠেছে। কতকগুলি ছেলের সঙ্গে কতকগুলি মেয়ে ফুটপাথের ধারে দাঁড়িয়ে। লোকে লোকারণ্য। শোনা গেল, আইন অমান্য আন্দোলন চলছে, জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি বেআইনী ঘোষিত হয়েছে। খানাতল্লাসী চল্‌ছে। মায়ালতা বললে, এই, গাড়ী ঘুরিয়ে নাও, অন্য পথে চলো।

গাড়ী ঘোরাতেই একেবারে এক দল মেয়ের মুখোমুখি। তাদের মধ্যে একটি মেয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, ওমা, মায়াদি, তুমি যে এদিকে? নামো নামো, গাড়ী ছেড়ে দাও—

মায়ালতা বললে, তুমি কেন এদিকে, সুপ্রভা?

মেয়েটির হাতে কতকগুলি খাতাপত্র। সেগুলি সে আঁচলের তলায় তাড়াতাড়ি লুকিয়ে গাড়ীর কাছে এসে বললে, আমাদের সমিতি ভেঙে গেছে। কথা বলবার সময় নেই ভাই, পালিয়ে যাচ্ছি। তুমি কাজ করবে আমাদের দলে?

হাত বাড়িয়ে মায়ালতা তাকে টেনে রিক্সার উপর তুলে নিলে। বললে, চলো অন্য রাস্তায়।—রিক্সা ছুটতেই সে পুনরায় বললে, কি কাজ করবো তোমাদের দলে, সুপ্রভা?

সুপ্রভার চোখে মুখে প্রবল উৎসাহ আর উত্তেজনা। বললে, করবে কিনা বলো, কাজ অনেক, আমি আজ দুপুর পর্য্যন্ত মেয়ে রিক্রুট্‌ করবো। ভীষণ কাণ্ড—

কেন?

ওমা, কী ভাই তুমি? জানো না আজ 'স্বাধীনতা দিবস?' মনুমেণ্টের তলায় আজ পতাকা উত্তোলন! আজ মেয়েদের দলে স্বনামধন্য শশীরেখা দেবী বক্তৃতা করবেন।—এই ব'লে সুপ্রভা চঞ্চল হ'য়ে পথের চারিদিকে তাকাতে লাগলো। যুদ্ধের ঘোড়া যেন সুরাপান ক'রে এসেছে।

মায়ালতা বললে, আমায় নিতে চাও?

হ্যাঁ, অবিশ্যি।

কি কাজ করবো?

সুপ্রভা বললে, এখন কিছু না। খদ্দরের শাড়ী প'ড়ে আসবে, হাতে দেবো তিনরঙা জাতীয় পতাকা, তারপর দলের মধ্যে দাঁড়িয়ে ফ্ল্যাগ্ উঁচিয়ে চেঁচাবে, 'বন্দে-মাতরম্!' কিন্তু প্রাণ গেলেও কোনোরকমে নন-ভায়োলেন্স-নীতি ভঙ্গ করবে না—বুঝলে!

যন্ত্রচালিতের মতো মায়ালতা বললে, বেশ, রাজি হলুম। এখন তবে আর বাসায় ফিরবো না, ইস্কুলে গিয়ে স্নান করবো, তুমি যাবে না স্কুলে?

সুপ্রভা বললে, ও-ইস্কুলে আমি আর ঢুকবো না, কাজ ছেড়ে দিয়েছি।

বিস্মিত হয়ে মায়ালতা বলে, সে কি, কেন?

সুরেশবাবুর সঙ্গে বিবাদ। রামো, ওখানে মাষ্টারী করলে মেয়েদের সম্মান থাকে না!

মায়ালতা হাসলে! বললে, রাখতে জানলে থাকে। যাক্, তোমার দেখা কোথায় পাবো?

সুপ্রভা বললে, আমার দেখা? তাইত। আচ্ছা, এক কাজ করো; ঠিক বেলা তুটোর সময়ে শ্যামবাজারের মোড়ে পানের দোকানের সামনে—কেমন? যেন দেরি না হয় মায়াদি, আমি অপেক্ষা করবো দশ মিনিট। এই, রাখো।

রিক্সা থামতেই সুপ্রভা নামলো। তারপর বললে, আচ্ছা নমস্কার,' ঠিক সময় এসো। আমাদের লীডার সতীশদার সঙ্গে সেই সময় পরিচয় করিয়ে দেবো।—আঁচল তুলিয়ে দ্রুতপদে সে একদিকে চ'লে গেল। তার অনেক কাজ, সমগ্র দেশ ও জাতি তার মুখ চেয়ে রয়েছে।

স্কুলে এসে যখন মায়ালতা পৌঁছল, তখন সাড়ে ন'টা বাজে। একটু পরে স্কুল বসবে। ভিতরে যেতেই চারুবালা সোম তাকে অভ্যর্থনা করলেন। হাত ধ'রে বললেন, এতদিনে গরীবদের মনে পড়লো। মায়াদি? আপনার কাজ আপনি নিন, আমার ছুটি।

মায়ালতা বললে, আগে স্নান করবো, তারপর অন্য কথা।

এই যে, সব আমার প্রস্তুত। ও মানদা, কোথায়, এদিকে এসো। তেল সাবান দাও, কাপড় দাও।

আদর আপ্যায়নের ত্রুটি নেই। একথা মায়ালতা এখন জানালো না যে, চাকরি সে আর এখানে করবে না। দেশের কাজে সে নামবে, সুপ্রভা তাকে অভিভূত ক'রে গেছে! সে যখন স্নান ক'রে উঠে এলো, চারুবালা তখন জানালেন, আপনার পাঁচ মাসের মাইনে প্রায় তিনশো টাকা আমার কাছে রয়েছে মায়াদি। কাপড় ছাড়ুন, এখনি টাকা বের ক'রে দিচ্ছি।

মায়ালতা বললেন, পুরো মাইনে কি আমার পাওয়া উচিত? জানো ত, বলতে গেলে বিনা নোটিশেই—

চারুবালা হেসে বললেন, এ ব্যবস্থা সুরেশবাবু ক'রে গেছেন। আপনার টাকা কমিটীর কাছ থেকে এনে আমার কাছে জমা রেখে তবে তিনি গেছেন শিমুলতলায়। আপনি চিঠিপত্র তাঁর পেয়েছেন মায়াদি?

চিঠিপত্র? সুরেশবাবুর? তিনি আমাকে চিঠি দেবেন কেন চারুবালা?

না, আমি এমনিই বল্‌ছি।—চারুবালা আহারের আয়োজন করতে গেলেন।

বেলা বারোটা আন্দাজ, এক রাশি টাকা জামার ভিতরে পুরে মায়ালতা পথে বেরোলো। পরিচ্ছদের আড়ম্বরটা কম নয়। দামী খদ্দরের শাড়ী, লাল সবুজ রঙে মেশানো পাড়, গায়ে মুর্শিদাবাদ সিল্কের ফুলকাটা ব্লাউস, পায়ে কালো মকমলের ফিতে লাগানো বর্মাস্লিপার। মুখের মালিন্য গেছে কেটে, আজ সে-মুখের ভিতরে হয়েছে সূর্য্যোদয়। এলো খোঁপাটা পিছন দিকে ফেরানো, মাঝে মাঝে বাতাসে ঘোমটা খ'সে গিয়ে খোঁপাটা নজরে পড়ছে। বাস্তবিক, দেশের কাজের কথাটা এতদিন তার মনে পড়ে নি, এই আশ্চর্য্য! পাঁচ মিনিটে সুপ্রভা বুঝিয়ে দিয়ে গেল, স্বরাজলাভ-করার কৌশলটা। আজকে তার নূতন উৎসাহ দেখা দিয়েছে। হৃদয় নিয়ে কান্নাকাটি ক'রে কতগুলি দিনই সে নষ্ট করেছে। সব মিথ্যা, সমস্ত ছেলেখেলা। ভালোবাসার ব্যাপারটা যৌবনকালের

দুঃস্বপ্ন, যৌন প্রকৃতির আত্মতাড়না। ছি ছি, কত ছোট সে হয়ে গিয়েছিল! এবার তার আর কোনো পিছুটান নেই, বন্ধন নেই, সে মুক্তি পেয়েছে, দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করবে সে। সুপ্রভা মূর্ত্তিমতী আশীর্ব্বাণীর মতো এসেছিল, তাকে ঠেলে দিল কর্ম্মের পথে, মহান্ আদর্শের দিকে। বিধাতার মনে অবশ্যই কোনো বৃহৎ উদ্দেশ্য আছে। অনেক দুঃখের পর এবার সে কূল পেয়েছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

অমরেশের সংবাদটা তার আগে নেওয়া দরকার। একথা সে একবারো ভোলেনি, তার কবিবন্ধু অসুস্থ। শেষরাত্রে সেই যে গ্রাম থেকে পালিয়ে এসেছিল, তারপর কবির আর সন্ধান মেলেনি। আজ তার সঙ্গে নূতন ক'রে সাক্ষাৎ হবে। কিন্তু সময় বড় অল্প। কুশল সংবাদ নেবে আর টাকাগুলো তার কাছে জমা রাখবে—বাস্ তার পরে অনেকদিনের মতো বিদায়! কারাবরণ তাকে করতেই হবে, অন্য পথ নেই!

কিন্তু এই সাজসজ্জার চাকচিক্যটা? কবি করবে ব্যঙ্গ-কৌতুক,—উত্তরে সে বলবে, এই সজ্জাই শেষ, আজ আমার বড় সাধ হয়েছিল নিজেকে সুন্দর ক'রে প্রকাশ করার। আজ আমি যুদ্ধে চলেছি, কবি। অমনি কবি তার গলায় হাত রেখে বলবে, বিচিত্ররূপিণী তুমি, হে বিচিত্রা! এসো, আবরণ খোলো, শেষবার তোমার ছবি এঁকে নিই। তোমার সুগোল হাত দুখানা লাবণ্য রসে ভরা, দেখে দেখে আমার বুকের রক্ত টলমল ক'রে ওঠে; তোমার কালো পল্লবের নীচে দীর্ঘায়ত চোখ আমার নিত্যকালের স্বপ্ন; তোমার কঠিন কোমল স্তনাগ্রভাগে আমার মহামরণ; তোমার রাগ-রঞ্জিত চরণক্ষেপ আমার প্রাণস্পন্দনকে দ্রুততর করে!

আনন্দটা যেন তার সর্ব্বাঙ্গে তরঙ্গ তুলছে। আজ কবির কাছে তার আকস্মিক আবির্ভাব আর নাটকীয় বিদায়। বিদ্যুতের মতো জ্ব'লে উঠবে, তারপর সব অন্ধকার। কবি লিখবে কবিতা। বলবে, 'নয়ন সম্মুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই!"

সময় নেই। দ্রুত, উর্দ্ধশ্বাসে, চপল চরণে,—লোকভয়, লজ্জাভয় এখন আর চলবে না। অমরেশের বাড়ীর দরজায় সে এসে দাঁড়ালো। কিংকর্তব্যে কড়া নাড়লো। সুসজ্জিত সুরূপা মেয়ে এসে ডাকছে এক তরুণ কাকে, অর্থটা সুস্পষ্ট। তবু সময় নেই, লোকের চাহনির শাসন আজ তাকে মানতেই হবে।

একটি চাকর বেরিয়ে এলো। বললে, ও, আপনি? কই, তিনি ত বাড়ী নেই?

কোথায় গেছেন?—মায়ালতা প্রশ্ন করলে।

অসুখ শরীরে বেরিয়েছেন। আর বলবেন না, দিন নেই রাত নেই, ছেলের দল আর মেয়ের দল এসে হাঁকাহাঁকি। তাঁর কাছে সবাই আসে পন্থ লেখাতে। বল্‌তে পারব না আপনাকে কখন্ তাঁর সঙ্গে দেখা হবে।

বাড়ী ফিরবেন ত?

কে জানে, দু'দিন হয়ত বাড়ী এলেন না, এমনো হয়েছে। বাবু আর মা মারা গিয়ে উনি আর কিছুর পরোয়া করেন না!

মায়ালতা প্রশ্ন করলে, অসুখটা কি?

চাকর বললে, ডাক্তার বলে নিশ্বাসের অসুখ। এত টাকা বাবুর হাতে এসেছে, কিন্তু নিজের চিকিৎসে করার কোন চেষ্টা নেই। এমন করলে কি শরীর টিঁকবে?

এখানে তার কাজকর্ম করে কে?

আমাকেই সব করতে হয় দিদিমণি। ছোটবাবু বলছেন, এ বাড়ী শীঘ্র ছেড়ে দেবেন।

দরজা থেকে মায়ালতা ফিরলো। হঠাৎ যেন একটা নিরুৎসাহ এসে দাঁড়ালো, মনটা ভেঙে গেল। হাউইয়ের মতো তার উত্তেজনাটা পুড়ে ছাই হলো। এখন তার এই সাজসজ্জার আর অর্থ কি? পুরুষের প্রশংসমান দৃষ্টিতেই মেয়েদের অলঙ্কার আভরণ সার্থক হয়ে ওঠে! সে যেন মরে গেল

তার সর্ব্বাঙ্গে আর যেন কোনো সৌরভ নেই, তার পাপড়িগুলি গেল ঝঁউরে। এখন আর দেশের কাজে নামার মানে নেই, স্বাধীনতায় নেই আগ্রহ, তিন রঙা জাতীয় পতাকার জৌলস গেল ধুয়ে। কেন নামবে সে জাতীয় আন্দোলনে, জাতীর কাছে তার ঋণ কোথায়? কারাবরণ করলে তার কী লাভ? স্বাধীনতা যেদিন আসবে, সেদিন তার সমস্যা ত এমনিই থাকবে! আজ যারা দেশের নেতা, কাল তারা ক্ষমতা পেয়ে স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী হয়ে উঠবে না, এই বা কে বল্লে? অন্তত তার আভাস ত পদে পদেই পাওয়া যায়! সেদিন দেশবাসীর বিরুদ্ধেই আবার এই আন্দোলন তুলতে হবে, নিজেদের বিরুদ্ধেই ঘোষণা করতে হবে বিপ্লব ও বিদ্রোহ। ইতিহাস এর সাক্ষ্য!

রৌদ্রে রৌদ্রে মায়ালতা ঘুরে বেড়ালো। শীত কমে গেছে, তার কপালের চুলের গোড়ায় ঘামের বিন্দু জমে উঠেছে। এই বিশ্রী শাড়ীটা যেন তার চলার পথে বাধা। পায়ে পায়ে জড়িয়ে যায়। এই ভরা দুপুরে সাজগোজ ক'রে সে বেরিয়েছিল কেমন ক'রে? রুচিবিকারের চরম! তার ভিতরে একটা কদর্য্য ভোগলোলুপতা আছে, তার চরিত্রে ত্রুটি অগণ্য, সারল্য ও শুচিতার প্রবল অভাব, পুরুষের প্রিয় হয়ে ওঠার জন্য তার কী আপ্রাণ পরিশ্রম! নিজেকে যে ধিক্কার দিলে। যে ছেলেটি অসুস্থ, যে সদ্য পিতৃমাতৃহীন, চরম দুর্য্যোগে যে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়—তার অবস্থার প্রতি সমবেদনা নেই, মমত্ববোধ নেই, বরং তার বাসনার অগ্নিকে ফুৎকার দিয়ে জাগিয়ে তোলার এই জঘন্য প্রবৃত্তি! লজ্জা, লজ্জা, লজ্জাই মেয়েদের ভূষণ! লজ্জার ভারে যারা ভারাক্রান্ত, চিরজীবন পরানুগ্রহে যারা প্রতিপালিত, তারা যাবে আজ 'স্বাধীনতা-দিবস' পালন করতে? স্পর্দ্ধা! নিজেদের দেহের প্রতি যাদের কর্তৃত্ব নেই, যারা বছরে দশমাস সন্তান-ধারণের জন্য বন্দী থাকে, সারাজীবন যারা সতীত্ব রক্ষা করতে করতে কাটিয়ে দেয়, দেহের যৌবনই যাদের অস্তিত্ব রক্ষা করার মূলধন, তারা নামবে আজ জাতীয়

আন্দোলনে ? জাতির কি এত বড় অধঃপতন হয়েছে যে, কতগুলি স্ত্রীলোক লেলিয়ে দিয়ে তারা শাসনতন্ত্রকে অচল করবে ? বীর্য্যবান্ পুরুষ কি নেই দেশে ? কতকগুলি গাভী লেলিয়ে দিয়ে মহম্মদ ঘোরী হিন্দুরাজ্য অধিকার করেছিল, এও কি সেই মনোভাব ?

শ্যামবাজারের মোড়ে এসে যখন সুপ্রভার দেখা পাওয়া গেল, তখন বেলা দুটো বেজে গেছে। আরও চার পাঁচটি মেয়ে ছিল সঙ্গে। সুপ্রভা এই ছোট দলের নেত্রী। কুমারী নীলিমা চাটুয্যের মা কাল রাত্রে গ্রেপ্তার হয়েছেন ; সুতরাং তার বিক্ষোভও কম নয়।

পথের চারিদিকে সেদিন প্রবল জনতা আর শান্তিরক্ষার তোড়জোড়। কল্‌কাতার নাড়ী চঞ্চল। দিকে দিকে শোভাযাত্রা আর 'বন্দে মাতরম্'। দুইধারের বাড়ীগুলিতে জাতীয় পতাকা উড়ছে। ধর্ম্মতলা পার হয়ে সুপ্রভার দল চৌরঙ্গীতে এসে পড়লো।

সমুদ্রের মতো বিরাট জনতা। মেয়েদের দল, ছেলেদের দল। স্বেচ্ছাসেবকের ভীড়। নেতারা মোটরে ঘোরাঘুরি করছেন। মনুমেণ্টের নীচে বিশাল জনস্রোত।

সুপ্রভার দল গাড়ী থেকে নেমে ছুট্‌ল মাঠের ভিতরে। কী আগ্রহ—কী উত্তেজনা ! 'না জাগিলে সব ভারত-ললনা, এ ভারত আর জাগেনা'। তুমুল জয়ধ্বনি আর অভিনন্দন হোলো তাদের প্রতি। মায়ের জাতি আজ নেমেছে যুদ্ধে, আর রক্ষা নাই। আজ সরকারের প্রতি করুণায় মন বিগলিত হয়। অকৃতজ্ঞ ভারতবাসী, যারা তোমাদের দেশে শিক্ষা আর সভ্যতা আন্‌ল, তাদের প্রতি এই রূঢ় আচরণ ? সম্মুখে মনুমেণ্টের রূপ ধ'রে স্তম্ভিত অক্‌টারলোনি সাহেব তোমাদের এই কৃতঘ্নতার দিকে চেয়ে রয়েছেন—মনে রেখো !—মায়ালতা ভিড়ের ভিতরে দাঁড়িয়ে মনে মনে হাসতে লাগল।

ওই দূরে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাচ্ছে। সাবধান। শশী রেখা দেবী

বক্তৃতা করছেন, কিন্তু শোনা যাচ্ছে না। জাতীয় পতাকার সঙ্গে জাতীয় 'শ্লোগান্' ধ'রে চীৎকার করছে সবাই।

ওই—ওই তাড়া করেছে, পালাও, পালাও। আক্রমণ করেনি, মৃদুলাঠি চালনা করছে মাত্র! ছত্রভঙ্গ, বিপর্য্যস্ত, উদ্‌ভ্রান্ত—কে পালাবে কোন্ দিকে! ধুতি খু'লে পড়লো, শাড়ী আল্‌গা হয়ে গেল। য়্যাম্বুলেন্স্ ডাকো, হাঁসপাতাল! ছুট্‌ছে ঘোড়া, উড়ছে ধূলো, ভীষণ জনগর্জ্জন,—বিশাল প্রান্তরে ও পথের চারিদিকে বিধ্বস্ত জনতা ছুটোছুটি করছে। বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খল,উন্মত্ত। মনুমেন্টের চতুর্দ্দিক সব ফাঁকা হয়ে গেল।

সুপ্রভার দলের কে কোথায় গেছে তার ঠিক নেই। কথা আছে হাজতে গিয়ে আবার দেখা হবে। ভিড়ের ভিতরে কয়েকজন নেতা ও স্বেচ্ছাসেবক আহত হয়েছেন। মেয়ে পুরুষের দল তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে হাঁসপাতালে নিয়ে যাবার আয়োজন করছেন।

হঠাৎ জনতার ভিতর থেকে মায়ালতা চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল, অমরেশ, অমরেশ, কবি,—

অর্দ্ধচেতন অমরেশের রক্তাক্ত দেহ ভূলুণ্ঠিত। মায়ালতা ছুটে এসে তাকে ধ'রে তুললে। আঁচল দিয়ে চেপে ধরলে তার কপালের ক্ষতস্থান। বুকের মধ্যে তাকে টেনে বললে, বন্ধু, আমি যে তোমাকেই খুঁজতে এসেছিলুম।—তার গলার ভিতর থেকে আর্ত্তনাদ উঠে এল।

অমরেশের চোখের কাছে গভীর ক্ষত। অন্য চোখ উঠেছে ফুলে। অস্পষ্ট জড়িত কণ্ঠে বললে, কিছু মনে নেই!

গাড়ী এলো সকলকে হাঁসপাতালে নিয়ে যাবার জন্য। কয়েক জন ছেলে ও মেয়ে এসে বললে, ছেড়ে দিন্ অমরেশবাবুকে, ওঁকে হাঁসপাতালে নিয়ে যাবো।

ছেড়ে দেবো?—মায়ালতা তাদের মুখের দিকে চেয়ে কেমন এক অদ্ভুত হাসি হাসলে। পুনরায় বললে, কে তোমরা?

আরে ছাড়ুন, ছাড়ুন, উনি আমাদের দলের। আপনি ওঁর কে হন্?

মায়ালতা তাদের কথা গ্রাহ্য করলে না। জনতার প্রতি সে মুখ তুললে। ক্ষতস্থান চাপতে গিয়ে তার নিজের গাল দু'খানা রক্তাক্ত। মুখ তুলে বললে, আপনারা একটু সাহায্য করবেন, আমি একে ট্যাক্সিতে তুল্‌বো। এই—এই ট্যাক্সি—

সকলের সাহায্যে মায়ালতা অমরেশকে ট্যাক্সিতে তুললে। বললে, ভবানীপুর হাঁসপাতালে চলো।

ছেলেমেয়েরা ছুটে এলো। বললে, কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? উনি আমাদের—

মায়ালতা একবার প্রখর দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকালো। তারপর হাতের জাতীয় পতাকাটি রাস্তায় ফেলে দিয়ে বললে, এই নিয়ে চ'লে যান্।

ট্যাক্সি ছুট্‌লো।

হাঁসপাতালের দরজায় এসে ট্যাক্সি থাম্‌ল। চাপরাশি ছিল দাঁড়িয়ে, তার কাছে খবর পেয়ে দুজন ষ্ট্রেচার নিয়ে এলো, মায়ালতা গাড়ী থেকে নেমে তাদের সবাইকে ভালো বকশিস কবুল ক'রে বললে, সাবধান, ধীরে ধীরে, রোগীর লাগে না যেন। এই যে, এই যে আমি কবি, ভয় কি?

ক্যায়সে চোট্ লাগা, মায়ি?

ময়দানের ভিঁড়ে চোট লেগেছে, বাবা।

ভিতরে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার ক্ষতস্থান পরীক্ষা করলেন। চোখের কোনে গভীর ক্ষত। ডান চোখ নষ্ট হ'তে পারে,—তা ছাড়া মস্তিষ্ক বিকারের সম্ভাবনা। ঔষধ প্রয়োগ ক'রে ডাক্তার ব্যাণ্ডেজ ক'রে দিলেন। তারপর সেখান থেকে বা'র ক'রে পথ দিয়ে ঘুরিয়ে এনে এমারজেন্সি ওয়ার্ডের একটা বিছানায় অমরেশকে শোয়ানো হোলো। মায়ালতা বরাবর তার সঙ্গে সঙ্গে এসে বিছানার ধারে একটা টুল টেনে বসলো। একজন নার্স এসে দাঁড়ালো। প্রশ্ন করল, মোটরে ধাক্কা লেগেছে?

উদ্বিগ্ন চক্ষে মায়ালতা তার দিকে তাকালো। বললে, না, গড়ের মাঠে ভিড়ের মধ্যে উনি ছিলেন—

ওঃ বুঝেছি, 'Independence day!' আপনি কোথায় ছিলেন!

আমি ছিলুম দূরে।

উনি কে হন্ আপনার?

বন্ধু।

নার্স অন্য রোগীর তত্ত্বাবধানে চ'লে গেল। মায়ালতা হাত বাড়িয়ে অতি সন্তর্পণে ও যত্নে অমরেশের গায়ের রক্তাক্ত জামাটা ছাড়িয়ে নিল। এবার অমরেশ মৃদুস্বরে কথা বললে, আমার কোথায় লেগেছে?

মায়ালতা স্বচ্ছ হাসি হেসে বললে, পায়ের আঙুলে। জঙ্গলে সাপ মারতে গিয়েছিলে, ছাগলে পা কামড়ে দিয়েছে!

অনেকক্ষণ পরে অমরেশ বললে, মিছে কথা।

সত্যি বলছি। আর একটু ঘা লেগেছে তোমার হৃদয়ে, বুঝলে কবি? এই নাও আমি সারিয়ে দিচ্ছি।—বলে মায়ালতা তার গালের উপর হাত বুলোতে লাগল।

অমরেশ তার একটা হাত ধরলে। বললে, মায়াদি?

কেন, বন্ধু?

ভাগ্যি তুমি ছিলে। কী যেন ঘটে গেল! তোমার কোথাও লেগেছে?

না, আমার লাগেনি? তুমি চুপ ক'রে শোও। আমি গায়ে হাত বুলিয়ে দিই।

কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে থেকে অমরেশ বললে, কিছু খেতে দাও, আজ আমি কিছু খাইনি।

মায়ালতা উঠে গিয়ে নার্সকে জানালে। নার্স বললে, এখন কিছু খেতে দেবার হুকুম নেই। হ্যাঁ, এবার আপনি দয়া ক'রে বাইরে যান্। পাঁচটা থেকে সাতটার মধ্যে আবার আসবেন। রোজ দু'ঘণ্টা দেখে যাবেন।

কিন্তু এই সময় ফেলে যাবো ?

কি করব বলুন, আমাদের ওপর এই হুকুম। যদি কিছু কথা থাকে ডাক্তারবাবুকে জানাবেন।

আচ্ছা আমি বাইরে অপেক্ষা করছি, পাঁচটার আর দেরি নেই। কিন্তু রোগীর যদি একটু বিশেষ যত্ন নেন্ তবে অত্যন্ত উপকৃত হই। এখন কি খেতে দেবেন ?

না, এখনো শক্ আছে। খেলে বমি হ'তে পারে, তাতে রোগীর অনিষ্ট হবে।

না না, তবে, থাক্। আচ্ছা, আমি এই বাইরেই আছি, দয়া ক'রে একটু দেখবেন।—বলতে বলতে নিতান্ত অনিচ্ছায় মায়ালতা বাইরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো। এখান থেকে অমরেশের বিছানাটা দেখতে পাওয়া যায়।

তার নিজের কাপড়ের আঁচলটা রক্তে রাঙা। গাল দিয়ে সে বন্ধুর ক্ষতস্থানে চেপে ধ'রেছিল, গালের রক্তটা সে এতক্ষণে আঁচল দিয়ে মুছে ফেললে। তার আঘাত লাগেনি, এই কথাই অমরেশ জান্‌ল, কিন্তু আঘাত যদি তার লেগেই থাকে তবে কেউ জান্‌বে না কোনোদিন। শরীরটা তার এখনো কাঁপছে। ভয়ে নয়, অত্যুগ্র উত্তেজনায়। দেশের জন্য জীবন দানের একটা মহৎ অর্থ আছে কিন্তু এই তার চেহারা নয়। সাময়িক উত্তেজনাকে দেশভক্তি কেমন ক'রে বলা চলে ? একদিনের রক্ত দানে বহুদিনের দাসত্বের কলঙ্ক মোছে না। নেশা কেটে যায়, সমস্যা সমস্যাই থাকে।

কিন্তু মেয়েমানুষের মন বিস্ময়কর। তার জীবনের সকল সমস্যা সব চিন্তা আজ একটি জায়গায় এসে কেন্দ্রীভূত হোলো। পথ, ঘাট, ভালো মন্দ, দুঃখ, লাভ ক্ষতি, সংগ্রাম ও বিশ্রাম—আজকে তাদের আর কোনো অর্থ নেই, ছায়ার মতো তারা যেন মিলিয়ে গেছে। মাত্র আজই প্রভাতে ট্রেণ থেকে নামার সময় জীবনকে মনে হয়েছিল ভয়াবহ শঙ্কটবহুল, প্রাণ ধারণ করাটা যেন পৃথিবীতে সকলের চেয়ে যন্ত্রণাদায়ক ঘটনা, মানুষ দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের রথচক্রের নীচে নিরন্তর দলিত হয়ে চলেছে,—কিন্তু বিচিত্র এই

বিশ্বসৃষ্টি, অকস্মাৎ আকাশের কিনারায় ফুটে উঠ্‌ল সোনার শিখন; মন বলছে, পথ আছে, কিছুই নিরর্থক নয়। মায়ালতা পথের দিকে তাকালো। শীতের অপরাহ্ণ, গাছ পালায় রোদ উঠেছে, সম্মুখে জনবিরল পথ—দূরে মাঝে মাঝে মোটরের হর্ণ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না,—হাসপাতালের ভিতরে কোনো কোনো রোগীর অস্ফুট কণ্ঠ,—এদেরই ভিতরে ব'সে তার সমবেদনাময় প্রাণ যেন নূতন ক'রে নিজের সঙ্গে কথা কইতে লাগল। পরের জন্য ভাবা, পরের দুঃখ লাঘব করা, পরের জন্য সেবা—এর চেয়ে বড় পরিচয় আর কিছু নেই। যারা বলেছে, আদর্শবাদীকে স্বার্থলেশশূন্য হ'তে হবে তারা মিথ্যা বলেনি। যারা বলেছে, দুঃখ ও বেদনাই জীবনকে ঐশ্বর্য্য-মণ্ডিত করে, তারা সত্যবাদী। আজ তার আর কিছু কাম্য নেই, তার সব ব্যথা-বেদনা, সমস্ত হৃদয় আর সকল দাক্ষিণ্য একাকার হয়ে মিলেছে ওইখানে—ওই যে আহত হ'য়ে নিরবলম্ব হয়ে নিরুপায় হয়ে মানুষের দাক্ষিণ্যের আশ্রয়ে আশ্রিত। ওই যুবকটিরই বা সংসারে কে আছে? মা বাপ, ভাই বোন, মায়া মমতার নীড়, দুঃখ-সুখের অবলম্বন—ওর ত কিছুই নেই! ওকে যারা স্বাধীনতার যুদ্ধে নামায়, ওকে দিয়ে যারা স্বদেশী গান শেখায়, ওর প্রতিভাকে যারা স্বার্থের দ্বারা শোষণ করে, তারা ওর শুভাশুভের প্রতি লক্ষ্য করবে কেন? যন্ত্রটার প্রয়োজন আছে বলেই যন্ত্রের প্রতি মমতা, সে-যন্ত্র বিকল হ'লে তার আর কিছু মূল্য নেই, সে বাতিল! আজ এই বিপদের দিনে বসেও সকলের প্রতি তার মন কৃতজ্ঞতায় ভ'রে উঠেছে। এখানে কে তাকে আন্‌ল? সুরপতির প্রত্যাখানের ভিতরে ছিল বিধাতার কোন্ ইঙ্গিত? সুরমার সঙ্গে শিমুলতলায় যাবার সম্মতি দেবার পর দেখা হোলো সুরেশচন্দ্রের সঙ্গে, তারপর কল্‌কাতায় ফিরে সুপ্রভার দলে প'ড়ে যাওয়া; ময়দানের ভিড়ে আসা, আহত অমরেশকে খুঁজে পাওয়া,—এদের পিছনে ভাগ্য দেবতার কী রহস্যময় লক্ষ্য লুক্কাইত? তবু আজ সে কৃতজ্ঞতা জানালো—সুরপতি, সুরেশ, সুপ্রভা সকলের কাছে। সবাই তাকে

যেন সাহায্য করেছে, সবাই দিয়েছে তাকে পথের সন্ধান। পরম গৌরবে যেন তার বুক ভ'রে উঠতে লাগল।

কতক্ষণ মায়ালতা বসেছিল,—এক সময়ে ঢং ঢং ক'রে পাঁচটা বাজলো। দ্রুতপদে সে ছুটে এলো অমরেশের বিছানার কাছে। মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, চক্ষু মুদ্রিত, দুর্ব্বল দেহ নিশ্চল হয়ে প'ড়ে রয়েছে। রোগা নয়, স্বাস্থ্যবান চেহারা; এত রক্তপাতের পরেও মুখখানা লালিত্যে টস্ টস্ করছে; হাত দু'খানা বলিষ্ঠ, আঙ্গুলগুলি দীর্ঘ, সুশ্রী; মাথায় ঘন কালো চুলের অরণ্য। মায়ালতা তার মুখের উপরে মুখ এনে চাপা গলায় চুপি চুপি ডাক্‌ল, কবি?

অমরেশ চোখ খুললে। তারপর বললে, তুমি চ'লে যাওনি?

চ'লে যাবো? কোথায় যাবো তোমাকে ফেলে?—মায়ালতার কণ্ঠে যেন অভিমান ফুট্‌ল।

অমরেশ তার দিকে একবার তাকালো, সে চাহনি যেন প্রশ্ন ও কৌতূহলে ভরা। মায়ালতা বললে, কী দেখছ?

অমরেশ বললে, তুমি একা?

আমার কে আছে যে সঙ্গে আসবে?

কেমন ক'রে এলে সেখান থেকে?

মায়ালতা এবার হাসলে। বললে, তুমি ফেলে রেখে পালিয়ে এসেছিলে কিন্তু পথ আমি ভুলিনি। থাক, থাক এখন সে-কথা, কেমন আছো বলো?

ভালো আছি, মায়াদি। কিন্তু—কিন্তু আমাকে নিয়ে চলো এখান থেকে, আর কোনো ভয় নেই। ব'লে অমরেশ মায়ালতার একটা হাত ধরলো।

মায়ালতা বললে, কোথায় নিয়ে যাবো তোমাকে?

কেন, বাড়ীতে?

বাড়ীতে কে আছে তোমার? মা-বাপ নেই, ভাই-বোন নেই, নেই আত্মীয় পরিজন,—এমন শরীর নিয়ে এক চাকরের ভরসায়।

তা বটে। তবে—তবে সবই অভ্যাস হ'য়ে গেছে মায়াদি। অবস্থার সঙ্গে

খাপ খাইয়ে নেবার শক্তি মানুষের অসাধারণ।—ক্লান্তকণ্ঠে অমরেশ চোখ বুজে বলতে লাগল, অনেক দেখলুম। দেশ ছেড়ে আসার দিনে মায়ের আঁচল ধ'রে কেঁদেছিলুম, আজ তাঁর মরণে একটুও লাগল না; বাবা গেলেন, চোখে এক ফোঁটা জলও এলো না,—এমনি ক'রে সবই সয়ে যায়।

মায়ালতা বললে, যে সব ছেলে-মেয়েরা তোমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল ময়দানে, ওরা তোমার কে?

অমরেশ বললে, কেউ না, নতুন পরিচয়। আসে যায়, কথা কয়, গান লেখায়, ইংরেজের অত্যাচারের কথা শুনিয়ে উত্তেজিত করে। ওরা পর, যেমন পর তুমি, যেমন পর আর সবাই। কাউকে যেন ধরে রাখতে না হয়, কাউকে যেন ছেড়ে দিতে কষ্ট না পাই।

এমন সময় ডাক্তার এলেন। অন্য দু একজন রোগীকে পরীক্ষা ক'রে এধারে এসে অমরেশকে পরীক্ষা করলেন। হাতের নাড়ী টিপে মায়ালতাকে বললেন, আপনার রুগী ত ভালোই আছেন।

আপনাদের অনুগ্রহে।—ব'লে মায়ালতা সরে দাঁড়ালো।

পাঁচ-সাত দিনেই উনি আরোগ্য হবেন। যাক্, চোখটা বোধ হয় বেঁচে গেল? যদি ইচ্ছে করেন, রুগীকে ক্যাবিনে রাখতে পারেন,—রাত্রে কাছে থাকার জন্য একজন পুরুষ মানুষকে এলাউ করতে পারি।

তবে তাই ক'রে দিন ডাক্তারবাবু।

বেশ, আসুন আমার সঙ্গে।

অফিসে দু' নম্বর ক্যাবিন ভাড়া করা হোলো। জামার ভিতর থেকে টাকার পুঁট্‌লী বা'র ক'রে মায়ালতা টাকা দিলে। যা কিছু সমস্ত দেওয়াটাতেই আজ যেন তার পরম গৌরব। টাকা গুণে দিতে আনন্দ যেন সে আর ধ'রে রাখতে পারছে না, আজ সে সব দিতে পারলে খুশি হয়, আজ তার সব যাক।

এমারজেন্‌সি দোতলার ক্যাবিনে অমরেশকে নিয়ে যাওয়া হোলো।

পরিছন্ন ছোট ঘর, পরিষ্কার সুন্দর বিছানা, খাবার ও ঔষধ রাখার একটি আলমারি, কয়েকটি কাঁচ ও কলাইয়ের বাসন, একখানি চেয়ার। মায়ালতা উচ্চ মূল্যে একটি চাকর মোতায়েন করলে। একখানা নোট ভাঙিয়ে সকলকে বকশিস দিলে। ডাক্তারবাবু জানিয়ে গেলেন বিপদের ভয় আর নেই। ব্রাণ্ডি মেশানো ঔষধ খাওয়ানো হয়েছে। রাত্রে দুধ খাবে।

অমরেশ চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। তার দুই পাশে খাটের উপর দু'খানা হাত চেপে মায়ালতা তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়লো। গায়ের সঙ্গে গা ঠেকেছে। বললে, অদ্ভুত গন্ধ তোমার গায়ে! রক্তের সঙ্গে মদ, মদের সঙ্গে ওষুধ, তার সঙ্গে তোমার নিজের গন্ধ। বোধ হয় এর নাম নেশা, এর নাম আনন্দ।

অমরেশ বললে, কেন তুমি চ'লে এলে সুরপতিবাবুর ওখান থেকে?

কেন এলুম? আঃ, কী নরম চুল তোমার, কী গভীর!—মায়ালতা অমরেশের মাথার চুলের মধ্যে হাত চালিয়ে বললে, তিনি যে তাড়িয়ে দিলেন!

কেন? অমরেশ ন'ড়ে উঠ্‌ল।—ও জানি, জানি, সেই কারণ। সুরেশদার সেই চিঠি। ওরা সবাই মিলে তোমাকে নীচে নামালো, কেবল তাই নয়, তোমার কপালে দিল কলঙ্ক। কিন্তু মায়াদি, সুরপতিবাবুও—?

যেতে দাও কবি, যেতে দাও। দেবতা তিনি দেবতাই রয়ে গেলেন, নামলেন না মানুষের স্তরে। যেতে দাও।

তুমি যে তাঁকে ভালোবাসতে, মায়াদি?

শুধু তাই? পূজো করতুম! তিনি পূজোরই যোগ্য, তিনি অনেক বড়। যাক্, ডুবে যাক্ অতীত, বিস্মৃতির মধ্যে তলিয়ে যাক্ অভিজ্ঞতার ইতিহাস। আর জানাবো না অভিযোগ, আর করব না অভিমান। পৃথিবী অনেক বড়, জীবন তার চেয়েও বিশাল। বন্ধু, আর আমার দুঃখ নেই।

ব্যাকুল কণ্ঠে অমরেশ বললে, কেন তুমি ব্যর্থ হ'লে এমন? তোমার ঐশ্বর্য্য যে এদের সকলের চেয়ে বেশী। মায়াদি, তোমার কী না ছিল?

তোমার শিক্ষা, চরিত্র, ব্যবহার, অন্নপূর্ণার মতো তোমার রূপ—ওদের চেয়েও কি তুমি ছোট ?

ঝর্ ঝর্ ক'রে মায়ালতার চোখ বেয়ে অশ্রু পড়লো। গলার স্বর তার ভেঙে পড়েছে। চুপি চুপি বললে, ওদের চেয়ে আমি ছোট, অনেক ছোট, অতি নগণ্য। ভিক্ষে ক'রে বেড়িয়েছি, সম্মান খুইয়েছি, সম্ভ্রম হারিয়েছি। কত যে ফাঁকি ছিল তুমি ত জানো না বন্ধু; নিজেকে জানিনি, জান্তে দিইনি। বড় ব'লে নিজেকে জাহির করেছি, বড় হবার চেষ্টা করিনি। ভালোবেসেছিলুম তাঁকে? মিছে কথা। দৈন্য দেখিয়েছি, ভিক্ষে চেয়েছি, ভালোবাসিনি। আ, কবি, ইচ্ছে হচ্ছে তোমার সামনে নিজের সকল দরজা খুলে ধরি। বন্ধু, ভালোবাসতে গেলে একটি মহৎ শিক্ষার দরকার।

গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। অমরেশ সাড়া দিয়ে বললে, ভিতরে এসো।

চাকর এলো গরম দুধ হাতে ক'রে। মায়ালতা দুধের পাত্রটা নিয়ে ঢেকে রাখলে। চাকর চ'লে গেল।

অমরেশ বললে, তুমি এতগুলো টাকা খরচ করলে কেন ?

বেশ, ভালো হয়ে টাকা শোধ ক'রে দিয়ো।

শোধ করব তোমার দেনা? আশ্চর্য্য, তুমি যেমন তেমনি আছো, পাঁচ মাসে একটুও বদ্‌লাওনি। আমি কি করেছি জানো, এই পাঁচ মাসে তোমার ওপর এক খাতা কবিতা লিখেছি, ছবি এঁকেছি অজস্র। একটিও কিন্তু তোমাকে দেখাতে পারব না, ভীষণ লজ্জা করবে। আর শোন শোন, সুরেশদার বিয়ের খবর পেয়েছ ত ?

মায়ালতা সব কথা চেপে বললে, পেয়েছি।

আমি তাঁকে পথে একদিন অপমান করেছি জানো ?

জানি।

সবই ত জানো দেখছি। আচ্ছা, ইতিমধ্যে দু'একটি মেয়ের সঙ্গে আমার প্রেম হয়েছে জানো ?

মায়ালতা বললে, সে ত চোখেই দেখলুম।

অমরেশ তার হাত ধ'রে বললে, কী দেখলে ?

দেখলুম, তোমার লাস নিয়ে হাঁসপাতালে যাবার চেষ্টা, ওরা এলো আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে। জানে না যে আমি ডাকিনী। দু'এক কথা বলতে প্রেম তাদের ধোঁয়া হয়ে গেল।—বলতে বলতে মায়ালতা হেসে উঠ্‌ল।

অমরেশ বললে, ওদের আমি গান লিখে দিই, তার বদলে ওঁরা আমার কুশল জিজ্ঞেস করে, এর বেশি এগোয়নি। কিন্তু তুমি কি বলতে চাও আমি প্রেমের যোগ্য নই ?

মায়ালতা দুই হাতে আদর করে' তার গলা চেপে ধরলে, তারপর হেঁট হয়ে তার উপর ঝুঁকে বললে, কেবল অসভ্যতা! খুব—খুব যোগ্য তুমি। আগে সেরে ওঠো, তারপর দেশে আঠারো কোটি মেয়ে আছে ? পাগল তুমি।

অমরেশ বললে, ভুল বুঝেছ আমাকে। আঠারো কোটি মেয়ের পাশে তুমি। তারা মেয়ে কিন্তু তুমি যে আমার কবিতা। তারা রক্ত মাংসের স্তূপ, তুমি আমার চিত্র। আঃ কী বিচিত্র গন্ধ তোমার সর্ব্বাঙ্গে, যেন অমৃতে ভ'রে উঠছে আমার সমস্ত প্রাণ।

মায়ালতা মলিন হাসি হেসে সস্নেহে তার হাত ধ'রে, বললে, শীতের রাত, এরই মধ্যে সব নিশুতি হয়ে গেছে। এবার আমি যাবো কবি।

আর একটু থাকো। থাকো আজ সমস্ত রাত আমার কাছে। কতদিন পরে দেখলুম। তোমাকে দেখি যেন জন্ম জন্মান্তর,—আশ্চর্য্য তুমি।

আশ্চর্য্য তুমি, কবি !

আমার কী আছে মায়াদি ?

তোমার ?—মায়ালতা একটু হাসলে তারপর কম্পিত ভগ্নকণ্ঠে বললে, তোমার আছে বলিষ্ঠ দেহ,—মার্ব্বেল পাথরে গড়া ; উচ্চ শিক্ষা, ভদ্র মন, তোমার

রক্তের মধ্যে অগ্নিরসের প্রবাহ। তোমাকে ছুঁলে—তোমাকে দেখলে সর্ব্বাঙ্গে যেন আগুন ধ'রে যায়, মধুর রসে আচ্ছন্ন হয়ে আসে। তুমি সর্ব্বনাশা!

অমরেশ বললে, তোমার বুকের মধ্যে কী আছে জানো?

মায়ালতা বললে, তুমি জানো পুরুষ, কী আছে!

হ্যাঁ, জানি আমি, বলতে আমার বাধা নেই—অমরেশ তার গায়ে হাত দিয়ে মৃদুস্বরে বলতে লাগল, এই তোমার হৃদয়, হৃদয়ের পুষ্পপাত্রে তোমার দুটি বিচিত্র রক্তপদ্ম,—কঠিন, নিটোল, ভয়ঙ্কর। একটিতে জীবনের অমৃতরস, আর একটিতে মরণের অদ্ভুত লাবণ্য। তোমার দেহের তীরে মৃত্যুর রহস্যময় অগ্নিগহ্বর, পুরুষের উন্মুক্ত বাসনায় সেখানে লক্ষ প্রাণবীজ অশ্রান্ত অঙ্কুরিত হয়। আরো, আরো কাছে এসো মায়াদি, মুখের ওপর তোমার বুক পেতে দাও।—আঃ কী গভীর উত্তাপ, কি আশ্চর্য্য অনুভূতি,—কান পেতে তোমার হৃদয়ের মধ্যে সেই অনাগত জীবন-বাহিনীর প্রাণ-সঞ্চারের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। মায়াদি, কাঁপছ কেন?

চুপি চুপি মায়ালতা বললে, কী বলছ তুমি, বন্ধু?

অমরেশ বললে, তারা আসবে, আমি জানি তারা আসিবে।

কে তাদের আনবে, কবি? বলো, উত্তর দাও?—মায়ালতা মুখের উপরে মুখ রাখ্‌ল তারপর বললে, তুমি ত জান না, তোমার এই কথায় আমার চিন্তা আমার মন, আমার ইহকাল পরকাল আমার আয়ত্তের বাইরে চ'লে যায়, চোখে আর আমি কিছু দেখতে পাইনে! তোমার কথায় আমার সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে একটা জটিল আন্দোলন জেগে ওঠে, শিরায় উপশিরায় বর্ষার ধারা নামে, সে যে কী যন্ত্রণা তুমি জানো না, তোমার স্তব আর স্তুতিতে সে-যন্ত্রণার উপশম হয় না। যাক্ এবার আমি যাই বন্ধু।

ব'লে সে অমরেশকে ছেড়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো। কেমন একটা গভীর অসন্তোষ যেন তার ভিতরে ঘনিয়ে উঠেছে।

অমরেশ বললে, তোমার আঁচলে রক্ত ! রাস্তার লোক চেয়ে থাকবে, বলবে, খুন ক'রে এসেছ।

মায়ালতা বললে, তাদের জানাবো আমি খুন হয়েছি।—দাঁড়াও কাপড়খানা উল্টে পরে নিই।—বলে সে গিয়ে ক্যাবিনের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এলো, তার পরণের কাপড়খানা খুলে আঁচলের দিকটা কোমরে জড়িয়ে নিল, জামার বোতাম আঁটল !

টাকার পুঁটলীটা রইল তোমার বালিশের নীচে। কাল সকালেই আবার আসবো।—এই বলে দুধটা সে অমরেশকে খাওয়ালো।

অমরেশ বললে, যেয়ো না।

ওমা, সে কি ? সারারাত বুঝি ব'সে ব'সে শুনতে হবে তোমার নারীবন্দনা ? কিন্তু এ যে হাসপাতাল। ভালো হয়ে ওঠো, একদিন তোমার কাছে থাকব। হ্যাঁ, যাবার সময় তোমার বাসায় খবর দিয়ে যাবো, শ্রীধর রাত্রে এসে থাকবে। কেমন ?

অমরেশ সম্মতি জানালো। তার গায়ের উপর লেপটা তুলে দিয়ে মায়ালতা দরজা খুলে হেসে বেরিয়ে গেল।

*

* *

কয়েকদিন হোলো অমরেশ বাসায় ফিরেছে। কপালের ঘা শুকিয়েছে, দাগটা মিলোতে বিলম্ব হবে। চোখের ব্যথাটা সেরে গেছে। ছেলেমেয়ের দল আর আসে না, মায়ালতার ধমক খেয়ে তারা গা ঢাকা দিয়েছে। দেশ থেকে চিঠি এসেছে, বাড়ী-ঘর, বিষয়-সম্পত্তি, খাজানা-পত্র প্রভৃতির ব্যবস্থা না করলে আর চল্‌ছে না। শীঘ্রই কর্ত্তার উইলের প্রবেট্ নিতে হবে। কল্‌কাতার ব্যাঙ্ক্ থেকে টাকা তোলা দরকার। শ্রীধর তাড়া দিচ্ছে। কল্‌কাতার বাসা সত্বর ত্যাগ করতে পারলে সে খুশি হয়।

ফাল্গুনের সন্ধ্যা। ঘরের দক্ষিণ দিকের দুটো জান্‌লাই খোলা। মেঝের উপরে ঢালাও বিছানা। মায়ালতা পুরানো সেতারটা নিয়ে তা'তে ঝঙ্কার তুলেছে। বাগেশ্রী আলাপ চল্‌ছে। তার হাত ভালো। অদূরে জান্‌লার ধারে অমরেশ হেলান্ দিয়ে ব'সে রয়েছে—সুরের মীড়গুলিতে সে রসে বিভোর। নিজে সে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শিখতে পারেনি। অনেক কিছু শেখা তার বাকি রয়ে গেছে।

এক সময়ে সেতার থাম্‌ল। অমরেশ বললে, তুমি এমন সেতার বাজাতে পারো কই জানতুম না? একেবারে বীণাবাদিনী সরস্বতী?

মায়ালতা হেসে বললে, গ্রামে থাকতে শিখেছিলুম। দাদাবাবু ছিলেন বড় বাজিয়ে, তাঁর কাছে ব'সে থাকতুম।

অমরেশ বললে, তুমি যেন সোনার খনি! যতই গভীরে যাই বিস্ময়ের পর বিস্ময়! তুমি যেন বিধাতার সৃষ্টি-রহস্যের প্রতীক্।

মায়ালতা বাইরের দিকে তাকালো। আজ যেন তার মুখে চোখে ক্লেশ আর অবসাদ জড়ানো। জান্‌লার বাইরে পথে সন্ধ্যার আলো জ্ব'লে উঠেছে, তারই এক ঝলক আলো এসে পড়েছে তার মুখে। চোখ দুটো তার ভারাক্রান্ত। সেই চোখ ফিরিয়ে সে অমরেশের প্রতি নিবদ্ধ করলে। বললে, কবি, কবিতায় যা মানায়, বাস্তব ক্ষেত্রে অনেক সময় সেটা ক্লান্তি আনে। প্রশংসায় খুশি আছে, তৃপ্তি নেই।

তার কণ্ঠস্বরে অমরেশ সচকিত হোলো।

মায়ালতা বললে, দেবীর আসনে আমাকে বসালে কিন্তু মানুষ ব'লে জানলে না। তোমার কথা মনে লাগে, মর্ম্মে লাগে না। স্তব আর স্তুতি? মেয়েমানুষের কাছে ওর দাম কি?

তোমাকে কী দিতে পারি, মায়াদি?

মায়ালতা হেসে বললে, দেবে তুমি? হায় হায়, দিতেও কিছু পারলে না, নিতেও কিছু জান্‌লে না। কী বল্‌ব তোমাকে? তুমি কেবল মাত্র কবি,

কেবল মাত্র কথাশিল্পী! তোমার চোখ আছে, দৃষ্টি নেই; কাব্য আছে, পৌরুষ নেই। মেয়েমানুষ তোমাদের কাছে মানসী, মানবী নয়। তুমি কেবল স্নেহই নেবে, শ্রদ্ধা নিতে চাইবে না বন্ধু?

শ্রীধর আলো এনে ঘরের ভিতরে রাখল। তারপর বললে, দিদিমণি, আপনার জন্যেই দাদাবাবুর চুলের টিকি দেখা যাচ্ছে, নৈলে এতক্ষণ……ওরা পথে বা'র ক'রে নিয়ে যেতো, তুমি ঘরে এনে রাখলে। তুমি থাকলে, আমি নিশ্চিন্ত।

মায়ালতা বললে, আমাকে এত বিশ্বাস, শ্রীধর?

মুখ দেখলে চিনতে পারি, দিদিমণি। ব'লে শ্রীধর চ'লে গেল।

অমরেশ বললে, ভারি জ্যাঠা হয়েছে। পুরনো চাকরগুলো ভারি মনিবানা করে।

মায়ালতা বললে, সারাদিন রইলুম, এবার আমি যাই কবি।

অমরেশ বললে ইস্কুলের ঘরে আর কতদিন থাকবে তুমি?

কাজের চেষ্টায় আছি, অন্য কাজ পেলে সেখানে চ'লে যাবো।

অমরেশ তার মুখের দিকে তাকালো। তারপর সিগারেটে একটা টান দিয়ে বললে, কাজ? আবার কোন অচেনা জায়গায় যাবে তুমি?

নিশ্বাস ফেলে মায়ালতা মলিন হাসি হাসলো। তারপর বললে, এমনি করেই ত চলতে হবে বন্ধু, এই নিয়তি।

অমন ক'রে তোমায় আমি নষ্ট হতে দেব না মায়াদি। কাজ তুমি নাইবা করলে?

ছেলেমানুষ তুমি।—মায়ালতা বললে, পৃথিবী বড় জটিল, সংসার বড় নির্দ্দ জীবন বড়ই সমস্যা-সঙ্কুল। আজকের তুমি আপন, কালকের তুমি পর। কত দেখলুম বন্ধু; রং ফিকে হয়ে জৌলুষ ধুয়ে যায়, বয়স ঢিলে হয়ে আসে।—দয়া, প্রেম, বিবেচনা—এরা বড় অস্থায়ী। পৃথিবীতে নির্ভরযোগ্য কিছু নেই।

অমরেশ বললে, কী বলছ তুমি? কী থাকে তবে?

মায়ালতা কিছু বললে না, কেবল সেতারের একটা তার আঙুল দিয়ে আঘাত করলে। তারটা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। অমরেশ বললে, তোমাকে যদি আমি আর কোনোদিন কাজ করতে না দিই ?

সোজা মায়ালতা তার মুখের দিকে তাকালো। চাহনিটা সুস্পষ্ট, কিছু তীব্র। বললে, তার মানে দয়া করবে ?

একে তুমি দয়া বলো ?

এরই নাম দয়া, ভদ্র পোষাক পরানো অনুগ্রহ। তুমি অবস্থাপন্ন, আমি দরিদ্র। আমি পথের মানুষ, আমার প্রতি করুণার ছিটে দিয়ে তুমি চাও আত্ম-তৃপ্তি। বন্ধু, তাতে কাজ নেই আমি বলি। পৃথিবী অনেক বড়, আশ্রয় আমি পাবোই। দূরে চ'লে যাবো, তোমাদের চোখের আড়ালে। যেখানেই থাকি শুধু এই কামনা করব, তুমি যেন সংসারে সকলের চেয়ে মাথা উঁচু করে চলতে পারো। তোমার খ্যাতির সংবাদে দূর থেকে আমি গৌরবান্বিত হই।

আমি কি তোমার জীবনে কোনো প্রয়োজনেই লাগতে পারিনে ?—অমরেশ আকুল চক্ষে তার দিকে তাকালো।

কী প্রয়োজনে লাগবে কবি ? কী প্রয়োজন হ'তে পারে ? আমি বিবাহিত মেয়ে, চিরপলাতক—

বাধা দিয়ে অমরেশ বললে, তুমি কুমারী, তোমার কৌমার্য্য অকলঙ্ক অক্ষত !

কিন্তু বন্ধু তোমার সঙ্গে প্রভেদ আমার অনেক। আমি বন্ধন জানিনে, শাস্ত্র-সংস্কার জানিনে, জানিনে লোক-শাসন। তোমার সঙ্গে আমার প্রয়োজনের প্রশ্নই ওঠে না।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে অমরেশ বললে, কোথায় তুমি থাকবে বলবে না ?

মায়ালতা বললে নিজেই জানিনে থাক্‌ব কোথায়। যদি ভালো কাজ পাই এখানেই থাক্‌ব, যদি না পাই তবে কাশী চ'লে যাবো। সেখানে আছেন আমার বাবার বৃদ্ধ মাসীমা। তাঁর সেবা করব তিনি আমাকে আশ্রয় দেবেন। —সজল কণ্ঠে সে পুনরায় বললে, বন্ধু, নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের জন্য মন লালায়িত হয়ে

উঠেছে। জন্তুর মতন পথে পথে আর ঘুরতে পারিনে। আমি সেখানেই যাবো, একটা ছোট শিক্ষাকেন্দ্র খুল্‌ব, বাকি জীবন সেখানেই কাটিয়ে দেবো।

অশ্রুপূর্ণ চক্ষে অমরেশ বল্‌লে, সে কাজ ত এখানেও হতে পারে।

পারে, কিন্তু কাশী আমার ভালো লাগে। ছোট বেলায় একবার গিয়েছিলুম, স্মৃতিটা আছে। সেই গঙ্গা, অহল্যাবাইয়ের ঘাট, মণিকর্ণিকার জলমগ্ন মন্দির, দূরে রামনগর, ছায়া ঝিলিমিলি অশত্থতলায় সাধু সন্ন্যাসীর ধুনি জ্বলছে,—ওপারে নদীর বিস্তৃত বালুচর। বন্ধু, সেখানেই বোধ হয় প্রসন্ন জীবনের চেহারা দেখতে পাবো, চাওয়া আর পাওয়ার অতীত কোনো জীবন বোধ হয় একটা আছে, তার আস্বাদ নেবো।—নিশ্বাস ফেলে মায়ালতা বললে, এবার আমি যাই অমরেশ।

অমরেশ বললে, কবে যাবে?

চিঠি দিয়েছি, শীঘ্রই যাবো।

তুমি ত বললে না মায়াদি, আমি কি করব?

তোমার কর্ত্তব্য তোমার মনে, সহজ অনুপ্রেরণার নির্দ্দেশ মেনে নিয়ো। তবে তোমার ছবি আঁকা আর কবিতা রচনা—এদের ত্যাগ ক'রো না, এরাই তোমার পরিচয়।—এই ব'লে সেদিনকার মতো মায়ালতা উঠে দাঁড়ালো।

অমরেশ দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে তার হাত ধরলে। রুদ্ধশ্বাসে বললে, তুমি যে বলেছিলে অন্তত একটি দিনও থাকবে আমার কাছে?

অত্যন্ত অসম্ভব কথা বন্ধু,—বলেছিলুম বটে কিন্তু সত্যি বলিনি। তোমাকে ভালোবাসি কিন্তু তাই ব'লে দু'জনের সম্ভ্রম বিপন্ন হ'তে দেবো না।—মায়ালতা সস্নেহে নিজের হাতখানা ছাড়িয়ে নিল।

দরজা পর্য্যন্ত এসে অমরেশ বললে, জগতে আমার কেউ নেই, তুমি তুলে নিয়েছিলে, তুমিই ফেলে দিয়ে চলে যাচ্ছ। ঝর্‌ ঝর্‌ ক'রে তার চোখ দিয়ে অশ্রু পড়লো।—কত ঋণ তোমার কাছে রয়ে গেল। আমি হতভাগ্য, তাই তোমার এমন পরিবর্ত্তন হোলো মায়াদি।

আর একটা দিক আছে কবি, সেটা যেদিন বিবেচনা করবে সেদিন আমার ওপর অভিমান থাকবে না।—এই ব'লে আঁচলে অশ্রু মুছে মায়ালতা পথে নেমে দ্রুতপদে চল্‌তে লাগল।

*

* *

বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা—তিনটি ঋতু একে একে বিদায় নিয়ে গেছে। শরৎ এসেছে শিশির বিন্দুতে, কাশফুলের শুভ্রতায়, আকাশের উদার নীলিমায়। দিনে উজ্জ্বল রৌদ্র কিরণ, রাত্রে শুক্লপক্ষের নিবিড় জ্যোৎস্না। পূজার আর বিলম্ব নাই।

কাশী শহরে এখনও ভিড় হয়নি, দু'চারজন নূতন নূতন যাত্রীর দেখা মিলছে মাত্র। এবার বর্ষা ছিল প্রবল, ঘাটে ঘাটে এখনো স্তূপীকৃত গঙ্গা-মৃত্তিকা, সেগুলি সরিয়ে সিঁড়ি বার করা হচ্ছে। তবুও জলের ধারে কাঠের তক্তা ও ছত্রীগুলির নীচে কীর্ত্তন, ভাগবত পাঠ ও কথকতা চলে। লোকের ভীড় কম হয় না। বিধবা, বৃদ্ধ ও পেন্সন ভোগী বৃদ্ধরা এসে বসেন। মেয়েরা সন্ধ্যার সময় নদীর জলে প্রদীপ ভাসায়। আজ কি একটা পার্ব্বণ উপলক্ষে বিকালের দিকে বেশ ভীড় হয়েছিল। দশাশ্বমেধ ঘাটের মাঝখানে ছোট মন্দিরে আরতির শাঁখ ঘণ্টা বাজছে।

এদিকের সিঁড়ির ধারে কীর্ত্তন বসেছে। সেই ভীড়ের ভিতরে বসেছিল মায়ালতা। ঘোমটার ভিতর দিয়ে রুক্ষ চুলের রাশ দুই কপাল বেয়ে নেমে এসেছে, মাঝখানে শাদা সীঁথি। গায়ে একখানা মোটা চাদর জড়ানো, সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা। দু'হাতে দুগাছি চুড়ি, পরিচ্ছদে তার আর কোথাও কোনো চাকচিক্য নেই। অদ্ভুত নিরাসক্ত তার চোখের দৃষ্টি, কোনো কিছুর প্রতি ভ্রূক্ষেপ নেই। তার বয়স যেন অনেক বেড়ে গেছে। কীর্ত্তনীয়া মাথুরের পালা গাইলেন, মায়ালতার চোখে অশ্রু নেমেছে।

ওগো বাছা, তোমাকে কে ডাকছে দ্যাখো পেছন থেকে। বাড়ী থেকে বুঝি লোক এসেছে।

মায়ালতা ফিরে তাকালো। অপরিচিত একটা লোক দাঁড়িয়ে। প্রথমটা হতচকিত, তারপর তাড়াতাড়ি উঠে পাশ কাটিয়ে এসে বললে, কোন্ হ্যায় তুমি? কি চাও?

লোকটা হিন্দুস্থানী ভাষায় জানালে, সে নৌকার মাঝি। একজন বংগালী বাবু ওইখানে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর অনুরোধে মায়ালতাকে সে ডাকতে এসেছে। বাবুর জরুরী দরকার। মায়ালতা তৎক্ষণাৎ বুঝলো, এ অমরেশ। তার কয়েকখানা চিঠির জবাব দেওয়া হয়নি, উদ্বিগ্ন হ'য়ে তাই সে ছুটে এসেছে।

ঘোড়াঘাটে এসে অমরেশের দেখা পাওয়া গেল। মায়ালতা হাসতে হাসতে গিয়ে বললে, একি কবি, হঠাৎ যে ধর্ম্মে মতি হোলো? একেবারে কাশীধাম।

অমরেশ হাসি মুখে বললে, শুনেছি, এখানে অনেক ডাকিনী-যোগিনী আছেন, চর্ম্মচক্ষে তাঁদের দেখতে এলুম।

তারা কিন্তু তরুণ কবি দেখলে গিলে খায়, মনে রেখো।

বেশ ত, নিখরচায় কাশী লাভ হবে, মন্দ কি? তারপর, খবর কি শুনি। কেমন আছ?

ভালোই। তুমি কেমন আছ?

ভালো না। মাঝখানে কিছু দিন ভুগলুম, এখন শ্রীধরকে নিয়ে বেরিয়েছি, কিছুদিন দেশ-বিদেশ ঘুরব।—অমরেশ বললে, বাস্তবিক, শেষের দু'খানা চিঠির উত্তর না পেয়ে মনে হোলো, তুমি বোধ হয় বিবাগী হ'য়ে গেছ। এত নিষ্ঠুর তুমি, চিঠিও বন্ধ করেছ!

মায়ালতা বললে, এখানে ভালোই আছি, দিন চলে যাচ্ছে। চিঠি লিখে আর কী হবে, বন্ধু?—এই ব'লে সে গঙ্গার ওপারের ঘনায়মান সন্ধ্যার দিকে তাকালো। দিন শেষ হয়েছে।

অমরেশ বললে, ভালো তুমি নেই। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, মাছ ছেড়েছ, দীক্ষা নিয়েছ, এর নাম ভালো থাকা নয়। স্কুল চালাচ্ছ ত?

মায়ালতা বললে, বাণীভবনে কাজ নিয়েছি। —এই ব'লে সে হঠাৎ কি ভেবে হাসলে। হেসে বললে, বাস্তবিক, তোমাদেরই বা ভুলতে পারি কই? এই মাত্র মাথুরের পালায় শ্রীমতী কেঁদে আকুল হচ্ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের জন্য, তার সঙ্গে কী যেন একটা কথা মনে প'ড়ে আমার পোড়া চোখে আসছিল জল। শেষের দিন তোমাকে ছেড়ে আসবার সময় বক্তৃতা দিয়েছিলুম, বলেছিলুম শাস্ত্র আর সংস্কার জানিনে। সেই কথাটা মনে ক'রে কত দিন হেসেছি। সব মানি, সমস্ত মানি, মানি ব'লেই ত ছেড়ে আসতে হয়েছিল। হায় রে, কে জানে অহঙ্কারের পাশেই থাকে অজ্ঞান।—একটু থেমে সে বললে, সাত মাস কিন্তু সাত বছর বয়স বেড়ে গেছে।

অমরেশ বললে, কাল সকালে আমি এসেছি। তোমার ঠিকানা নিতে কত খোঁজাখুঁজি করেছি, কিছুতেই পাইনি। আজকাল নতুন নম্বর হয়েছে সব বাড়ীতে। যতদিন না খুঁজে পেতুম, থাকতুম কাশীতে। আজ হঠাৎ পেয়ে গেলুম ঘাটে। তুমি বুঝি রোজ কীর্ত্তন শুনতে আসো?

মায়ালতা বললে, বিকেল বেলায় ভালো লাগে না ঘরে ব'সে। ঝি-কে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। এ-ঘাট ও-ঘাট ঘুরে বেড়াই।

গায়ে অমন ক'রে চাদর জড়িয়েছ কেন?

এখানে চাদরটাই মানায়, জামা প'রে বেড়ানো শোভন নয়।

অমরেশ হেসে বললে, বাপরে বাপ তোমার এই কৃচ্ছ্রসাধনে তুষ্ট হয়ে নিশ্চয় বাবা বিশ্বনাথ বর দিয়েছেন?

মায়ালতা হাসি মুখে বললে, দিয়েছিলেন গো দিয়েছিলেন, কিন্তু মনের মতন হয়নি ব'লে তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছি!

এদিকটা কিছু নির্জ্জন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে, আলো জ্বলছে ঘাটে ঘাটে। বোধ হয় শুক্লা একাদশী, জ্যোৎস্নায় গঙ্গার জল আর ওপারের বালুচড়া উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মাঝি মাল্লারা গান ধরেছে। কাছেই

নৌকার ভিড় লেগেছে। অমরেশ বললে, নদীতে বেড়াতে ইচ্ছে হয় মায়াদি? আমি নৌকো করতে পারি।

মায়ালতা সম্মতি জানালো। অমরেশ একখানা নৌকা ভাড়া করলে। সেই বৃদ্ধ মাঝিই নৌকা নিয়ে এলো। আগে আগে নৌকায় উঠে অমরেশ হাত বাড়িয়ে মায়ালতাকে ধরে তুলে নিলে। দু'জন পাশাপাশি বসলো। নৌকা ছেড়ে দিল। স্রোতের টান এখানে প্রবল, নৌকা স্থির থাকে না। মাঝি এবং তার লোক—দু'জনে দু'দিকে বসলো। জলের চেহারা যেন ভালো মনে হচ্ছে না। শ্রাবনের জলে নদী ভরো-ভরো।

কিন্তু কিছু দূর গিয়ে দেখা গেল, শহরটা যেন কোনো দূর প্রাচীনের অতীত অবশেষ, স্বপ্নের মতো তন্দ্রাতুর। আলোগুলি ক্ষুদ্র হয়ে ম্লান হয়ে [illegible]ছে। দিক্‌দিগন্ত—জল, আকাশ, ওপারের বালুচড়া, দূরে কাশী শহরের অসংখ্য মন্দির আর প্রাসাদের চূড়া—জ্যোৎস্নায় একাকার। দূর [illegible] [illegible] শাঁক ঘণ্টার শব্দ, দূরশ্রুত ভজন গানের রেশ, বাঁশীর করুণ-কম্পিত স্বর,—তাও ধীরে ধীরে যেন দূরত্বের অতল তলে মিলিয়ে গেল। প্রাণী জগৎ কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। নদীর ভিতরে জলরাশির গভীর প্রাণ-কল্লোল ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। আকাশ আর পৃথিবী আর জল কী যেন রহস্যভরা!

মায়ালতা বললে, আমারই জন্যে তুমি এসেছ, তাই ভেবে সমস্ত মন আমার মধুতে ভ'রে উঠছে। কিন্তু কেন তোমার এই পাগলামি, কবি?

অমরেশ নিশ্বাস ফেলে বললে, বিন্দু বিন্দু স্বপ্ন দিয়ে ইন্দ্রজাল রচনা করেছি তুমি তার মূল কেন্দ্রে ব'সে রয়েছ। জানি অন্যায়, জানি এর মধ্যে নীতি নেই, তবু—

তবু বাধাটা থেকেই যায়, কবি।

[illegible] [illegible]! তাই কেবল ভেবেছি এই সাত মাস। সেই বাধা উত্তীর্ণ [illegible] অগ্রগতি। থাক্ শাস্ত্র, নীতি আর শাসন। যারা বীর্য্যবান